রাও ফরমান আলী খান

বাংলাদেশের জন্ম

ভূমিকা

মুনতাসীর মামুন

ইউপিএল প্রকাশনা

অরুণ কুমার মুখোপাধ্যায়
হৃদয়ের একূল-ওকূল: দুই বঙ্গের গদ্য সাহিত্য

আতিউর রহমান *সম্পাদিত*
ভাষা-আন্দোলনের আর্থ-সামাজিক পটভূমি

আনিসুর রহমান
অসীমের স্পন্দ: রবীন্দ্রসঙ্গীত বোধ ও সাধনা

কাওসার হুসাইন *অনূদিত*
বেকনের প্রবন্ধ

কায়েস আহমেদ *সম্পাদিত*
মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

কামাল উদ্দিন হোসেন
রবীন্দ্রনাথ ও মোগল সংস্কৃতি

মহিউদ্দিন আহমেদ *সম্পাদিত*
ইউপিএল নির্বাচিত বাংলাদেশের প্রবন্ধ
বার্ষিক সংকলন

মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান
রবীন্দ্র-রচনায় আইনি ভাবনা

শামসুল আলম সাঈদ
কাব্য বিশ্বাসের কবি ও কবিতা

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী
বাঙালীর জাতীয়তাবাদ

হাসান আজিজুল হক
অপ্রকাশের ভার

দ্বিজেন শর্মা
সমাজতন্ত্রে বসবাস

ISBN 978 984 506 061 5
9 789845 060615

পাকিস্তানী শাসনের শেষ কয়দিনে ঢাকায় বুদ্ধিজীবী হত্যার নীল নকশায় জেনারেল রাও ফরমান আলী জড়িত ছিলেন কিনা এবং থাকলে কতখানি জড়িত ছিলেন তার তদন্ত হয়নি। তবে তদানীন্তন পাকিস্তানী সিভিল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের প্রধান হিসাবে তার জড়িত থাকাটা অস্বাভাবিক নয়। তাই বাঙালীর কাঠগড়ায় রাও ফরমান আলী কতখানি অপরাধী সেটা তদন্ত সাপেক্ষ।

একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে অপমানজনক পরাজয় বরণ করার জন্যে পাকিস্তানী জনগণের কাঠগড়ায় তখনকার জেনারেলদের অপরাধী সাব্যস্ত করা হয়েছে। সেই অপরাধ ও অপরাধবোধ থেকে নিষ্কৃতি পেতে অনেক জেনারেলই আত্মজীবনীতে একাত্তরের যুদ্ধে নিজেদের দোষ ও ভুল-ক্রটিগুলো ঢাকতে এবং সাফাই গাইতে চেষ্টা করেছেন। রাও ফরমান আলীও তার ব্যতিক্রম নন।

এসব লেখায় তাই মুক্তিযুদ্ধের সময়কার অনেক ঘটনাই এসেছে এবং জেনারেলরা নিজেদের সুবিধামতো ঘটনার বর্ণনা দিয়েছেন এবং যে সব কারণে পাকিস্তান হেরেছিল, সেসব অনেক ভুল ও দোষ পরস্পরের ঘাড়ে চাপিয়েছেন।

জেনারেল রাও ফরমান আলীর *How Pakistan Got Divided* বইটি রচনাশৈলী বিন্যাসের দিক থেকে অন্য জেনারেলদের চাইতে অনেক উন্নত। বইটি তিনি কেন লিখেছেন এ সম্পর্কে রাও ফরমান আলী খানের ভাষ্য, "অন্য অনেকে যা দেখেছেন বা দেখতে পেয়েছেন, আমি তার চেয়ে অনেক বেশী দেখেছি।"

কী দেখেছেন রাও ফরমান আলী খান? বইটিতে তিনি যা বলতে চেয়েছেন তা কতখানি সত্য? রাও ফরমান আলীর ভাষ্য অনেক সময় অনেক ক্ষেত্রে বিশ্বাসভাজন মনে হবে। এ কৌশল তাঁর জন্য অবশ্যই ভালো। কিন্তু ইতিহাস বা ভবিষ্যতের জন্য তা ভয়ঙ্কর।

অপর ফ্ল্যাপে দেখুন

টাকা ২৫০.০০ ২০/-

পাকিস্তানের জনগণ অথবা অন্যান্য দেশের পাঠকের বইটি পড়ার সুযোগ হলেও বাংলাদেশের জনসাধারণের হয়তো সে সুযোগ হয়ে ওঠেনি। এই বইটিতে রাও ফরমান আলী যুদ্ধের নীতি নির্ধারণে পাকিস্তানী পক্ষের শক্তি হিসাবে কাজ করার পর বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তান হারার বিষয়ে কীভাবে সাফাই গাইছেন পাঠক তা খুঁজে বের করতে প্রয়াসী হতে পারবেন। অনূদিত এই গ্রন্থটিতে অধ্যাপক মুনতাসীর মামুন তাঁর দীর্ঘ ভূমিকায় এ বিষয়ে আলোকপাত করেছেন।

আমাদের বিশ্বাস, এ বই থেকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ সম্পর্কে পাঠকের মনে নানা প্রশ্ন জেগে উঠবে, বেরিয়ে আসবে অনেক সত্য। অগোচরে থেকে যাওয়া ইতিহাসের সে সকল সত্য নিয়ে রচিত হবে প্রকৃত ইতিহাস।

আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, রাও ফরমান আলী খানের উপস্থাপিত তথ্যের চ্যালেঞ্জ করার জন্য অনেকে এগিয়ে আসবেন। এর মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধের উপাত্ত উপাদান ও গবেষণা হয়ে উঠবে আরো সমৃদ্ধ।

আখতার আহমেদ বীর প্রতীক

ISBN 978 984 506 061 5

বাংলাদেশের জন্ম

রাও ফরমান আলী খান

বাংলাদেশের জন্ম

ভূমিকা

মুনতাসীর মামুন

সূচি

ভূমিকা

গত কয়েক বছর ধরে মুক্তিযুদ্ধে পরাজিত পাকিস্তানী জেনারেলরা লিখছেন। চাকুরি থেকে অবসর গ্রহণের পর তাঁরা কলম ধরেছেন। লিখছেন আত্মস্মৃতি। তাঁদের জন্য বেশ একটা ভালো অবসরোত্তর পেশা হিসেবে এখন তা দাঁড়িয়ে গেছে।

এসব জেনারেলের বয়স এখন সত্তরের কোঠায়। কেউ কেউ পা দিয়েছেন আশিতে। অবসর গ্রহণ করে বিপুল সুযোগ-সুবিধাসহ দিনাতিপাত করছেন। কিন্তু অদৃশ্য কী যেন বারবার তাঁদের অভিযুক্ত করছে! উত্তরসুরিরা দেখছে তাঁদের সন্দেহের চোখে। কোন গৌরব গাঁথা গাওয়া হচ্ছে না। তাই তাঁরা লিখছেন, লিখতে বাধ্য হচ্ছেন, বিশেষ করে ১৯৭১ সাল সম্পর্কে। গত কয়েক বছরে এ বিষয়ে লেখা জেনারেল ফজল মুকিম খান, গুল হাসান, আরিফ, ফরমান আলী প্রমুখের বই বেরিয়েছে। জেনারেল নিয়াজীর বইটিও ছাপা হওয়ার পথে। পাকিস্তান ভাঙ্গা ও বাংলাদেশে গণহত্যা–এ দু'টি বিষয়ে প্রত্যেকে নিজ নিজ ভাষ্য এবং সাফাই তৈরি করেছেন।

এ ধরনের বই বাংলায় অনুবাদ করে প্রকাশ করা হবে কিনা বা যাবে কিনা–এ নিয়ে ইউপিএল-এর জনাব মহিউদ্দিন আহমেদের সঙ্গে আমার বহুদিন ধরে দীর্ঘ আলোচনা হয়েছে। আমরা দু'জন আবার সমাজের বিভিন্ন পেশার ব্যক্তির সঙ্গে আলোচনা করেছি। কারণটি আর কিছু না, যে কোন বিষয়ে আমাদের ত্বরিৎ অসহিষ্ণুতা প্রকাশ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং ইতিহাসের রাজনীতিকরণ। ফলে এ থেকে ব্যাপক ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হতে পারে। অবশেষে আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি এ ধরনের কিছু বইয়ের পূর্ণ অনুবাদ ও কিছু বইয়ের সংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে সংকলন প্রকাশ করা উচিত। কারণ পাকিস্তানী জেনারেলরা একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধটা কিভাবে দেখেছেন এবং মূল্যায়ন করেছেন সেটা আমাদেরও জানা দরকার। পাকিস্তানী জেনারেলদের বইগুলো মূলত পশ্চিম পাকিস্তানী ও পাশ্চাত্যের পাঠকের জন্য লেখা। এতোদিন পশ্চিম পাকিস্তানীদের বাংলাদেশে গণহত্যা বিষয়ে তেমন কোন তথ্য

জানানো হয়নি এবং যা জানানো হয়েছে তা বিভ্রান্তিমূলক। এ বইগুলো শুধু পশ্চিম পাকিস্তানী পাঠক নয়, বিদেশী পাঠকদের মনেও ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি করতে পারে। প্রয়োজনীয় ভূমিকা ছাড়া পাঠ করলে বাংগালি পাঠকরাও বিভ্রান্তির শিকার হতে পারেন। ঐ সব বইয়ের অতিরঞ্জন, বিভ্রান্তিকর বা অর্ধসত্য, মিথ্যা তথ্য যাতে ইতিহাস বিকৃতি না ঘটায় সেজন্যও এগুলোর বিচার-বিশ্লেষণ দরকার।

ঐ সব বইয়ের আরেকটি উদ্দেশ্য, গণহত্যা এবং অন্যান্য অপকর্মের ব্যাপারে নিজেদের দায়-দায়িত্ব অস্বীকার করা। জেনারেলরা এসবের জন্য মূলত দায়ী করেছেন রাজনীতিবিদ ও জেনারেল ইয়াহিয়াকে। অনেকে মিথ্যাচার, অর্ধসত্য ও অতিরঞ্জনের আশ্রয় নিয়েছেন বইগুলোতে। তাঁদের মিথ্যাচার ও অতিরঞ্জনগুলো তুলে ধরা উচিত; আমাদের জানা উচিত। কারণ এ সবই এক সময় বিবেচিত হবে ইতিহাসের উপাদান হিসেবে।

বাংলাদেশের মানুষের অন্যতম বিজয়গাঁথা হলো মুক্তিযুদ্ধে বিজয়। গত পঁচিশ বছর রাষ্ট্রীয় প্রশ্রয়, ইতিহাসের রাজনীতিকরণ, অসহিষ্ণুতা--এসব মিলে মুক্তিযুদ্ধকেও স্পর্শকাতর বিষয় হিসেবে তুলে ধরা হচ্ছে। আজ পঁচিশ বছর পর সময় এসেছে, নির্মোহ দৃষ্টি নিয়ে সম্পূর্ণ বিষয়টিকে বিবেচনা করার। কেন আমরা বাংলাদেশ চেয়েছিলাম? বিষয়টি কি ছিল চাপিয়ে দেয়া? কিভাবে চেয়েছিলাম বাংলাদেশ? কিভাবে ছিনিয়ে আনা হয়েছিলো বিজয়? যা চেয়েছিলাম তা কি পেয়েছি? না পেলে, কেন পাই নি? ইতিহাস বিষয়ে অসহিষ্ণুতা, গোঁড়ামি দেখিয়ে, সেন্সরশীপ আরোপ করে সমগ্র বিষয়কে জটিল করে তোলা হবে মাত্র। আজ, সময় এসেছে, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক শত্রু-মিত্র যারই হোক না কেন, সব ধরনের উপাদান সংগ্রহ করে, ঝাড়াইবাছাই করে মুক্তিযুদ্ধের বিবরণ লেখার কাজটি শুরু করা। সে পরিপ্রেক্ষিতেই ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে শত্রুপক্ষের অন্যতম নায়ক জেনারেল রাও ফরমান আলীর বইটি বাংগালি পাঠকের জন্য অনুবাদের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। কেন পাকিস্তানী জেনারেলরা গণহত্যার পথ বেছে নিয়েছিলেন? মুক্তিযুদ্ধের সময়টা তাঁরা কি করেছেন–এসব জানার জন্যও এ ধরনের বই প্রয়োজন।

২

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে যে ক'জন পাকিস্তানী জেনারেল লিখেছেন তাঁদের মধ্যে জেনারেল রাও ফরমান আলী খানের বইটি গুরুত্বপূর্ণ। বইটির নাম "হাউ পাকিস্তান গট ডিভাইডেড"। গুণগতভাবেও অন্য জেনারেলদের থেকে তাঁর বইটি উন্নত, অন্তত রচনাশৈলী, বিন্যাসের দিক থেকে। বোঝা যায়, তিনি পড়াশোনা করতেন, দূরদর্শী ছিলেন এবং চতুরও। ফরমানের এ বই লেখার মূল কারণ, তিনি ইয়াহিয়া, টিক্কা খানের ঘনিষ্ঠ জন ছিলেন। নিয়াজীর সঙ্গেও যুদ্ধকালীন সহযোগী হিসেবে কাজ করেছেন। ফলে গণহত্যার, বিশেষ করে ১৪ ডিসেম্বর

বুদ্ধিজীবী হত্যার দায়-দায়িত্ব তাঁর ওপরই বর্তিয়েছে। এ দায়-দায়িত্ব ও অভিযোগ থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্যই তাঁকে রচনা করতে হয়েছে বর্তমান গ্রন্থটি।

বইটি কেন তিনি লিখলেন, এ সম্পর্কে ফরমান আলীর ভাষ্য, "অন্য অনেকে যা দেখেছেন বা দেখতে পেরেছেন, আমি তার চেয়ে অনেক বেশি দেখেছি। সেনাবাহিনীর একজন লেঃ কর্নেল হিসেবে ১৯৬২ ও ১৯৬৩ সালে পূর্ব পাকিস্তানে আমার প্রথম সংক্ষিপ্ত সফর কালে এবং পরে অসামরিক প্রশাসনে গুরুত্বপূর্ণ পদে থাকাকালে আমি ছিলাম এই বিয়োগান্ত নাটকের সূচনা, বিকাশ ও মঞ্চায়নের প্রত্যক্ষদর্শী।" শুধু তাই নয়,"অন্য আরো সৈনিকের মতো এটা আমারও দুর্ভাগ্য যাঁদেরকে ১৯৭১ সালের ট্রাজেডিতে টেনে হিঁচড়ে জড়িত করা হয়েছিল।" তিনি আরো লিখেছেন, "যখন পেছন ফিরে দেখি, আমি দেখতে পাই বিপুল পৈশাচিকতা আমার চোখের সামনে উঠে আসছে।" অথচ পাঠক যখন বইটি পড়বেন তখন লক্ষ্য করবেন, এ পৈশাচিকতার কারণ যে পাকিস্তানী বাহিনী তা অস্বীকার করা হয়েছে।

জেনারেল ফরমান লিখেছেন, "আমার এ গ্রন্থের উদ্দেশ্য হল বিভিন্ন ঘটনা ও স্রোতধারাকে, উন্মাদ আবেগ ও সংবেদনহীন পাগলামিকে পাশাপাশি সাজানো এবং ধূর্ত নেতৃবৃন্দের চিত্তাকর্ষক ক্ষমতা ও তাদের সেই সব প্রতারণামূলক শ্লোগান ও অঙ্গীকারের প্রকৃতি উদ্‌ঘাটন করা যা পাকিস্তানের ভাঙন ঘটিয়েছে এবং যার পর পর এসেছে এই ঘৃণ্য নাটকের প্রধান অভিনেতাদের বিনাশ।" এখানেও সেনাবাহিনীর কথা, তাদের ভূমিকা, দায়-দায়িত্ব সম্পূর্ণ অস্বীকার করা হয়েছে।

একই মুখবন্ধে আবার তিনি কিছু বাস্তব সত্যও তুলে ধরেছেন। যেমন, লিখেছেন–"মুসলিম মানসই এমন যে, তা বীরত্বপূর্ণ বাগাড়ম্বর ও অতিরঞ্জন দাবি করতে ভালোবাসে।" জেনারেলদের বইগুলো তার প্রমাণ। "সঠিক ও সময়োচিত পদক্ষেপ নেয়া হলে আমার ঢাকার ঘটনা প্রবাহকে সহজেই রক্ষা করতে পারতাম–যার পরিণতি ছিল আত্মসমর্পণ। আমার কথাটি হল, আমরা ইতিহাস থেকে শিক্ষা নেব, না হলে অতীত ভুলের পুনরাবৃত্তির জন্য আমাদেরকে নিন্দিত হতে হবে।" একজন বাস্তবাদীর কথা, যা রাজনীতিবিদরা, বিশেষ করে বাংলাদেশের, ১৯৭১ সালের বহু আগ থেকেই বলছিলেন।

মুখবন্ধের উপসংহারে পাকিস্তানের সাম্প্রতিক অবস্থা নিয়ে যে মন্তব্য করেছেন তা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। লিখেছেন তিনি, "আমরা পূর্ব পাকিস্তানে একটি বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন দেখেছি, এখন আরেকটি দেখছি সিন্ধুতে–যদিও এটা অতটা বিপজ্জনক নয়। এর মীমাংসা করতে হবে রাজনৈতিক পন্থায় এবং আর্থ-সামাজিক পদক্ষেপের মাধ্যমে। শক্তি প্রয়োগ বিপরীত ফল ঘটাবে ... আমরা প্রশাসনিক পদক্ষেপের মাধ্যমে পাকিস্তানকে রাষ্ট্র হিসেবে পরিচালনা করছি। জাতি গঠনের জন্য প্রয়োজন উদার দার্শনিক ও মনস্তাত্ত্বিক মনোভাব এবং জনগণের মন তৈরি করার জন্য শিক্ষামূলক পদক্ষেপ।"

ফরমান আলী বলছেন, "আমাদের সমাজের সকল অংশই জ্ঞাতসারে বা অন্য কোনোভাবে পাকিস্তানের ভাঙ্গন ঘটানোয় অবদান রেখেছে। রাজনীতিবিদ, সাধারণ আমলা, পররাষ্ট্রনীতি প্রণেতা, সংবাদপত্র এবং পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্র সমাজ কেউই গঠনমূলক পথে তাদের ভূমিকা পালন করেনি, বরং তারা আগুনে ইন্ধন যুগিয়েছে।'' কিন্তু মূল বইয়ে এর কোন প্রতিফলন পাওয়া যাবে না শুধু শেষের দু'লাইনের বক্তব্য ছাড়া।

এভাবে ফরমান আলীর কাহিনী এগিয়েছে। বাস্তব পরিস্থিতি তিনি বুঝেছেন, বুঝতেনও; কিন্তু সেগুলো তিনি সুচতুরভাবে অস্বীকার করে গেছেন। তাই ফরমান আলীর বই শেষ করলে আমরা দেখবো, তাতে অতিরঞ্জন আছে, অর্ধসত্য আছে, আবার সত্যও আছে। এবং এ সব কিছু তিনি এমনভাবে মিলিয়েছেন যে, তাঁর লেখা পাঠকের কাছে অনেক সময় অনেক ক্ষেত্রে বিশ্বাসযোগ্য মনে হবে। এ কৌশল তাঁর জন্য ভালো, কিন্তু ইতিহাস বা ভবিষ্যতের জন্য ভয়ংকর। তবে ঝাড়াই-বাছাইয়ের পরও এ বইয়ের এমন কিছু তথ্য বা জানার বিষয় আছে যা ১৯৭১ সালের ইতিহাস রচনার জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

জেনারেল ফরমানের বলার ভঙ্গিটিও উল্লেখ্য। এমন এক ভঙ্গিতে তিনি লিখেছেন যা পড়ে মনে হবে, আসলে বাংগালিদের প্রতি তাঁর কোন বিদ্বেষ নেই। ঘটনাচক্রে ১৯৭১ সালে তিনি জড়িয়ে পড়েছিলেন মাত্র। শেখ মুজিবের সঙ্গে যে তাঁর সুসম্পর্ক ছিল এ কথা বারবার উল্লেখ করতে তিনি ভোলেন নি। এর মাধ্যমে তিনি এই ইঙ্গিত করতে চেয়েছেন যে, যার সঙ্গে স্বয়ং মুজিবের সুসম্পর্ক সেই লোক কতোটা খারাপ হতে পারে?

আমি এখন সংক্ষেপে বইয়ের মূল বিষয় ও জেনারেল ফরমান আলীর মনোভঙ্গি তুলে ধরার চেষ্টা করবো।

৩

পাকিস্তানী জেনারেলদের মধ্যে রাও ফরমান আলী সবচেয়ে বেশি দিন ছিলেন বাংলাদেশে। এক পর্যায়ে ১৯৬৭ থেকে ১৯৭১ সাল পর্যান্ত। সামরিক আইন জারির পর থেকে সামরিক বাহিনীর পক্ষ থেকে তিনি বেসামরিক প্রশাসনের দেখাশোনা বেশি করেছেন। স্বভাবতই অন্য জেনারেলরা তাঁকে প্রভাবশালী মনে করতেন এবং ভাবতেন তিনি ইয়াহিয়ার ঘনিষ্ঠ জন। জে. জিয়াউল হকের অন্যতম সহকর্মী জেনারেল আরিফও লিখেছেন তাঁর স্মৃতিকথায়–ফরমান ছিলেন ইয়াহিয়ার প্রিয়পাত্র যার কথায় প্রেসিডেন্ট গুরুত্ব দিতেন এবং তিনি যে প্রভাবশালী ছিলেন তার প্রমাণ তাঁর নিয়োগ। ঘনিষ্ঠ যে তিনি ছিলেন তা বোঝা যায় তাঁর স্মৃতিকথা পড়লেও। যদিও বার বার তিনি একথা লিখতে ভুল করেন নি যে,'পূর্ব-পাকিস্তান' সম্পর্কে তাঁর পরামর্শগুলো প্রেসিডেন্ট বা জেনারেল হামিদ ও পীরজাদা কেউ-ই রাখেন নি।

পাকিস্তানের অন্য জেনারেলদের লেখা বই থেকে ফরমানের বইটি ভিন্ন ধরনের। এ বই পড়ে বোঝা যায়, তিনি বেসামরিক জগতের খবরাখবর রাখতেন, পড়াশোনাও করতেন এবং দু'বার ভেবে কদম ফেলতেন। অন্য জেনারেলদের মতো বাংগালিদের সম্পর্কেও তাঁর কিছু পূর্ব ধারণা ছিল এবং অনিচ্ছা সত্ত্বেও কোথাও তা প্রকাশ পেয়েছে। এ পূর্ব ধারণার বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। কারণ পূর্ব ধারণা থাকলে যে কোন সিদ্ধান্তে পূর্ব ধারণা প্রভাব ফেলে এবং ফরমান তাঁর লেখায় সচেতনভাবে একটা ভারসাম্য রাখার চেষ্টা করেছেন। তাঁকে একদিকে পশ্চিম পাকিস্তানের কথা খেয়াল রাখতে হয়েছে, অন্যদিকে পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি যে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি নমিত ছিল তাও দেখাতে হয়েছে। সেজন্য দেখি, পূর্ব পাকিস্তানের দৃষ্টিভঙ্গিও তিনি তুলে ধরতে চেয়েছেন। এর আরো একটি কারণ থাকতে পারে তিনি ঘনিষ্ঠভাবে পূর্ব পাকিস্তানের ঘটনাবলী প্রত্যক্ষ করেছেন, রাজনীতিবিদদের সঙ্গেও তাঁর যোগাযোগ ছিল। তবে, আরেকটি বিষয় বাদ দেওয়া যায় না। ১৪ ডিসেম্বর বুদ্ধিজীবী হত্যার সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল বলে অভিযোগ আনা হয়েছে যে কারণে হয়ত তিনি অমনভাবে লিখেছেন, অনেকের সঙ্গে কথোপকথন উদ্ধৃত করেছেন, যার সত্যতা এখন নির্ণয় করা যাবে না। তাঁর ভঙ্গিটা এরকম–পাকিস্তান এক ছিল। যে কোন কারণেই হোক দু'পক্ষের যুদ্ধ হয়েছে যার জন্য মূলত রাজনীতিবিদরাই দায়ী। দু'পক্ষই হত্যাকাণ্ড করেছে। কিন্তু আমরা তো এক সময় এক সঙ্গে ছিলাম। আমরা তো জানি, যা ঘটেছে তার অনেকটাই অতিরঞ্জিত। এরকম একটা ভাব আছে। তিনি দেখাতে চেয়েছেন, তিনি বঙ্গবন্ধুর ঘনিষ্ঠ ছিলেন। সুতরাং তাঁর বিরুদ্ধে হত্যার সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিযোগ কি ঠিক? অনেক বর্ণনায় অর্ধসত্য আছে। ফলে ইংরেজিতে লেখা এ বই পড়ে ধারণা অন্যরকম হতে পারে।

বাংগালিদের সম্পর্কে সামগ্রিকভাবে পশ্চিম পাকিস্তানীদের পূর্ব ধারণা কি ছিল তা বিধৃত হয়েছে ফরমান আলীর বইয়ের প্রথম অধ্যায়ের প্রথম লাইনেই। লিখেছেন তিনি, ছোটবেলা থেকে বাংগালিদের সম্পর্কে যে কথা শুনেছেন তা হচ্ছে–বাংগালি বাবু, বাংগালি জাদু এবং ভুখা বাংগালি। বাংগালি বাবু অর্থাৎ শিক্ষিত বাংগালি কেরানীকুল; আরো নির্দিষ্টভাবে শিক্ষিত বাংগালি হিন্দু কেরানীকুল যাদের কথা মনে হলেই চোখের সামনে ভেসে উঠতো বৃটিশদের হয়ে তারা পুরনো শাসক মুসলমানদের যাঁতাকলে পিষছে। বাংগালি জাদু শুনে এসেছেন, পশ্চিমা কেউ বাংগাল গেলে থেকে যায়। কেন? এ কারণে এক ধরনের ভয় ও কৌতূহল সৃষ্টি হয়েছিলো বাংলা ও বাংগালিদের সম্পর্কে। আর বাংগালি ভুখা। প্রাকৃতিক কারণে বাংলায় সব সময় খাদ্যের অভাব থাকে এবং বাংগালীরা ভুখা থাকে যা তিনি স্বচক্ষে দেখেছেন ১৯৪৩ সালে মন্বন্তরের সময়।

১৯৬২ সালে ফরমান তৃতীয়বারের মতো এবং পাকিস্তান হওয়ার পর প্রথমবারের মতো পূর্ব বাংলায় আসেন এবং আশ্চর্য হয়ে যান এ কারণে যে, বাংগালিরা তখন ১৯৪৬ সালের

হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গার কথা ভুলে গেছে, বরং বলাবলি করছে পশ্চিম পাকিস্তানের শোষণের কথা অর্থাৎ পশ্চিম পাকিস্তানীরা জানতো না যে, কেন্দ্রীয় সরকার শোষণ, নিপীড়ন চালাচ্ছে এবং বাংগালিদের মনোভাব বদলে গেছে।

দ্বিতীয়বার পূর্ব বাংলায় এসে ফরমান কিছুদিন ছিলেন। তখনও এ পরিবর্তন লক্ষ্য করেছেন। দেয়ালে দেয়ালে আইয়ুববিরোধী শ্লোগান, মোনেম খানের প্রতি ঘৃণা। কেননা তিনি আইয়ুবের ধামাধরা। হ্যাঁ, পাকিস্তানের উন্নতি হচ্ছিলো, পূর্ব পাকিস্তানের জিএনপিও বাড়ছিলো কিন্তু মানসিক মিল আর ছিলো না।

১৯৬৭ সালে ঢাকায় তিনি নিয়োগ পান। তার আগে তাঁকে ডিডিএমও নিয়োগ করা হয়। এখানে একটি ঘটনার তিনি উল্লেখ করেছেন যাতে সেনাবাহিনীর দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায় বাংগালিদের সম্পর্কে। অবশ্য, একথা তিনি স্বীকার করেন নি।

ঘটনাটি এরকম। লেঃ কর্নেল ওসমানী ছিলেন তাঁর সিনিয়র ও ডিডিএমও। ফরমান তাঁর কাছে চার্জ বুঝে নিতে গেলে দেখেন যে, ওসমানীর কাছে কোন ফাইলই যেতো না। চাপরাশিরাও তাঁকে অবজ্ঞা করতো। তাঁর অফিস ছিল ধুলিপড়া, ম্লান-বিবর্ণ, অথচ মিলিটারি অপারেশন বিভাগটি গুরুত্বপূর্ণ। ফরমান লিখেছেন, পাকিস্তান বাহিনীতেও তাঁকে প্রমোশনের যোগ্য মনে করা হয়নি। হয়ত বাংগালি বলেই তাঁকে বিশ্বাস করা হতো না। কথাটি সত্য এবং নিজের অজান্তেই তিনি তা উল্লেখ করেছেন।

১৯৬৭ সালে এখানে এসে তাঁর মনে হয়েছিলো, পাকিস্তান ভেঙে যাওয়ার ঝোঁক দেখা দিচ্ছে। বাংলাদেশের দাবি নিয়ে প্রকাশ্যে আলোচনা চলছে। উর্দু ভাষা ও উর্দু ভাষাভাষীদের প্রতি ঘৃণা উপচে পড়ছে। ছাত্ররা বিক্ষুব্ধ এবং জনগণের ওপর তাদের প্রভাব অত্যন্ত বেশি। হরতালের সময় ছাত্ররা যদি বলতো পাখি উড়বে না আকাশে, তাহলে পাখি তাও মেনে চলতো। একটি পোস্টারের কথা উল্লেখ করেছেন তিনি। পোস্টারে ছিল, পাগড়ি পরা বলিষ্ঠ একটি লোক ক্ষুদ্রকায় ধুতি পরা একজনকে আলিঙ্গন করছে, হাতে তার লুকোনো একটি ছুরি অর্থাৎ পশ্চিম পাকিস্তান বিশ্বাসঘাতক। পাঠক এখানে ছোট একটি শব্দ 'ধুতি' শব্দটি লক্ষ্য করুন অর্থাৎ বাংগালিরা হিন্দু অর্থাৎ ভারতের দাস। এর ভিত্তি সেই পূর্ব ধারণা। কারণ এতো বছর বাংলাদেশে থেকে ফরমান আলী ধুতি ও লুঙ্গির পার্থক্য বুঝতে পারেন নি, তা কি আশ্চর্য নয়? ফরমান লিখেছেন, ইসলাম ও ভ্রাতৃত্ববোধ নিয়ে যে পাকিস্তান গঠিত হয়েছিলো বোধ হয় তার আর অবশিষ্ট ছিল না। তাঁর ভাষায়: "It had electrified the entire man of Bhooka Bengali with rage against a distant cousin, West Pakistan for supposedly having snatched away everything from him. History was sought to be falsified and disowned, presumaly in vain as has been testified by the two decades that have passed since Pakistan's breakup." এ অনুচ্ছেদের সঙ্গে তাঁর পূর্বের

অনেক অনুচ্ছেদের মিল নেই। ওসমানীর ঘটনাটি তো তিনি নিজেই উল্লেখ করেছেন। এখানে ইতিহাস অতিরঞ্জনের বা মিথ্যা কথনের কোন অবকাশ নেই।

এরপর কিন্তু তিনি আবার পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের বৈষম্যের কথা উল্লেখ করেছেন। বৈষম্য থাকলেই অসন্তোষ থাকবে, এতো স্বাভাবিক। কিন্তু সেই স্বাভাবিক সত্য তিনি উল্লেখ করেন নি। তারপর জানাচ্ছেন আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার কথা যা তাঁর ভাষায় সত্য ছিল। এ মামলা করার সময় তিনি আসামীর তালিকা থেকে শেখ মুজিবের নাম বাদ দিতে বলেছিলেন, কিন্তু গোয়েন্দা প্রধান মেজর জেনারেল আকবর মুজিবের নাম অন্তর্ভুক্ত করে বলেছিলেন, এর ফলে "লোকে তাঁর চামড়া তুলে নেবে।" না, তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী ঠিক হয়নি, বরং ইতিহাস উল্টোটা বলে। আগরতলা মামলা যে ঠিক ছিল তা প্রমাণে তিনি লেখক মোয়াজ্জেম হোসেনের স্ত্রীর একটি চিঠির উদ্ধৃতি দিয়েছেন ১৯৭২ সালের ২৬ মার্চের 'পূর্বদেশ' থেকে। চিঠিটি আমি দেখিনি তবে ফরমান আলীর ইংরেজি উদ্ধৃতি থেকে অনুবাদটি এরকম: "প্রিয় স্বামী... তুমি আজ আমার সঙ্গে নেই। বাংলাদেশের স্বাধীনতায় তোমার অবদানের কথা মনে পড়ছে। মনে পড়ছে, কিভাবে ছদ্মনামে করাচী থেকে ঢাকায় এসে আগরতলা সীমান্তে ভারতীয় ও বাংগালি অফিসারদের নিয়ে তুমি দেখা করেছিলে ভারতীয় দূতাবাসের প্রথম সচিব পি.এন. ওঝার সঙ্গে। অস্ত্র ও অন্যান্য সাহায্যের জন্য তুমি ভারতীয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলাপ করেছিলে...।" তিনি দেখাতে চেয়েছেন, ভারত কতিপয় বাংগালীর সাহায্যে অনেকদিন থেকেই পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছিলো। অবশ্য, শেখ মুজিবের সম্পৃক্ততা সম্পর্কে তিনি কোন প্রমাণ দাখিল করতে পারেন নি। "এই সময়ই ভুট্টোর সঙ্গে ইয়াহিয়ার সম্পর্ক গড়ে ওঠে।"–উক্তি থেকে ধরে নিতে পারি ১৯৭১ সালের পটভূমিকা তখন থেকেই সৃষ্টি হচ্ছিলো।

ফরমান আলীর বইয়ের দ্বিতীয় অধ্যায় ১৯৭০ সালের নির্বাচন। এখানে তাঁর একটি উক্তি মনে রাখার মতো। কিভাবে নির্বিকারে মিথ্যাকে যুক্ত করতে হয় ন্যারেটিভের সঙ্গে তার একটি প্রমাণ ১৯৭০ সালের নির্বাচন সম্পর্কে তাঁর কয়েকটি উক্তি। তিনি লিখেছেন, ১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ প্রচুর টাকা খরচ করেছে এবং সে টাকা এসেছে ভারত থেকে। ১৯৭০-এ আমরা যারা ছিলাম বাংলাদেশে তাদের কি তা মনে হয়েছে? এসব উক্তির কারণ, এ সিদ্ধান্তে পাঠককে নিয়ে যাওয়া যে, ১৯৭১ সালের পুরো ব্যাপারটাই ছিল ভারতীয় ষড়যন্ত্র ও হস্তক্ষেপের ব্যাপার। সেই পূর্ব ধারণা! তিনি আরো লিখেছেন, এ সময় ইয়াহিয়ার সঙ্গে মুজিবের ভালো সম্পর্ক গড়ে উঠেছিলো। কারণ শেখ সাহেব ইয়াহিয়াকে বলেছিলেন প্রেসিডেন্ট করবেন।

এ প্রসঙ্গে অজান্তে রাও কিছু তথ্য দিয়েছেন যা থেকে বোঝা যায় সামরিক বাহিনী গোপনে কিভাবে রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ করছে এবং তা নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করছে। নির্বাচনে

সেনাবাহিনী ডানপন্থী দলগুলোকে অর্থ দিয়ে সাহায্য করেছিলো। পরে শেখ মুজিব তা জানতে পেরে অনুযোগ করায় রাও বলেছিলেন, পার্লামেন্টে ডানপন্থী কিছু সদস্য গেলে র‍্যাডিক্যালদের হাত থেকে মুজিব মুক্তি পাবেন। তারপর তিনি বলছেন, পূর্ব পাকিস্তানীরা শেষ পর্যন্ত পাকিস্তানের প্রতি অনুগত ছিল। তাদের নেতারাই তাদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছে আর পশ্চিম পাকিস্তানের নেতারা তাদের ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে। রাও আগে যেসব মন্তব্য করেছেন, এ মন্তব্য তার বিপরীত। তবে কেন এ পর্যায়ে তিনি এই উক্তি করেছেন তা বোঝা যায়। কারণ এরপর থেকে তিনি রাজনৈতিক নেতাদের খালি দোষারোপ করেছেন।

তিনি বলছেন, রাজনীতিবিদরা সব সময় দু'মুখো নীতি গ্রহণ করেছিলেন। যেমন, মওলানা ভাসানীও ইয়াহিয়ার সঙ্গে একটি বৈঠকের সময় তিনি উপস্থিত ছিলেন। ভাসানীর আন্দোলনের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করায় মওলানা বলেছিলেন,"আপনি গদিতে বসে আছেন, বসে থাকুন। আমরা আন্দোলনকারী, আন্দোলন করেই যাবো। আপনার গদিতে আপনি থাকুন।" পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্রদের কথা উল্লেখ করে তিনি লিখেছেন, রাজনৈতিক আন্দোলনে তাদের প্রভাব সম্পর্কে পশ্চিম পাকিস্তানীদের কোন ধারণাই নেই। তারপর অবশ্য একটি সত্য মন্তব্য করেছেন। তাঁর ভাষায় : "The Army had been ruling over East Pakistan for a long time. All political leaders wanted to get rid of them, and probably rightly so. Army has no right to rule. They may come in to restore law and order but they should handover power to the civilian authority as soon as possible."

৪

নির্বাচন চুকে-বুকে গেলো। আওয়ামী লীগের "অফিসিয়াল স্ট্যান্স" ছিল শাসনতান্ত্রিক। শুধু তাই নয়, ছয় দফার ক্ষেত্রে মুজিব নমনীয় হতেও রাজি ছিলেন। কিন্তু ভুট্টো নমনীয়তা দেখাতে রাজী হননি, বরং ইয়াহিয়ার মনকে তিনি বিষিয়ে তুলেছিলেন। ১৭ জানুয়ারি ইয়াহিয়া ভুট্টোর আমন্ত্রণে লারকানায় যান। ভুট্টো বলেছিলেন, জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বাতিল করে ইয়াহিয়ার উচিত মুজিবের আনুগত্য পরীক্ষা করা। যদি এই স্থগিতকরণের বিরুদ্ধে আন্দোলন করেন তাহলে বুঝতে হবে তিনি পাকিস্তানের প্রতি অনুগত নন। ভুট্টো কি ছিলেন এ উক্তি তার প্রমাণ।

১৯ ফেব্রুয়ারি ফরমান ইয়াহিয়ার সঙ্গে দেখা করেছিলেন। এ সময় ইয়াহিয়ার সঙ্গে তাঁর কথোপকথনের বিবরণ দিয়েছেন। ইয়াহিয়া বলেছিলেন : "I am going to sort out that Bastard." I said,"Sir, he is no longer a bastard. He is an elected representative of the people and now represent whole of Pakistan. I recommend that you

handover power to Mujib. I assure that he will be the most unpopular man in East Pakistan within six months."

যিনি রাজনীতিবিদদের সমালোচনায় মুখর তিনি মুজিবের পক্ষে ওকালতি করবেন। ভাবতেই অবাক লাগে! এ মন্তব্যের সত্যতা যাচাইয়ের উপায় নেই। এমনও হতে পারে, রাও এ মন্তব্যে দেখাতে চেয়েছেন তিনি ছিলেন শাসনতান্ত্রিক শাসনের পক্ষে।

অন্যদিকে, ফরমান লিখেছেন, জেনারেলরা ভুট্টোকে চাপের মুখে রাখছিলো যাতে মুজিব ক্ষমতায় যেতে না পারেন। ভুট্টোর সঙ্গে অনেকদিন ধরে জেনারেলদের সখ্য ছিল। উপর্যুক্ত এই দুই উক্তিতে ফরমান এই ইঙ্গিতই করতে চেয়েছেন যে, তিনি অন্য জেনারেলদের মত রক্তপিপাসু নন। তিনি আলাদা। এভাবে তিনি পাঠককে তৈরি করতে থাকেন যাতে বাংলাদেশের গণহত্যার সঙ্গে তাঁর যোগাযোগের কথা বিশ্বাসযোগ্য না হয়। That Punjabi Army circle put pressure on Bhutto to ensure that power does not go to Mujib is quite plausable and significant by itself. It does not have to be Forman Ali's defence.

২৩শে ফেব্রুয়ারি ইসলামাবাদে বৈঠক হয়েছিলো এম.এল.এ.দের। এডমিরাল আহসান, লে. জেনারেল ইয়াকুব ও মে. জেনারেল ফরমান একমত হয়েছিলেন যে, জাতীয় পরিষদের অধিবেশন না হওয়ার অর্থ সামরিক হস্তক্ষেপ অর্থাৎ তা হলে বিশৃঙ্খলা হবে এবং ভারতীয় সেনাবাহিনী হস্তক্ষেপ করবে এ বিষয়ে একমত হয়ে তাঁরা ইয়াহিয়াকে লিখেছিলেন। ঢাকায় ফিরে আহসান আওয়ামী নেতৃবৃন্দকে ডেকে জানালেন যে, ১লা মার্চ জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত করা হয়েছে।

তিনি তাজউদ্দিন ও মুজিবের কিছু মন্তব্যের উল্লেখ করেছেন। লক্ষণীয় যে, তিনি তাজউদ্দিনকে অপছন্দ করতেন, তার আরো উদাহরণ দেয়া যাবে। এ ক্রোধের কারণ, তাজউদ্দিন মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্ব দিয়ে তা সফল করেছিলেন। অন্যদিকে তিনি মুজিবকে সব সময় নমনীয় দেখাতে চেয়েছেন। এটিই তুলে ধরতে চেয়েছেন যে, মুজিব যদি র‍্যাডিক্যালদের থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারতেন তা'হলে ১৯৭১ হতো না। কিন্তু কিছু বিষয় যে অনিবার্য হয়ে উঠেছিলো তা ফরমানের মাথায় আসেনি। ইতিহাসের অনিবার্য স্রোতে অনেক সময় ব্যক্তি তুচ্ছ হয়ে যায়।

আহসান, ইয়াকুব ও ফরমান জাতীয় পরিষদ স্থগিতের ঘোষণা শুনে ইসলামাবাদে জেনারেল হামিদের সঙ্গে যোগাযোগ করলেন এবং তাঁকে অনুরোধ জানালেন নতুন তারিখ ঘোষণার জন্য। সিদ্দিক সালেক লিখেছেন, এ ঘোষণার পরও মুজিব শান্ত ছিলেন এবং বলেছিলেন, "এ নিয়ে আমি কোন ঘটনা সৃষ্টি করবো না যদি আমাকে নতুন কোন তারিখ দেওয়া হয়। যদি নতুন তারিখটি সামনের মাসে (মার্চ) হয়, আমি পরিস্থিতি সামলাতে পারবো। এপ্রিল হলে কষ্টকর হবে। কিন্তু স্থগিতকরণটি যদি অনির্দিষ্টকালের জন্য হয় তা হলে পরিস্থিতি সামলানো আমার পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়বে।" মুজিব বাস্তব অবস্থা অনুধাবন করেছিলেন। ইসলামাবাদ থেকে

কোন উত্তর এলো না। ফরমান এ প্রসঙ্গে ঠিকই লিখেছেন, ১ তারিখ পরিষদের অধিবেশন স্থগিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বলা যেতে পারে পাকিস্তান ভেঙ্গে গেলো।

এরই মাঝে নাটকীয়ভাবে গভর্নর আহসানকে ক্ষমতাচ্যুত করা হলো। ঐদিন আহসান ইয়াকুব ও ফরমান বসে আলাপ করছেন। এমন সময় পীরজাদার ফোন। আহসান ফোন ধরলেন। কিন্তু পীরজাদা চাইলেন ইয়াকুবকে। আহসান ইয়াকুবকে ফোন দিলেন। কিছুক্ষণ পর ফোন রেখে ইয়াকুব বললেন, "এখন আমিই গভর্নর।'' আহসান বললেন, "ঠিক আছে, আমি গভর্নর হাউস ছেড়ে দিচ্ছি।'' ইয়াকুব কিছুই বললেন না। ফরমানের কাছে বিষয়টি ভালো লাগেনি। কারণ ইয়াকুব আহসানকে কোন সমবেদনা জানান নি। ছয় তারিখ আহসান খান চলে যান তখন তাঁর স্টাফদের চোখে ছিল পানি।

এরপর বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে লুটপাট শুরু হলো- লিখেছেন ফরমান এবং এক্ষেত্রে ফরমান বিষয়টি অতিরঞ্জিত করে বর্ণনা করেছেন অন্যান্য পাকিস্তানীর মতো। লিখেছেন তিনি, The act of kidnapping and raping of non-local young girls and throwing of children into burning house were never heard of in Pakistan since its inception. But this is what was actually happening."

পাঠক, এ ধরনের কোন ঘটনা কি ঘটেছিলো? কিন্তু ফরমান কেন অতিরঞ্জন করেছেন? কারণ এভাবে তিনি পাকিস্তানী বাহিনীর নৃশংসতার যৌক্তিকতা খুঁজেছেন অর্থাৎ এসব কারণে পাকিস্তান সরকার ও সেনাবাহিনী ক্ষুব্ধ হয়ে উঠছিলো এবং ২৫ মার্চ হস্তক্ষেপ করা ছাড়া কোন উপায় ছিল না।

আহসান চলে যাওয়ার পর ইয়াকুবের বাসায় একদিন রাতে খেতে গেছেন ফরমান। জেনারেল খাদিমও ছিলেন সেখানে। এ সময় পীরজাদার ফোন। তিনি জানালেন, প্রেসিডেন্ট ঢাকায় আসতে পারবেন না। ইয়াকুব বললেন, তা'হলে যেন তাঁর পদত্যাগপত্র গ্রহণ করা হয়। ফরমান ও খাদিমও বললেন ইয়াকুবকে, এ সঙ্গে যেন তাঁদের পদত্যাগপত্রও গ্রহণ করা হয়।

জেনারেল খাদিম ও ফরমান আলীর এরপর পাকিস্তান যাবার কথা। ফরমান ভাবলেন, যাবার আগে মুজিবের সঙ্গে যোগাযোগ করে যাবেন যাতে তাঁর সর্বশেষ অবস্থান জানা যায়। মুজিবের সঙ্গে দেখা করে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "পাকিস্তানকে কি বাঁচানো সম্ভব?'' মুজিব বললেন, "সম্ভব, যদি আমার কথা শোনা হয়। আমরা এখনও আলোচনায় প্রস্তুত।'' এমন সময় পর্দার ওপাশ থেকে যেন কে সরে গেলেন! তাজউদ্দিন। মুজিব তাঁকে ডাকলেন। ফরমান তাঁকে একই প্রশ্ন করলেন। তাজউদ্দিন বললেন, দেশ জুড়ে যে বর্বরতা চলছে তার কারণ ভুট্টো। তাঁর সঙ্গে বসা যাবে না। পাকিস্তান বাঁচানো সম্ভব যদি দুটি পরিষদ হয়। দু'টি পরিষদ আলাদাভাবে নিজেদের শাসনতন্ত্র রচনা করবে। তারপর এক সঙ্গে মিলিত হয়ে পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র রচনা করবেন। ফরমানের ভাষায়, এক কথায় কনফেডারেশন। এরপর তাজউদ্দিন সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য: "Tajuddin, the die-hard Pro-Indian Awami

Leaguer, came in and sat down. He hated West Pakistan and perhaps Pakistan itself. He was reputed to have been a Hundu up to the age of 8. I do not think this story was correct but it revealed his mental make-up." কেন এ ধরনের মন্তব্য তা আগেই উল্লেখ করেছি।

অন্যদিকে, এর বিপরীতে হত্যাকারী জেনারেল টিক্কা সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য দেখুন, "He was a straightforward, honest and obedient soldier, a man with determination and a strong will."

৭ মার্চ থেকে এখানে অদৃশ্য সরকার চালু হলো। ১৫ তারিখ ইয়াহিয়া এলেন ঢাকায়। ফরমানের সঙ্গে আলোচনায় ইয়াহিয়া এমন একটি মন্তব্য করেছিলেন তা ফরমানকে চমকিত করেছিলো। ইয়াহিয়া বলেছিলেন, যেখানে জাতির পিতারই দু'টি পাকিস্তানের ব্যাপারে আপত্তি ছিল না সেখানে এই আইডিয়ার বিরুদ্ধাচরণ করার তিনি কে?

২১ তারিখ ঢাকায় আলোচনা শুরু হলো। মুজিব একবারও সরাসরি ভুট্টোর সঙ্গে কথা বলেন নি। ইয়াহিয়ার মাধ্যমেই কথাবার্তা চলেছে।

২৫ তারিখের অপারেশন সার্চ লাইটের ব্যাপারে জেনারেল খাদিম ও জেনারেল ফরমান ইচ্ছুক ছিলেন না। এ কথা ফরমান যেমন লিখেছেন, অন্য জেনারেলওরাও তা উল্লেখ করেছেন। সালিকও লিখেছেন, "এ দু'জনের ব্যাপারে সদর দফতরের আস্থা ছিল না।" জেনারেল হামিদ দু'জনের স্ত্রীর সঙ্গে আলাদা আলাদাভাবে কথা বলেন। পরে দু'জনই জানান তাঁরা আদেশ পালন করবেন।

অন্যদিকে অপারেশন সার্চলাইট সম্বন্ধে তদানিন্তন সিভিল সার্ভেন্ট হাসান জহির তার *The Separation of East Pakistan* বইতে বলেছেন: "Major General Forman Ali was the executor of Dhaka part of 'Searchlight'. He succeeded is 'Shock action' by concentrated and indiscremenation firing on target areas.... অর্থাৎ মেজর জেনারেল ফরমান আলী ছিলেন অপারেশন সার্চলাইট অর্থাৎ পঁচিশে মার্চে ঢাকা অংশের কালোরাতের বিভীষিকার হোতা।

কিন্তু ২৫ মার্চের রাত সম্পর্কে ফরমান যখন বর্ণনা দেন তখন তিনি অন্যান্য পাকিস্তানী জেনারেলের মতোই সত্য গোপন করেন এবং এমন ভাষ্য তৈরি করেন যা পাকিস্তানীদের বিবেক শান্ত করতে পারে কিন্তু আমাদের নয়।

লিখেছেন তিনি, কথা ছিল শুধু নেতাদের ধরা হবে এবং কোন রক্তপাত হবে না। কিন্তু এ নির্দেশও ছিল, ইয়াহিয়া করাচী না পৌঁছা পর্যন্ত যেন অপারেশন শুরু করা না হয়। কারণ

তাদের ধারণা ছিল তাহলে ভারতীয় জঙ্গী বিমান প্রেসিডেন্টের প্লেন আটকে দিতে পারে। প্রেসিডেন্ট পলালেন। জেনারেলরা ভাবলেন, কেউ জানলো না, কিন্তু ফরমান জানাচ্ছেন বিমানবন্দর থেকে উইং কমান্ডার খোন্দকার পালিয়ে যাওয়া দেখেন এবং সঙ্গে সঙ্গে মুজিবকে তা জানিয়ে দেন। সালিকও তাই লিখেছেন। তাঁরা বলতে চাচ্ছেন, এভাবে আওয়ামী লীগ সতর্ক হয়ে যায় এবং প্রস্তুতি নেয়।

ফরমান জানাচ্ছেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আক্রমণ করলে সবচেয়ে বেশি প্রতিরোধ এসেছিলো জগন্নাথ হল থেকে। কারণ সেখানে হিন্দুরা থাকতো এবং তারা ছিল পাকিস্তান-বিদ্বেষী। তাহলে প্রশ্ন, মুসলমান ছাত্ররা কি পাকিস্তানীদের পক্ষে ছিল? কেউ কেউ বলেন, লিখেছেন ফরমান, যে সৈন্যদের হাতে ছাত্ররা নিহত হয়েছে। কিন্তু এ প্রশ্নও করা উচিত, লিখেছেন তিনি : "When does a student cease to be a student? The answer that a student ceases to be student when he carries arms should clear the Army of the charge; all those who were killed were carrying arms, had refused to stop firing and accept order to surrender."

পাকিস্তানী সব জেনারেলই ২৫ মার্চ এভাবে দেখেছেন। জেনারেল আরিফ তো ২৫ মার্চের কথাই উল্লেখ করেন নি। তিনি লিখেছেন, ২৫-২৬ মার্চ আওয়ামী লীগ ও তার সহযোগীরা পূর্ব পাকিস্তানের সেনানিবাসগুলোতে যেসব পশ্চিম পাকিস্তানী ছিল তাদের পরিবার-পরিজনসহ ঠাণ্ডা মাথায় হত্যা করেছিল। চাটগাঁয় ২৫ মার্চ থেকে ১১ এপ্রিল পর্যন্ত হাজার হাজার পশ্চিম পাকিস্তানী ও বিহারীদের হত্যা করা হয়। এ কারণে সৈন্যদের মধ্যে আবেগের সৃষ্টি হয় এবং সবশেষে যখন স্বাভাবিকতা ফিরিয়ে আনার জন্য সেনাবাহিনী নিয়োগ করা হয় তখন দুষ্কৃতিকারীদের বিরুদ্ধে 'বেশী বল প্রয়োগকারী' কিছু রিপোর্ট পাওয়া গেছে।

ফরমান আলীও গণহত্যার পক্ষে এ ধরনের ওকালতি করেছেন। জানিয়েছেন, গৃহযুদ্ধের সময় দু'পক্ষই জন্তু হয়ে যায়। 'গৃহযুদ্ধ' শব্দটি তিনি ব্যবহার করেছেন যা অনেকে করেন নি। আবার এও লিখেছেন, পাকিস্তান সেনাবাহিনী জাতীয় সেনাবাহিনীর মতো আচরণ করতে পারেনি। কেন পারেনি তার একটি যুক্তিও অবশ্য তিনি দাঁড় করিয়েছেন। "Some of its members exceeded their autority and killed a number of civil and police officials without proper trial. The Army was not able to control Biharis in taking revenge when badly affected areas were liberated by them."

৬

রাও ফরমান আলী তারপর একটি অধ্যায় ব্যয় করেছেন ভারতীয় কারসাজির ব্যাপারে। এ বিষয়ে জেনারেলরা একমত ছিলেন যে, পাকিস্তান ভাঙ্গার চক্রান্ত ভারত ১৯৪৭ সাল থেকেই

করছে এবং এই যে মুক্তিযুদ্ধ চলছে তাও ভারতীয় চক্রান্ত। এই ইল্যুশন থেকে পাক-জেনারেলরা কখনও মুক্ত হতে পারেননি।

ফরমান আলীকে 'পূর্ব পাকিস্তান'-এর সিভিলিয়ান কাজ-কর্ম দেখার দায়িত্ব দেয়া হয়েছিলো। তিনি লিখেছেন, সব সময় তিনি রাজনৈতিক সমাধানের পক্ষে ছিলেন। শান্তি কমিটি গঠনের উদ্যোগ তিনিই গ্রহণ করেন। এজন্য নূরুল আমীন, গোলাম আযম, ফরিদ আহমদ প্রমুখকে ডেকে পাঠালেন। তাঁদের সম্পর্কে ফরমান আলী মন্তব্য–খাঁটি অনুগত পাকিস্তানী। এঁদের দিয়ে বাংগালীদের তিনি জয় করতে চাচ্ছিলেন। অনেক সেনা অফিসারও তাই চেয়েছিলেন। শুধু তাঁরা বুঝতে পারেন নি যে, কাজটি অসম্ভব। ফরমান লিখেছেন, কাজটি সম্ভব হতো যদি না জেনারেল নিয়াজী অন্যরকম চাইতেন। নিয়াজী "Wanted to change the racial character." নিয়াজীর সঙ্গে ফরমানের বনাবনি হয়নি কখনও। ঐ সময় ফরমান লিখেছেন, বাংগালি, পশ্চিম পাকিস্তানী, বিহারী–সবাই নাস্তানাবুদ হচ্ছিলো তার কাছে–এই তিন পর্যায়েই ছিল পাকিস্তানী। যেমন কুমিল্লার ডিসির স্ত্রী এলেন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে। পশ্চিম পাকিস্তানীরা (অর্থাৎ সৈন্যরা) তাঁর স্বামীকে হত্যা করেছে। তাঁর ভাই ছিল সঙ্গে এবং তার বউ পশ্চিম পাকিস্তানী। বউয়ের আত্মীয়-স্বজনকে আবার চিটাগার বাংগালিরা মেরে ফেলেছে।

"জোড় হাতে কাঁপতে কাঁপতে'' টাঙ্গাইলের ডি.সি. এলেন দেখা করতে। পশ্চিম পাকিস্তানী একজন সহকারী কমিশনারকে হত্যার পিছনে তাঁর হাত ছিল। ফরমান তাঁকে আবার কাজে পাঠালেন এবং তারপর "তিনি সম্পূর্ণ সহযোগিতা করেছেন।'' ফরিদপুর, পটুয়াখালীর ডি.সি-কে সেনাবাহিনী গ্রেফতার করলো। ফরমান তাঁদের ছেড়ে দিতে বললেন। তারা শুনলো না। তিনি গভর্নর টিক্কাকে হস্তক্ষেপ করতে বললেন। ফরমান যেটা বলতে চেয়েছিলেন তা হলো-পূর্ব পাকিস্তানে যা চলছিলো তা তাঁর পছন্দ ছিল না। তাঁর পক্ষে যতটুকু করা সম্ভব তিনি করছিলেন। কারণ তাঁর "heart was bleeding." কিন্তু নিয়াজীর জন্য কিছু করা সম্ভব ছিল না। জেনারেলদের এই পছন্দ-অপছন্দ পরে পাকিস্তানী রাজনীতিতেও প্রভাব ফেলেছে। ভুট্টোর সময় টিক্কা ও ফরমান উচ্চপদ পেয়েছিলেন। নিয়াজী নাজেহাল হয়েছিলেন। সুতরাং ফরমান বা টিক্কার বই পড়ার সময় এটি মনে রাখা উচিত।

নিয়াজী সম্পর্কে ফরমান লিখেছেন, তিনি নিজেকে সর্বেসর্বা মনে করতেন। বাংগালিদের তিনি জনগণের শত্রু বলে ঘোষণা করেছিলেন। অন্যদিকে টিক্কা ভালো প্রশাসক ছিলেন বটে, কিন্তু রাজনীতিবিদ ছিলেন না। এ সময় জে. হামিদ এলেন ঢাকায়। রাও অনুরোধ জানালেন তাঁকে যেন পশ্চিম পাকিস্তানে বদলি করা হয়। জে. হামিদ তা শুনলেন না, বরং তাঁকে মেজর জেনারেল করে রাজনৈতিক বিষয়ের ভার দেয়া হলো। ফরমানের মনে হয়েছে, মার্চের শুরুতে সেনাবাহিনীর পরিকল্পনা সমর্থন না করায় তাঁকে এ ধরনের শাস্তি দেয়া হলো। অন্যদিকে নিয়াজী যা তা ব্যবহার করছিলেন, গুজব রটেছিলো যে, তিনি মেয়ে মানুষ নিয়েই থাকতে

ভালোবাসতেন। ঐ সময় পাকিস্তান এখানে আওয়ামী লীগের খালি আসনগুলোতে উপ-নির্বাচনের উদ্যোগ নেয়। এই নির্বাচন সেনাবাহিনীই করেছিলো, এক কথায় কে কতোটা আসন পাবে তাও তারা ঠিক করে দিয়েছিলো। সিদ্দিক সালেকও এই কথা উল্লেখ করেছেন। ডানপন্থী দলগুলো যেহেতু পাকিস্তানী বাহিনীকে সাহায্য করেছিলো তাই "তাদেরকে তিনি পুরস্কৃত করতে চাইছিলেন। আসন ছিল স্বল্প, কিন্তু আকাঙ্ক্ষীদের সংখ্যা ছিল প্রচুর।"

কিন্তু নির্বাচনেও সংকট মোচন হয়নি। কারণ প্রতিটি পর্যায়ই বিপক্ষে চলে যাচ্ছিলো, উল্লেখ করেছেন ফরমান আলী। একবার তিনি টিক্কা খান ও যোগাযোগ সচিব-এর সঙ্গে আলাপ করছিলেন ঢাকা থেকে চট্টগ্রামে কিভাবে খাদ্যশস্য পাঠানো যেতে পারে সে বিষয়ে। তারা ঠিক করেছিলেন রেলে করে চাঁদপুর দিয়ে পাঠাবেন। দু'দিন পর দেখা গেলো চাঁদপুরে রেল লাইন উপড়ে ফেলা হয়েছে অর্থাৎ এ তথ্যটি যোগাযোগ সচিব পাচার করেছিলেন মুক্তিযোদ্ধাদের। অন্যদিকে পশ্চিম পাকিস্তানে বসে প্রেসিডেন্ট বা জেনারেলরা থোড়াই কেয়ার করছিলেন পূর্ব পাকিস্তানের ব্যাপারে। ফরমান ঠিকই লিখেছেন, "The power to be of the future had already written off East Pakistan and were only planning for West Pakistan."

এর পরের অধ্যায়গুলোতে ফরমান মুক্তিযুদ্ধের বর্ণনা, পাকিস্তানীদের ভয় ও হতাশার কথা বিস্তারিতভাবে লিখেছেন। এখানে তাঁর পুনরুল্লেখ করলাম না।

জেনারেল ফরমান লিখেছেন, আত্মসমর্পণে বিশেষ করে মুক্তিবাহিনীর কাছে তিনি রাজি ছিলেন না। নিয়াজীকেও তিনি তাই বলেছিলেন। কিন্তু নিয়াজী আত্মসমর্পণের দলিলে সই করলেন। অবশ্য, নিয়াজী উল্টো কথা বলেছেন।

যুদ্ধবন্দী হিসেবে তারপর যাত্রা। কলকাতায় পৌঁছার পর অ্যাডমিরাল শরিফ নিয়াজীকে বলেছিলেন, "তুমি না কলকাতায় আসতে চেয়েছিলে? এখন পৌঁছে গেছো কলকাতায়।" নিয়াজী প্রায়-ই বড়াই করে বলতেন, সেনাবাহিনী নিয়ে তিনি পৌঁছে যাবেন কলকাতায়।

আগেই উল্লেখ করেছি, জেনারেল ফরমান কিছু সত্য, কিছু অর্ধসত্য ও কিছু মিথ্যা মিলিয়ে বইটি রচনা করেছেন। কারণ তাঁর অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল এ কথা বলা যে, 'পূর্ব পাকিস্তানে যে হত্যাকাণ্ড চালানো হয়েছে তার সঙ্গে তাঁর যোগ নেই। কারণ তিনি যুক্ত ছিলেন বেসামরিক কর্মের সঙ্গে, বরং তিনি সিভিলিয়ানদের বাঁচাতে চেয়েছিলেন। যেমন, লিখেছেন, মশিউর রহমান, আতাউর রহমান খান প্রমুখকে তিনি রক্ষা করেছেন হয়ত এ কারণেই তাঁরা সামরিক শাসকদের ভক্ত ছিলেন সাঈদুল হাসানকে হত্যার পর হত্যাকারীকে খুঁজে বের করতে বলেছিলেন এবং বাংগালির প্রতি তাঁর এই সহানুভূতি নাকি জান্তা পছন্দ করে নি।

১৪ ডিসেম্বর বুদ্ধিজীবী হত্যার সঙ্গে ফরমান জড়িত ছিলেন বলে অভিযোগ করা হয়। হাম্‌দুর রহমান কমিশনও এই অভিযোগ বিচার করেছিলেন। ফরমানকে সবাই এই দায় থেকে মুক্তি দিয়েছে। সেটা স্বাভাবিক। কারণ ফরমান দায়ী হলে যুদ্ধটাকেই স্বীকার করে নেয়া হয়। বরং তিনি লিখেছেন, "আমার আশংকা, পূর্ববর্তী আদেশকে বাতিল করে সম্ভবত নতুন আদেশ আর জারি করা হয়নি এবং কিছু লোককে গ্রেফতার করা হয়েছিল। আমি আজও পর্যন্ত জানি না যে, কোথায় রাখা হয়েছিল। সম্ভবত তাদেরকে এমন কোথাও বন্দী করা হয়েছিল, যার প্রহরায় ছিল মুজাহিদরা। আত্মসমর্পণের পর কোর বা ঢাকা গ্যারিসনের কমান্ডাররা তাদের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেছিল এবং তারা মুক্তিবাহিনীর ভয়ে পালিয়ে গিয়েছিল। কারণ মুক্তিবাহিনী নির্দয়ভাবে মুজাহিদদের হত্যা করছিল। পাকিস্তান আর্মিকে দুর্নাম দেয়ার উদ্দেশ্যে মুক্তিবাহিনী কিংবা ইন্ডিয়ান আর্মিও বন্দী ব্যক্তিদের হত্যা করে থাকতে পারে। ভারতীয়রা ইতোমধ্যেই ঢাকা দখল করে নিয়েছিল।" ["They could have been killed by any body except the Pakistan army as it had already surrendered on 16th December."]

অর্থাৎ তিনি তো ননই, পাকিস্তান হানাদার বাহিনীও নয়, বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করেছিলো মুক্তিবাহিনী অথবা ভারতীয় বাহিনী। এ যে কতো বড় মিথ্যাচার তা বলাই বাহুল্য। তিনি কি ভুলে গেছেন বুদ্ধিজীবীদের শুধু ১৪ই ডিসেম্বর নয়, এর আগে থেকে হত্যা করা হচ্ছিলো?

৮

তা হলে, পুরো বিষয়টির জন্য কে দায়ী? ফরমানের ভাষায় অবশ্যই, রাজনীতিবিদরা। এ ধরনের মন্তব্যের সঙ্গে আমরা অপরিচিত নই। গত পঞ্চাশ বছর, অধিকাংশ সময় আমরা দেখেছি জেনারেলেরা রাজনীতিবিদদের দোষারোপ করেন। তা' না করলে তাদের শাসনের যৌক্তিকতা থাকে না।

তিনি লিখেছেন, "ছয় দফার ওপর ভিত্তি করে প্রচারণা চালাতে গিয়ে মুজিব ও তাঁর দল কিভাবে পশ্চিম পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ঘৃণার সৃষ্টি করেছিলেন, কিভাবে পশ্চিমের ভাইদের বিরুদ্ধে বাংগালিদের ভাবাবেগ ও অনুভূতিকে উস্কে দিয়েছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত কিভাবে সরকারের সকল কার্যক্রম দখল করে নিয়েছিলেন। এটা ছিল এক প্রকাশ্য বিদ্রোহ, যার বিরুদ্ধে আর্মিকে অ্যাকশানে যেতে হয়েছিল, এরপর ঘটেছিল ভারতীয় হস্তক্ষেপ, যার পরিণাম ছিল আমাদের দেশের ভাঙন।"

শুরুতে যে পূর্ব ধারণার কথা বলেছিলাম, অন্তিমে দেখুন সে ধারণার পরিপেক্ষিতে জেনারেল ফরমান উপসংহার টানছেন অর্থাৎ সব কিছুর জন্য ভারতীয় ও বাংগালি রাজনীতিবিদরা দায়ী। তবে, এ মন্তব্যকে জোরদার করার জন্য ভুট্টোকেও তিনি খানিকটা

দায়ী করেছিলেন। বেশি নয়, কারণ আমাদের মনে রাখতে হবে, যুদ্ধবন্দী হিসেবে পাকিস্তান ফেরার পর ভুট্টোর অধীনে তিনি আবার উচ্চপদ পেয়েছিলেন।

আর হ্যাঁ, জেনারেলদের কয়েকজন দায়ী। যেমন নিয়াজী আর জেনারেল ইয়াহিয়া। তাঁর ভাষায় "ওপরে যা বলা হয়েছে তা সত্ত্বেও ইয়াহিয়ার দায়িত্বকে খাটো করে দেখার উপায় নেই। যা কিছু ঘটেছে তার সব কিছুর জন্যই সম্পূর্ণরূপে তিনি দায়ী ছিলেন শুধু আর্মিকে সমালোচনা ও দোষারোপ করার প্রবণতাটুকু ছাড়া।" সুতরাং, এটা স্পষ্ট যে, পাকিস্তানী সেনাবাহিনী ও জেনারেলদের পক্ষ সমর্থন করার জন্যই এই বই। তিনি বলেছেন "একটি প্রতিষ্ঠান হিসেবে আর্মিকে সমালোচনা ও দোষারোপ করার অর্থ হল আমাদের শত্রুর অশুভ উদ্দেশ্যকে সাহায্য করা। ["...the tendency to criticize and blame the army, as an institution, can only help the evil intentions of our enemy."]

এইসব দৃষ্টিভঙ্গি মনে রেখেই জেনারেল ফরমান আলীর বইটি আমাদের উপাদান হিসেবে ব্যবহার করতে হবে। অনুবাদক শাহ আহমদ রেজা দক্ষতার সঙ্গে তাঁর কাজটি সম্পন্ন করেছেন। আমি অনুবাদক, প্রকাশককে জানাই ধন্যবাদ।

ইতিহাস বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
১৬.১২.৯৫

মুনতাসীর মামুন

মুখবন্ধ

১৯৭১ সালে কি ঘটেছিল পাকিস্তানে? এটা কি বিদেশের চাপিয়ে দেয়া কোনো ট্রাজেডি ছিল, নাকি ছিল নিজের সৃষ্ট এক চরম বিপর্যয়? এটা কি বিদেশী শক্তিসমূহের কূটকৌশলের ফলাফল ছিল, নাকি ছিল আত্মহননের জন্য অভ্যন্তরীণ তাড়নার পরিণতি? কেন, কিভাবে ও কোন্ অবস্থায় পূর্ব পাকিস্তান বাংলাদেশে পরিণত হল এবং পাকিস্তানকে 'নতুন' পাকিস্তান নামে ডাকা শুরু হল? ট্রাজেডি ঘটে যাওয়ার পর দুটি দশক অতিক্রান্ত হয়েছে, কিন্তু সম্পূর্ণ কাহিনী এখনো প্রকাশ করা হয়নি; ১৯৭১ সালে কিভাবে অস্তিত্ব রক্ষার ও ধ্বংস করার প্রাকৃতিক নিয়ম ক্রিয়া করেছিল এবং ভবিষ্যতেও করতে পারে, শোনানো হয়নি সে কথাও। কোনো প্রদেশের মানুষ বা নেতাদের কেউই ধ্বংসযজ্ঞের ব্যাপকতা ও পরিণতির কারণ উদ্‌ঘাটন বা পরিমাপ করার আন্তরিক প্রচেষ্টা নেননি। এটা কি কোনো আকস্মিক ঘটনা ছিল, নাকি ছিল দীর্ঘদিনের ভুল পরিচালনার পরিসমাপ্তি যা সমাপ্তিকে তরান্বিত করেছিল, তা জানারও উদ্যোগ নেয়া হয়নি। এ থেকে নতুন প্রজন্ম অতীত ভুলের শিক্ষা নিয়ে লাভবান হতে পারত।

সন্দেহ নেই, এই দুই দশকে অনেক কথাই বলা হয়েছে। কিন্তু এসবের বেশির ভাগই আংশিক বা খণ্ডিত মাত্র এবং তাও কাদা ছোঁড়াছুঁড়ি, চরিত্রহনন ও রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির জন্য করা হয়েছে কিংবা যথেষ্ট নিকটবর্তী কোনো অবস্থান থেকে করা হয়নি যা পর্যবেক্ষককে পাকিস্তানের নিজের পেট চিরে করা আত্মহত্যার সম্পূর্ণ চিত্র দেখতে সক্ষম করবে।

অন্য অনেকে যা দেখেছেন বা দেখতে পেরেছেন, আমি তার চেয়ে অনেক বেশি দেখেছি। সেনাবাহিনীর একজন লেঃ কর্নেল হিসেবে ১৯৬২ ও ১৯৬৩ সালে পূর্ব পাকিস্তানে আমার প্রথম সংক্ষিপ্ত সফরকালে, পরবর্তীতে ১৯৬৭-র শুরু থেকে ১৯৭১-এর শেষ পর্যন্ত প্রথমে সেনাবাহিনীতে এবং পরে অসামরিক প্রশাসনে গুরুত্বপূর্ণ পদে থাকাকালে আমি

ছিলাম এই বিয়োগান্ত নাটকের সূচনা, বিকাশ ও মঞ্চায়নের প্রত্যক্ষদর্শী। সে কাহিনী শোনানোর কথা আমি মাঝে মাঝে ভেবেছি, কিন্তু বিভিন্ন কারণে তা আর হয়ে ওঠেনি বলে আমি দুঃখিত।

একজন সৈনিককে প্রায়ই অন্যায়ভাবে সংবেদনহীন মানুষ ও অনুভূতিহীন জীব হিসেবে বিবেচনা করা হয়। একজন খাঁটি সৈনিকের বেলায় অবশ্য এই বর্ণনা প্রযোজ্য নয়। যুদ্ধক্ষেত্রে সে তার জীবন উৎসর্গ করে, অন্যের জীবনও নেয়। কিন্তু এই জুয়াখেলায় আনন্দ পাওয়া বা সেই স্মৃতি উপভোগ করা কিংবা সাধারণ লেখক ও গল্পকারদের মতো কাহিনীর বর্ণনা করা তার পক্ষে সম্ভব নয়। বুদ্ধিজীবী বা শিক্ষাবিদরা ক্ষতের বেদনা, গভীরতা ও রং সম্পর্কে নিস্পৃহ থেকে সোৎসাহে ঘটনার চমকপ্রদ বর্ণনা দিতে পারেন। একজন সৈনিকের ভাগ্যের লিখন নিজের ভেতরকার যে কষ্ট, তা থেকে দূরে থেকে তারা নিজেদের বিশ্লেষণে তৃপ্তিও পেতে পারেন। কিন্তু একজন সৈনিকের পক্ষে বুদ্ধিজীবী বা শিক্ষাবিদের মতো আচরণ করা সম্ভব নয়।

অন্য আরো অনেক সৈনিকের মতো এটা আমারও দুর্ভাগ্য—যাঁদেরকে ১৯৭১ সালের ট্র্যাজেডিতে টেনে হিঁচড়ে জড়িত করা হয়েছিল। ১৯৪৭ সালে প্রতিষ্ঠাকালে পৃথিবীর বৃহত্তম ইসলামী রাষ্ট্র হিসেবে সংবর্ধিত আমার মাতৃভূমি পাকিস্তানের ভেঙে যাওয়ার সত্যিকার কাহিনী বর্ণনার পথে এটাই ছিল আমার জন্য প্রধান অন্তরায়। যা হোক, পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত সাম্প্রতিক কিছু উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বা বিকৃত ও বানানো কাহিনী পূর্ব পাকিস্তানে যন্ত্রণাদায়ক পাঁচটি বছর আবস্থানকালে যা দেখেছি তা লিখতে আমাকে বাধ্য করেছে।

অন্যদের বক্তব্যকে মিথ্যা হিসেবে চিহ্নিত করা কিংবা নিজের ভূমিকার প্রশংসা করা আমার এই প্রচেষ্টার উদ্দেশ্য নয়। পাকিস্তানের ভাঙন এমন একটি কষ্টদায়ক ঘটনা যা কারো নিজের পছন্দ-অপছন্দ জাহির করার কাজে ব্যবহৃত হওয়ার কিংবা কাউকে নৈতিকতার উচ্চতর অবস্থানে তুলে ধরার মতো নয়। যখন পেছনে ফিরে দেখি, আমি দেখতে পাই বিপুল পৈশাচিকতা আমার চোখের সামনে উঠে আসছে। এ গ্রন্থটি আমি যেভাবে সেই ঘটনাবলীকে দেখি তার বিবরণী। অন্যরা তাদের দৃষ্টিকোণ থেকে কাহিনী বলবেন। হাতী ও ছ'জন অন্ধের কাহিনী সবাই জানেন। সংবেদনহীন রাজনৈতিক ও উদাসীন সামরিক শাসকদের নীচ ব্যক্তিগত স্বার্থচিন্তা লজ্জাকর স্বাচ্ছ্যন্দের সঙ্গে সমগ্র জাতিকে মৃত্যু ও ধ্বংসের রণক্ষেত্রে নিয়ে গিয়েছিল। এঁরা উঁচু জোয়ারের সৃষ্টি করেছেন নিজেদের গ্রাস করে নেয়ার জন্য কিংবা অসহায়ভাবে হারিয়ে গেছেন এমন গোলকধাঁধায়, যেখান থেকে জীবিত অবস্থায় আর ফিরে আসা সম্ভব হয়নি।

আমার এ গ্রন্থের উদ্দেশ্য হল বিভিন্ন ঘটনা ও স্রোতধারাকে, উন্মাদ আবেগ ও সংবেদনহীন পাগলামোকে পাশাপাশি সাজানো এবং ধূর্ত নেতৃবৃন্দের চিত্তাকর্ষক ক্ষমতা ও

তাদের সেই সব প্রতারণামূলক শ্লোগান ও অঙ্গীকারের প্রকৃতি উদ্‌ঘাটন করা যা পাকিস্তানের ভাঙন ঘটিয়েছে এবং যার পরপর এসেছে এই ঘৃণ্য নাটকের প্রধান অভিনেতাদের বিনাশ।

বিলম্বে পূর্ব পাকিস্তান পরিস্থিতি সম্পর্কিত কতিপয় বিষয়ে স্বচ্ছতা এসেছে। একজন এখন ঘটনাটিকে অনেক বেশি যুক্তিসিদ্ধভাবে দেখতে পারেন। ১৯৭১-পরবর্তীকালে ভিন্ন মতাবলম্বী ও বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে অনেক মিলিটারি অ্যাকশন পৃথিবী দেখেছে। আমাদের ঘরের কাছে শিখদের বিরুদ্ধে ভারতীয়দের 'স্বর্ণ মন্দির' অপারেশন এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য একটি ঘটনা। অথচ এই ভারতই দেশের সংহতি রক্ষার লক্ষ্যে চালিত আমাদের অ্যাকশনের নিন্দা করেছিল এবং তারপর অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের কারণে সৃষ্ট আমাদের দুর্বল অবস্থার পুরোপুরি সুযোগ নিয়েছিল। বেইজিং-এর তিয়েনআনমেন স্কয়ারে বিদ্রোহী ছাত্রদের বিরুদ্ধে চালিত চীনের অ্যাকশন প্রমাণ করেছে যে, কখনো কোনো মিলিটারি অ্যাকশন চালানো হলে তা শক্তিশালী ও সহিংস হতে বাধ্য। কোনো আর্মি প্ল্যান বাস্তবায়ন করার ক্ষেত্রে অবশ্যই সম্পূর্ণ সাফল্য অর্জন করতে হয়, তা যে কোনো মূল্যেই হোক না কেন। এ প্রসঙ্গে সাম্প্রতিক দৃষ্টান্ত হচ্ছে যুগস্লাভিয়ার আর্মি অ্যাকশন।

১৯৯১-এর উপসাগরীয় যুদ্ধ দেখিয়েছে, কেউ আন্তর্জাতিকভাবে বিচ্ছিন্ন থাকলে তাকে কতটা মূল্য দিতে হয়। এই যুদ্ধ আরো দেখিয়েছে, কোনো দেশ চারদিক থেকে শত্রুবাহিনী পরিবেষ্টিত থাকলে সেই দেশ কতটা অরক্ষিত ও আক্রান্ত হওয়ার যোগ্য থাকে-পূর্ব পাকিস্তানে আমরা যেমনটি ছিলাম। আমাদের পররাষ্ট্রনীতির ব্যর্থতার কারণে ইরাকের মতো আমরাও বিচ্ছিন্ন ছিলাম, এমন কি আমাদের বন্ধুরাও সাহায্য করতে অনিচ্ছুক বা অসমর্থ ছিল।

রাশিয়ায় জনগণের শক্তি যথাযথভাবে প্রদর্শিত হয়েছে। সবচেয়ে বড় শিক্ষাটি হল, অভ্যন্তরীণ সংঘাত বিদেশী আক্রমণকারীদের আমন্ত্রণ করে আনে এবং শেষ পর্যন্ত পরাজয়ের দিকে নিয়ে যায়। একটি বিভক্ত জাতি শত্রুর জন্য সহজ শিকারে পরিণত হয়। কোনো দেশের নিরাপত্তা, সংহতি ও প্রতিরক্ষার জন্য অভ্যন্তরীণ ঐক্য এক অত্যাবশ্যকীয় শর্ত–এর ভিত্তি হতে হবে দৃঢ় ও শক্তিশালী।

১৯৭৩ সালে আরব- ইসরাইল যুদ্ধকালে রাজনৈতিক কৌশল ও সামরিক পরিস্থিতির আন্তঃক্রিয়া এমন এক পর্যায়ে পৌঁছেছিল যখন থার্ড আর্মি আত্মসমর্পণে বাধ্য হওয়ার আগেই সা'দাত যুদ্ধবিরতির সময়োচিত পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। সাদ্দামও সমগ্র মুসলিম বিশ্বকে লজ্জার হাত থেকে বাঁচাতে পারতেন–যদি তিনি ১৯৯১-এর ১৫ মার্চ বা তার আগে কুয়েত থেকে সেনা প্রত্যাহার করে নিতেন।

মুসলিম মানসই এমন যে, তা বীরত্বপূর্ণ বাগাড়ম্বর ও অতিরঞ্জিত দাবি করতে ভালোবাসে। সঠিক ও সময়োচিত পদক্ষেপ নেয়া হলে আমরা ঢাকার ঘটনা প্রবাহকে

সহজেই রক্ষা করতে পারতাম–যার পরিণতি ছিল আত্মসমর্পণ। আমার কথাটি হল, আমরা ইতিহাস থেকে শিক্ষা নেব, না হলে অতীত ভুলের পুনরাবৃত্তির জন্য আমাদেরকে নিন্দিত হতে হবে। এই গ্রন্থ এ দিকটির ওপর হয়তো কিছুটা আলোকপাত করতে পারবে।

প্রাথমিক পর্যায়ে আমি হামুদুর রহমান কমিশন রিপোর্ট ব্যবহার বা উল্লেখ করিনি। আমার ধারণা ছিল এটা একটি গোপন দলিল। কিন্তু সাম্প্রতিককালে সহজবোধ্য কারণে প্রাথমিক রিপোর্টের বিশেষ বিশেষ অংশ প্রকাশিত হয়েছে। 'হামুদুর রহমান কমিশন' রিপোর্টের সঠিক ও চূড়ান্ত ভাষ্য সম্পর্কে আমি যা জানি, সেকথা এখন আমি দ্বিধাহীনভাবে বলতে পারি। এই রিপোর্টের ওপর আমি একটি অধ্যায় সংযোজিত করেছি।

জাতির স্বাস্থ্য আজ আবার খুব ভালো নয়। ১৯৭০ সালে যে রোগ আমাদের কষ্ট দিয়েছিল, সেই একই রোগ আরো একবার আমাদের স্বপ্নসৌধকে ভাঙতে শুরু করেছে। গণতান্ত্রিক বিধি ব্যবস্থায় গ্রহণযোগ্য মাত্রার চেয়ে অনেক বেশি রাজনৈতিক সংঘাত চলছে। সমালোচনা করা সকল নাগরিকেরই অধিকার; কিন্তু তা হতে হবে গঠনমূলক, ধ্বংসাত্মক নয়। আমরা যা দেখছি তা হল আমাদের জাতির নৈতিক গঠনের সম্পূর্ণ ধ্বংস।

এ সবই ঘটেছে দুটি নির্বাচনের পর যার কোনোটির ফলাফলই সে সময়কার বিরোধী দলগুলো মেনে নেয়নি। দু'পক্ষই ঠিক তেমন আচরণই করেছে যেমনটি আমাদের নেতারা ১৯৭১ সালে করেছিলেন। সুষ্ঠু নির্বাচনই একমাত্র ভিত্তি, যার ওপর গণতান্ত্রিক বিধি-ব্যবস্থা নির্মিত ও বিকশিত হতে পারে। সেই নির্বাচনে যদি কারচুপি করা হয় এবং গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় যদি বাহুবল প্রদর্শন করা হয়, তাহলে আরো বেশি শক্তিশালী হাত একে ছিনিয়ে নেবে।

আমরা পূর্ব পাকিস্তানে একটি বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন দেখেছি, এখন আরেকটি দেখছি সিন্ধুতে- যদিও এটা অতটা বিপজ্জনক নয়। এর মীমাংসা করতে হবে রাজনৈতিক পন্থায় এবং আর্থ-সামাজিক পদক্ষেপের মাধ্যমে। শক্তি প্রয়োগ বিপরীত ফলাফল ঘটাবে এবং এর ফলে ভারতের জন্য পরিস্থিতির সুযোগ নেয়ার মতো আরো একবার উপলক্ষ সৃষ্টি হতে পারে। আমাদেরকে অবশ্যই এক জাতিতে পরিণত হওয়ার প্রক্রিয়া শুরু করতে হবে। আমরা প্রশাসনিক পদক্ষেপের মাধ্যমে পাকিস্তানকে রাষ্ট্র হিসেবে পরিচালনা করছি। জাতি গঠনের জন্য প্রয়োজন উদার দার্শনিক ও মনস্তাত্ত্বিক মনোভাব এবং জনগণের মন তৈরি করার জন্য শিক্ষামূলক পদক্ষেপ।

আমাদের সমাজের সকল অংশই জ্ঞাতসারে বা অন্য কোনোভাবে পাকিস্তানের ভাঙন ঘটানোয় অবদান রেখেছে। রাজনীতিবিদ, সাধারণ আমলা, পররাষ্ট্রনীতি প্রণেতা, সংবাদপত্র এবং পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্র সমাজ কেউই গঠনমূলক পথে তাদের ভূমিকা পালন করেনি, বরং তারা আগুনে ইন্ধন যুগিয়েছে।

স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত হয়ে পূর্ব পাকিস্তান ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তারা এখন ভারতের করুণার ওপর বেঁচে আছে। আমরা অতীতের ব্যর্থতা থেকে শিক্ষা নিলে পশ্চিম পাকিস্তান অর্থনৈতিক ও সামরিক দিক দিয়ে শক্তিশালী ও টিকে থাকতে সক্ষম রাষ্ট্রে পরিণত হতে পারে। যাদের মধ্যে বিচ্ছিন্নতাবাদী প্রবণতা রয়েছে, তাদেরকে অবশ্যই পূর্ব পাকিস্তানীদের নিজেদের বক্তব্য থেকে শিক্ষা নিতে হবে। তারা একে একটি ভুল হিসেবে আখ্যা দেয়। আন্তর্জাতিক জাতি সমাজে পাকিস্তান একটি সম্মানজনক অবস্থান অর্জন করতে পারে এবং এর অংশ হিসেবে দেশের প্রতিটি ইউনিটই সমগ্রের সাফল্যের অংশীদার হতে পারে। কিন্তু স্বতন্ত্র ইউনিট হলে তাদেরকে অবশ্যই ভারতের আধিপত্যের বোঝা বহন করতে হবে।

রাও ফরমান আলী খান

মুসলিম বাংলার পরিবর্তন ধারা

বাংগালী বাবু, বাংগালী জাদু ও ভুখা বাংগালী—আমাদের ছেলেবেলায় এই তিনটি বিশেষ কথাই আমরা বাংলা সম্পর্কে শুনেছি। বৃটিশ শাসনামলে বাংলা প্রসিদ্ধ ছিল তার শিক্ষিত কেরানীদের জন্য–যাদের প্রায় সবাই ছিল হিন্দু। উত্তর-পশ্চিম ভারত দখল করার এক শতাব্দী আগেই ইংরেজরা বাংলার প্রভুতে পরিণত হয়েছিল। ১৯৫৭ সালে পলাশী যুদ্ধের মধ্য দিয়ে সমগ্র বাংলার প্রভু হওয়ারও আগে ইংরেজরা বাংলায় আসার পর প্রথম সুযোগেই হিন্দুরা ইংরেজদের সেবায় নিজেদের নিবেদিত করেছিল। সহজবোধ্য কারণে ইংরেজরা হিন্দুদেরকে বেশি বিশ্বস্ত হিসেবে পেয়েছিল। তারা নতুন শাসকদের অধীনে শিক্ষা গ্রহণ করতে এবং ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির জন্য অফিস কর্মীর স্বতন্ত্র একটি শ্রেণী হিসেবে গড়ে উঠতে এগিয়ে এসেছিল। নিজেদের অধ্যবসায় ও মুসলিমবিরোধী মনোভাবের জন্য কেরানী হিসেবে হিন্দুরা স্বল্পকালের মধ্যে খ্যাতি অর্জন করেছিল। এই প্রেক্ষাপটে বাংগালী বাবু বলতে তাৎক্ষণিকভাবে এমন একদল সংবেদনহীন ও হিসাবযন্ত্রের মতো মানুষের ছবিই চোখের সামনে ভেসে উঠবে-যাদের প্রধান কাজ ছিল বৃটিশ রাষ্ট্রতরীকে শক্তিশালী করা এবং পূর্ববর্তী শাসক তথা মুসলমানদের অবদমিত করা।

বাংগালী জাদুরও নিজস্ব একটা অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য ছিল। অস্পষ্ট, ব্যাখ্যার অতীত এক ভীতি, এমন কি আকর্ষণও–পশ্চিম ভারত থেকে কেউ কখনো বাংলায় গেলে তাকে মোহগস্ত করত। আমরা শুনেছি, পশ্চিম ভারত থেকে একবার একদল লোক, অবশ্যই পুরুষ, বাংলায় গিয়ে আর ফিরে আসেনি। কেউ জানে না, কি ঘটেছিল তাদের। শুধু বলা হয়েছে যে, তারা বাংলার মায়াজালে আটকে পড়েছে। কারা আটকিয়েছিল তাদের? সম্ভবত বাংগালী রমণীদের সম্মোহনকারী চোখ কিংবা বাংলার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য; কিন্তু অধিকাংশ মনে করত, এটা ছিল বাংগালী জাদুর কাজ।

প্রতি বছর বন্যাকবলিত উর্বর ভূমির জন্যও বাংলা প্রসিদ্ধ ছিল। স্মরণাতীত কাল থেকে নিয়মিত দুর্ভিক্ষ ছিল এর প্রাকৃতিক বিধান। ধ্বংসকারী বন্যার পাশাপাশি অতি উচ্চ জন্মহারের কারণে বাংলা ক্ষুধার্ত মানুষের দেশে পরিণত হয়েছিল। বাংগালীরা, বিশেষ করে মুসলিম বাংগালীরা খাদ্যের অন্বেষণে স্বদেশ ছেড়ে দূরবর্তী বিভিন্ন অঞ্চলে ঘুরে বেড়াত। এই প্রেক্ষাপটেই ভুখা বাংগালী কথাটির প্রচলন হয়েছিল।

এভাবেই বাংগালীরা তিনটি বিশিষ্ট এবং কিছুটা পরস্পরবিরোধী বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল–অধ্যবসায়ী (বাবু), সম্মোহনকারী (জাদুকর) ও ক্ষুধার্ত (ভুখা)। এই অস্পষ্ট ধারণাই আমার মনের গভীরে গেঁথে গিয়েছিল এবং দেশটি ও তার মানুষদের একবার দেখার এক অদ্ভুত আকাঙক্ষা বিকশিত হয়েছিল আমার মনের ভেতরে।

১৯৪৪ সালের মার্চ মাসে আমি প্রথমবার রূপকথার এই দেশটির সান্নিধ্যে আসতে পেরেছিলাম। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার চার বছর পর ১৯৪৩ সালের সেপ্টেম্বরে আমি সেনাবাহিনীতে কমিশন পাই এবং জঙ্গল যুদ্ধে ব্যাপক প্রশিক্ষণ শেষে আমাকে আমার ইউনিটে যোগ দিতে বলা হয়। এটা ছিল বার্মার উপকূলে রামরী দ্বীপে অবস্থানরত ৭ ফিল্ড রেজিমেন্ট আর্টিলারি। আকিয়াব হয়ে রামরী দ্বীপে যেতে হলে কোলকাতা হয়ে যেতে হত। আমরা সপ্তাহখানেক কোলকাতায় ছিলাম এবং এ সময় যা দেখেছি তার স্মৃতি আমাকে এখনো তাড়িয়ে বেড়ায়।

কোলকাতা এক ভয়াবহ চিত্র নিয়ে উপস্থিত হয়েছিল। ১৯৪২-এর ধ্বংসকারী দুর্ভিক্ষের ক্ষতচিহ্ন তখনো স্পষ্ট। নোংরার স্তূপ তখনো সর্বত্র, চারদিকে অগণিত মানব কংকাল—বৃদ্ধ, নারী ও শিশুরা সেগুলোর ওপর শকুনের মতো বসে আছে, বিত্তবান বিদেশীদের ফেলে দেয়া উচ্ছিষ্ট কুড়িয়ে খাচ্ছে তারা। ধুলো বোঝাই ট্রামগুলোর চলাচল তখন দুর্বল, বিকট শব্দের সৃষ্টি করত সেগুলো। সমগ্র পরিবেশই তখন ছিল ভীষণ দুঃখজনক এবং ১৯৪৪ সালের মার্চে যা দেখেছি, তা থেকেই এ বিষয়ে ধারণা করতে পেরেছিলাম- দুর্ভিক্ষ কত ব্যাপক ও ধ্বংসাত্মক ছিল! কী বিপুল সংখ্যক জীবন ছিনিয়ে নিয়েছিল ঐ মন্বন্তর! এই বিভীষিকার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল কোলকাতা দিয়ে যাতায়াতকারী বৃটিশ ও মার্কিন সেনাদের জীবন সম্পর্কে বিরক্তিকর উদাসীনতা। ছুঁড়ে দেয়ার মতো প্রচুর অর্থ তাদের ছিল এবং সেগুলো তারা ছুঁড়ত সম্ভবত সম্ভাব্য মৃত্যুর আগে উপভোগ করে নেয়ার এক প্রবল ভাবাবেগের কারণ থেকে। মনোভাব ও বিত্তবিভবের এই বৈপরীত্য ছিল বিস্ময়কর।

কোলকাতা থেকে ট্রেনযোগে আমরা কুমিল্লা গেলাম। সে এক কষ্টকর দীর্ঘ ভ্রমণ। যমুনার ওপর কোনো ব্রিজ ছিল না। একটি যন্ত্রচালিত নৌকায় করে আমাদেরকে নদী পার হতে হয়েছিল, সময় লেগেছিল প্রায় ৬ ঘণ্টা। এরপর ছিল ট্রেন ভ্রমণ। এবার আমাদের সেই ভূখণ্ডের প্রায় সম্পূর্ণটুকুর ওপর দিয়ে যেতে হল– তিন বছর পর যা পূর্ব পাকিস্তানে পরিণত

হয়েছিল। রাত ছিল বলে খুব বেশি কিছু যদিও আমরা দেখতে পারিনি, কিন্তু শুনেছি অনেক। সারা রাত, এমন কি ট্রেন চলাকালেও আমরা বিরামহীনভাবে শুনেছি, 'সাহেব বখশিস, সাহেব বখশিস।'

যে পাহাড়টির ওপর অবস্থান, তার নামানুসারে কুমিল্লা সেনানিবাসের নাম সে সময় ছিল ময়নামতি সেনানিবাস। এটা ঠিক সেনানিবাসের মতো ছিল না, বাঁশের বেড়া দিয়ে তৈরি কুঁড়ে ঘর ও তাঁবুর সমন্বয়ে তাৎক্ষণিক প্রয়োজনে এর সৃষ্টি হয়েছিল। কুমিল্লাও সেকালে ছিল এক পুকুরের শহর। এ সব পুকুরের পানি মাছের চাষ, কাপড় ও বাসনপত্র ধোয়া, গোসল ও পান করাসহ নানামুখী কাজে ব্যবহার করা হত। পুকুরগুলোকে সুবিধাজনক পায়খানা হিসেবেও কাজে লাগানো হত। প্রবেশ পথ বাসাবাড়ির দিকে রেখে একটু বাড়িয়ে পুকুরের ওপর এক ধরনের আচ্ছাদিত মঞ্চের মতো পায়খানা তৈরি করা হত। পাকিস্তান হওয়ার পর অবশ্য কুমিল্লার জীবনযাত্রায় রূপান্তর ঘটেছিল। কুমিল্লা পরিণত হয়েছিল পাকিস্তানের শ্রেষ্ঠ সেনানিবাসে—সুপরিকল্পিত, সুনির্মিত ও সুদৃশ্য ছিল তা।

চট্টগ্রামের অবস্থাও ভালো ছিল না। যেমন-তেমনভাবে বানানো সংখ্যাহীন কুঁড়ে ঘর আর জরাজীর্ণ ঘরবাড়ি ছিল শহরের সর্বত্র, ছিল সরু সড়ক রাস্তা। একমাত্র যানবাহন ছিল মানুষ চালিত রিকশা। স্বল্প সংখ্যক চার চাকার ভিক্টোরিয়াও দেখা যেত-এগুলোকে টানত দুর্বল ও রুগ্ন শরীরের ঘোড়া। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর এই চট্টগ্রামই পূর্ব পাকিস্তানের প্রধান নৌ বন্দরে পরিণত হয় এবং উন্নয়নের বিভিন্ন পর্যায়ের ভেতর দিয়ে ১৯৭১ সালের মধ্যে হয়ে ওঠে কোলকাতার চেয়ে অনেক পরিচ্ছন্ন এক সুনির্মিত নগরী।

১৯৪৬ সালে কোলকাতার ভয়াবহ গণহত্যা সংঘটিত হওয়ার দিনটিতে আমি দ্বিতীয়বার কোলকাতা এলাকায় উপস্থিত হই। জাপানে অবস্থানরত বৃটিশ কমনওয়েলথ দখলদার বাহিনীর অংশ আমার গোলন্দাজ বাহিনীতে যোগদানের উদ্দেশ্যে আমি কোলকাতা হয়ে যাচ্ছিলাম। গোলযোগের কারণে আমাদের হাওড়ায় থামানো হয় এবং যে ব্রিজটি কোলকাতাকে হাওড়ার সঙ্গে যুক্ত করেছে, তার ঠিক নিচে হাওড়া ট্রানজিট ক্যাম্পে আমাদের থাকার আয়োজন করা হয়। ব্রিজের ওপরে আমরা মুসলমানদের হত্যাকাণ্ড দেখি। মুসলিম লীগের জনসভায় যোগদানশেষে প্রত্যাবর্তনরত মুসলমানদের অপ্রস্তুত অবস্থায় অতর্কিতে আক্রমণ করা হয় এবং মাটিতে শুইয়ে টুকরো টুকরো করে জীবিত ও মৃত অবস্থায় তাদের হুগলী নদীতে ছুঁড়ে ফেলে দেয়া হয়।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর এক নতুন ধ্যান-ধারণার সৃষ্টি হয় এবং নতুন আকাঙ্ক্ষার সূচনা ঘটে। এর অর্থ ছিল জীবনের এক নতুন অধ্যায়। একজন পাকিস্তানী হিসেবে ১৯৬২ সালে আমি তৃতীয়বার বাংলায় আসি যা ততদিনে পূর্ব পাকিস্তানে পরিণত হয়েছে। এবার আমাকে নতুন বাস্তবতার মুখোমুখি হতে হয়। কোলকাতা হত্যাকাণ্ডের

কোনো উল্লেখ পর্যন্ত আমি শুনিনি, পরিবর্তে যা দেখেছি ও যা শুনেছি সেগুলোর সবই ছিল তাদের নিজেদেরই স্বদেশবাসীদের বিরুদ্ধে নির্দেশিত। এ ছিল এক ভয়ংকর ব্যাপার!

কোয়েটার স্টাফ কলেজে (স্টাফ শাখা) প্রশিক্ষক হিসেবে স্বাভাবিক মেয়াদের বাইরে বেশি দিন কাজ করার পর ১৯৬২ সালে আমাকে লাহোরে একটি রেজিমেন্টের অধিনায়ক পদে বদলি করা হয়। সেনাবাহিনীতে পদোন্নতির ক্ষেত্রে কোনো ইউনিটের অধিনায়কত্ব করা এক সাধারণ পূর্বশর্ত। নতুন পদে ৬ মাসের মতো থাকাকালেই আমাকে লাহোরের প্রশাসনিক স্টাফ কলেজে সিনিয়র সার্ভিসেস কোর্স করার জন্য পাঠানো হয়। কলেজ প্রশাসনের নিয়মানুসারে সেনাবাহিনীর সর্বোচ্চ চারটি পদমর্যাদার অফিসারদেরকেই শুধু সিনিয়র অফিসার হিসেবে চিহ্নিত করা হত। আমি তখন মাত্র একজন লেঃ কর্নেল এবং কলেজের ক্রমানুসারে জেনারেল, লেঃ জেনারেল, মেজর জেনারেল, ব্রিগেডিয়ার ও পূর্ণাঙ্গ কর্নেলের পর আমার অবস্থান ছিল ষষ্ঠ পর্যায়ে। সেজন্য কলেজ কর্তৃপক্ষ আমার মনোনয়নের ব্যাপারে আপত্তি জানিয়েছিল। নিম্নতর পদমর্যাদার মনোনীত হিসেবে আমি ছিলাম প্রথম সেনা অফিসার এবং সেনা সদর দফতরও আমার দিক বিবেচনা না করে কলেজ কর্তৃপক্ষের অধিকারকে এই মর্মে স্বীকার করে নিয়েছিল যে, যদি কোনো পর্যায়ে তারা তাদের মানসম্পন্ন না মনে করে তাহলে আমাকে বের করে দিতে পারবে।

আমি কেবল তাদের মানসম্পন্ন হিসেবেই নিজেকে প্রমাণিত করিনি, দ্বিধাহীনভাবে তারা আমার অবদানেরও স্বীকৃতি দিয়েছিল। প্রিন্সিপাল জনাব মালিক ও ভাইস-প্রিন্সিপাল জনাব কাইউম...আমাকে লজ্জিত করে আমার মনোনয়নের ব্যাপারে আপত্তি ওঠার কারণে ক্ষমাও চেয়েছিলেন। আমাকে সেরা ছাত্র হিসেবে মর্যাদা দেয়া হয় এবং 'ক্ষমতা, কর্তৃত্ব ও দায়িত্ব' শিরোনামে আমার নিবন্ধটিকে যথাযথভাবে প্রকাশ করা হয়। ১৯৬৩ সালের এই নিবন্ধে আমি আমাদের দেশের অর্থনৈতিক ও শিল্পোন্নয়নের পথে প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করার প্রেক্ষিতে এগুলোর ওপর থেকে সকল প্রকার সরকারি নিয়ন্ত্রণ প্রত্যাহার করার সুপারিশ করেছিলাম।

লাহোরস্থ অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ স্টাফ কলেজের ছাত্র হিসেবে আমার পূর্ব পাকিস্তান সফর করার সুযোগ হয়েছিল। প্রেসিডেন্ট আইউবের কৃতিত্বকে সবাই চিত্তাকর্ষক বলে জানত। নিজের নেতৃত্বের জন্য তিনি দেশের ভেতরে ও দেশের বাইরে অত্যন্ত সম্মানিত ছিলেন। পূর্ব পাকিস্তানের জন্য তিনি অনেক করেছেন। বর্ধিত বিনিয়োগের মাধ্যমে উন্নয়ন কর্মকাণ্ডকে তাৎপর্যপূর্ণভাবে এগিয়ে নেয়া হয়েছিল। বিনিয়োগের পথে সবচেয়ে প্রধান প্রতিবন্ধক ছিল ঐ অঞ্চলের আত্তীকরণের বা গ্রহণ করার ক্ষমতার অভাব। পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর মোনেম খানকে একজন ফলপ্রসূ প্রশাসক হিসেবে পশ্চিম পাকিস্তানে উপস্থাপন করা হত। তিনি তাঁর প্রদেশে শান্তি ও স্থিতিশীলতা এনেছেন বলে মনে করা হত—যার জন্য প্রদেশটির অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন সম্ভব হচ্ছিল।

ঢাকায় পৌঁছে আমাকে অবশ্য ধাক্কা খেতে হয়েছিল। কারণ নগরীর সর্বত্র দেয়ালে দেয়ালে লেখা ছিল 'আইউবশাহী ধ্বংস হোক' স্লোগান। কখনো-সখনো দেখা হলে শিক্ষিত লোকজন আমাদের জানাতেন যে, জনগণের মধ্যে মারাত্মক বঞ্চনার মনোভাব বিদ্যমান রয়েছে। তারা আইউবী শাসনের ও মোনেম খানের বিরোধী। মোনেম খান ততদিনে পূর্ব পাকিস্তানের সবচেয়ে ঘৃণিত ব্যক্তিতে পরিণত হয়েছিলেন।

স্টাফ কোর্সে থাকাকালে কমান্ডান্ট মেজর জেনারেল বিলগ্র্যামি আমাকে সিনিয়র অফিসারদের উচ্চতর শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ওপর একটি নিবন্ধ লেখার নির্দেশ দিয়েছিলেন। আমার লেখা নিবন্ধটি জেনারেল বিলগ্র্যামি ও সেনা সদর দফতর উভয়ের পক্ষ থেকেই অনুমোদিত হয়েছিল। আমার সুপারিশমালা গৃহীত হওয়ার ফলে স্টাফ কলেজে ওয়ার কোর্স শুরু হয়। কমান্ডান্ট পদে তখন মেজর জেনারেল ইয়াকুব, সিনিয়র অফিসারদের একটি দলকে তাঁর কাছে পরিচালন স্টাফের সদস্য হিসেবে দেয়া হয়।

স্টাফ কোর্সের দায়িত্ব পালনশেষে আমাকে লাহোরে বদলি করা হয়। ওয়ার কোর্স শুরু হওয়ার কথা থাকলেও ট্যাকটিক্যাল এক্সারসাইজের বিষয়টি সম্পন্ন করা সম্ভব হয়নি। এর প্রধান কারণ, যা কিছু জেনারেল ইয়াকুবের কাছে উপস্থিত করা হয়েছিল, সে সব তাঁর মানদণ্ড অনুসারে যথেষ্ট ছিল না। তাঁর মানদণ্ড সেকালে খুবই উঁচু ছিল। শেষে আমাকে কোয়েটায় ডাকা হয় এবং তিন মাসের মধ্যে তিনটি এক্সারসাইজ লেখার এবং সেগুলো কমান্ডান্টকে দিয়ে অনুমোদন করিয়ে নেয়ার দায়িত্ব দেয়া হয়। এর আগে জেনারেল ইয়াকুবকে আমি কখনো দেখিনি। তাঁকে আমি একজন অত্যন্ত যুক্তিপরায়ণ ব্যক্তি হিসেবে পেয়েছিলাম, যাঁর সঙ্গে কাজ করা যায়। আমি মাত্র এক মাসে তিনটি এক্সারসাইজই লিখে ফেলি এবং সেগুলোর অনুমোদন পেয়ে যাই। হতে পারে, আমার রচনা তাঁকে মুগ্ধ করেছিল। তিনি তাই আমাকে ওয়ার কোর্সের পরিচালন স্টাফের সদস্য হিসেবে কাজ করতে বলেছিলেন।

পরিচালন স্টাফের সদস্য হিসেবে পরবর্তী বছর আমি দ্বিতীয়বার পূর্ব পাকিস্তান সফর করি। ঢাকায় গভর্নর মোনেম খানের সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎকারটি হয়েছিল একই সঙ্গে আকর্ষণীয় ও কৌতূহলোদ্দীপক। তাঁর প্রদেশের অর্থনীতি ও উন্নয়ন প্রসঙ্গে কোনো কথা না বলে খুবই কৌতুকপ্রদ ভঙ্গিতে তিনি শুনিয়েছিলেন কিভাবে তাঁকে গভর্নর হিসেবে বাছাই করা হয়েছিল। তিনি বললেন,"একদিন আমার প্রেসিডেন্ট (মোনেম খান সব সময় আইউবকে 'আমার প্রেসিডেন্ট' বলতেন) মন্ত্রিপরিষদের সভায় এলেন। তিনি বসলেন, তিনি তাঁর ডানে তাকালেন, তিনি তাঁর বামে তাকালেন (সানন্দ অভিনয় করে দৃশ্যটি বোঝালেন) এবং তারপর তিনি তাঁর সামনের দিকে তাকালেন এবং বললেন, "আমি পূর্ব পাকিস্তানের জন্য একজন গভর্নর চাই।") আমরা আমাদের ডানে তাকালাম, আমরা আমাদের বামে

তাকালাম এবং তারপর আমরা আমাদের সামনের দিকে তাকালাম এবং আমাদের সকলেই বললাম, "আমরা পূর্ব পাকিস্তানের জন্য কোনো গভর্নর দেখতে পাচ্ছি না।" আমার প্রেসিডেন্ট তাঁর ডানে তাকালেন, তাঁর বামে তাকালেন এবং তারপর তাঁর সামনের দিকে তাকালেন এবং বললেন,"আপনারা সবাই অপদার্থ। বেরিয়ে পড়ুন এবং একজনকে খুঁজে আনুন।" পরদিন আমরা এলাম এবং প্রেসিডেন্টও এলেন। তিনি বসলেন। তিনি তাঁর ডানে তাকালেন, তাঁর বামে তাকালেন এবং বললেন,"আপনারা কি পূর্ব পাকিস্তানের জন্য একজন গভর্নর খুঁজে পেয়েছেন?" আমরা আমাদের মাথা নাড়ালাম। আমার প্রেসিডেন্ট আমার দিকে তাকালেন এবং বললেন, "মোনেম খান, আপনিই পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর।"

মোনেম খান এরপর তাঁর সাফল্য ও কৃতিত্বের দীর্ঘ কাহিনী শোনালেন। তিনি বললেন, তিনি প্রদেশের আইন-শৃংখলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করেছেন–যার ফলে উন্নয়ন তহবিল ব্যবহার ও আত্তীকরণের ক্ষমতা পূর্ব পাকিস্তানের অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। অন্যদের সঙ্গে আলোচনা করে পরে জেনেছি, একথা সত্য ছিল না। বণ্টিত তহবিলের সদ্ব্যবহার করা বলতে মোনেম খান বুঝতেন কেবলই ব্যয় করে ফেলা। কিভাবে সে তহবিল ব্যয়িত হল এবং তার ফল কি হল এ সব নিয়ে তিনি ভাবতেন না। তহবিল নিঃশেষিত হয়ে গেছে এবং তার আরো অর্থ প্রয়োজন- এ কথা কেন্দ্রকে বলতে পারলেই মোনেম খান সুখী হতেন। তিনি মনে করতেন, এর ভিত্তিতেই কেন্দ্র তাঁর দক্ষতা ও প্রশাসনিক সামর্থ্য পরিমাপ করত।

দায়িত্ব পালনের ফাঁকে ফাঁকে আমরা যা পর্যবেক্ষণ করেছি তা অবশ্য ছিল হতাশাজনক। অব্যাহতভাবে পূর্ব পাকিস্তানে যে মানসিক পরিবর্তন ঘটছিল সে সম্পর্কে পশ্চিম পাকিস্তানের মানুষ সচেতন ছিল না। গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলোর দেয়াল ছেয়ে গিয়েছিল আইউববিরোধী শ্লোগানে। অত্যন্ত জনপ্রিয় ব্যক্তি লেঃ জেনারেল আযম খান গভর্নরের পদ থেকে অপসারিত হয়েছিলেন। তাঁর স্থলে বসানো হয়েছিল একজন অদক্ষ ও অনুগত ব্যক্তিকে যিনি আইউব খানের সঙ্গে সর্বতোভাবে সেবাদাসের মতো আচরণ করতেন। পূর্ব পাকিস্তানের অনেকে দেখা-সাক্ষাৎকালে গোপনে আমাদের বলতেন,"পূর্ব পাকিস্তানে জনপ্রিয় হলেই আপনারা তাঁকে সরিয়ে দেন-তা তিনি যিনিই হোন, এমন কি একজন পশ্চিম পাকিস্তানীও যদি হয়ে থাকেন। আমরা মোনেম খানের মতো কোনো বাংগালীকে চাই না। আমরা চাই আযম খান, ওমরাও খান এবং এন. এম. খানের মতো মানুষ।"

সাধারণ মানুষ তখনো বন্ধুত্বপূর্ণ থাকলেও সমাজের ওপরের স্তরের লোকজনের মধ্যে যথেষ্ট বৈরিতা পরিলক্ষিত হত। আমার এই ধারণাই হয়েছিল যে, দুই প্রদেশকে এক রাখতে হলে কিছু ইতিবাচক পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন। আমরা লক্ষ্য করেছি, ক্ষমতাসীনদের প্রচেষ্টায় তাৎপর্যপূর্ণ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জিত হলেও সামাজিক খাতগুলোর প্রতি তেমন দৃষ্টি দেয়া হয়নি। কেবল মোট জাতীয় উৎপাদনের (জি এন পি) প্রবৃদ্ধি বরং সমস্যা সৃষ্টি

করেছে। প্রদেশে নতুন এক এলিট সম্প্রদায়ের জন্ম হয়েছিল যাঁরা রাজনৈতিক ক্ষমতায় আরো বেশি অংশিদারিত্ব চাইছিলেন। কিন্তু প্রেসিডেন্ট পদ্ধতির সরকার ব্যবস্থায় তা দেয়া সম্ভব ছিল না। নীতিমালার সবই গৃহীত হচ্ছিল শক্তিশালী রাষ্ট্র গঠনের উদ্দেশ্যে, এ কথা অনুধাবন করা হয়নি যে, শক্তিশালী জাতি গঠনের জন্য আরো কিছু করার প্রয়োজন রয়েছে। ফলে সেতুবন্ধন রচিত হওয়ার পরিবর্তে দূরত্ব বেড়ে চলছিল। রাষ্ট্রের থাকে বাস্তব আকার, অন্যদিকে জাতির জন্য প্রয়োজন ভাবাবেগের ঐক্য।

চার বছর পর ১৯৬৭ সালে আর্টিলারি ১৪ ডিভিশনের অধিনায়ক হিসেবে ঢাকায় বদলি হওয়ার পর আমি ঐ প্রদেশ সম্পর্কে আরো ঘনিষ্ঠভাবে জানার মতো অবস্থায় আসি। ভাগ্য আমাকে ঢাকায় নিয়ে গিয়েছিল। ১৯৬৬ সালে দিল্লীর পাকিস্তান দূতাবাসে সামরিক অ্যাটাশে হিসেবে যাওয়ার জন্য আমাকে মনোনীত করা হয়। পদটি ছিল একজন পূর্ণাঙ্গ কর্নেলের উপযোগী, কিন্তু আমি তখনও একজন লেঃ কর্নেল। দিল্লীতে নিযুক্তির বিষয়টিকে আমার পদোন্নতি হিসেবে ধরে নেয়া হয় এবং আমার সহকর্মীরা এর বিরোধিতা করতে থাকেন। দুটি মাস আমি প্রস্তুতি নিতে কাটাই, গাড়ি ও বাসার আসবাবপত্র বিক্রি করে দেই। দিল্লী যাত্রার জন্য আমি যখন তৈরি, এমন এক পর্যায়ে সামরিক গোয়েন্দা বিভাগের পরিচালক (তখন ব্রিগেডিয়ার, পরে লেঃ জেনারেল আকবর)-এর কাছ থেকে শেষবারের মতো নির্দেশ ও করণীয়সমূহ বুঝে নেয়ার সময় তাঁর কাছে একটি ফোন এল। জেনারেল স্টাফ প্রধান (সি জি এস) জেনারেল ইয়াকুব জানালেন আমার দিল্লী যাওয়া হবে না এবং আমি যেন অনতিবিলম্বে তাঁর সঙ্গে দেখা করি। আমি গিয়ে উপস্থিত হলে সি জি এস বললেন, "ফরমান, তুমি ভারতে যাচ্ছো না।" "কেন স্যার?" আমি জানতে চাই। উত্তরে তিনি বললেন, "দিল্লীর পদটি একজন কর্নেলের জন্য, কিন্তু আগামী কয়েক মাসের মধ্যে তুমি একজন ব্রিগেডিয়ার হতে যাচ্ছ।"

সিজিএস হিসেবে তাঁকে পাকিস্তানের প্রতিরক্ষার পরিকল্পনা করার দায়িত্ব পালন করতে হত এবং সে কারণে তিনি আমাকে রাওয়ালপিন্ডির সেনা সদর দফতরে সামরিক কর্মকাণ্ডের উপপরিচালক (ডিডিএমও) হিসেবেও পেতে চাইছিলেন। স্বল্পদিনের মধ্যেই দিল্লীর পদটিতে একজন ব্রিগেডিয়ারকে পাঠানো হল। এদিকে সেনা সদর দফতরে আমি ব্যস্ত হয়ে পড়লাম পাকিস্তানের 'প্রতিরক্ষা' পরিকল্পনা কার্যক্রম চূড়ান্তকরণের কাজে, অবশ্য খুশি মনেই।

বিগত আট বছর ধরে ডিডিএমও পদটিতে ছিলেন কর্নেল ওসমানী, একজন পূর্ব পাকিস্তানী। পরবর্তীকালে তিনি যদিও মুক্তিবাহিনীর জেনারেল হয়েছিলেন, কিন্তু পাকিস্তানের সেনাবাহিনীতে তাঁকে পদোন্নতি পাওয়ার যোগ্য বলে বিবেচনা করা হত না। তিনি বাংগালী ছিলেন এবং সম্ভবত উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা তাঁকে বিশ্বাস করতেন না। দায়িত্ব বুঝে নেয়ার জন্য তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে আমি রীতিমতো আতংকিত হয়ে গেলাম

একথা জেনে যে, তাঁকে কোনো ফাইলপত্রই দেখতে দেয়া হয় না, এমন কি চাপরাসিরা পর্যন্ত তাঁকে অবজ্ঞা করে চলে। তাঁর অফিসে ঝাড়ু দেয়া হয় না, অফিসটি নিষ্ক্রিয়, ক্ষমতাহীন, অকার্যকর এবং সর্বতোভাবে উপেক্ষিত।

সিজিএস-এর কাছে রিপোর্ট করার পর তিনি আমাকে বিদ্যমান পরিকল্পনাটি অধ্যয়ন করতে এবং নতুন একটি পরিকল্পনা লিখতে বললেন। তিনি মনে করতেন বিদ্যমান পরিকল্পনাটি ছিল অপ্রতুল। ডিএমও পদে ছিলেন ব্রিগেডিয়ার ওমর, যাঁর ছিল সৃষ্টিশীল মস্তিষ্ক এবং অনেক ধ্যান-ধারণা। কিন্তু টেবিলের কাজকর্মে তাঁর অনীহা ছিল। মানচিত্র পর্যবেক্ষণ, দূরত্ব পরিমাপ ও শত্রুর সম্পদের সঙ্গে নিজের অবস্থার তুলনা করাসহ সুষ্ঠু সামরিক পরিকল্পনার জন্য অত্যাবশ্যকীয় বিষয়গুলো ছিল তাঁর জন্য বিরক্তিকর।

বিদ্যমান পরিকল্পনাটি নিম্ন পর্যায়সমূহের পেশাকৃত বিভিন্ন পরিকল্পনার সমষ্টি ব্যতীত বেশি কিছু ছিল না। কোন্ ধরনের অবস্থায় একটি যুদ্ধ শুরু হতে পারে তার উল্লেখ যেমন এতে ছিল না, তেমনি ছিল না বিশেষ পরিস্থিতিতে কিভাবে পদক্ষেপ নিতে হবে তারও কোনো পরিকল্পনা। সামরিক পরিভাষায় যাকে অনুমানভিত্তিক কর্মগত কৌশল ও তৎপরতার ধারণা বলা হয়, সে ব্যাপারে এতে কোনো চিন্তা করা হয়নি। এটা ছিল কেবলই বিভক্তির সমাহার- স্তর পরিকল্পনা। আমাকে তাই একটি কর্মগত পরিকল্পনা তৈরি করার জন্য রাতদিন কাজ করতে হয়েছে, অন্য দু'জন অফিসার (রানা ও সরফরাজ)-এর সহযোগিতা অবশ্য আমি পেয়েছি। পরিকল্পনাটি ছিল কেবল 'এই অনুমানের ওপর প্রতিরক্ষামূলক কার্যক্রম যখন শত্রুর প্রধান আক্রমণ পশ্চিম পাকিস্তানের বিরুদ্ধে পরিচালিত হচ্ছে এবং যখন পূর্ব পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ভারত প্রতিরক্ষামূলক অবস্থানে রয়েছে।'

পরিকল্পনাটি তৎকালীন প্রধান সেনাপতি জেনারেল ইয়াহিয়া খান অনুমোদন করেছিলেন। এরপর তিনি সেটিকে প্রেসিডেন্ট আইউব খানের কাছে উপস্থাপিত করেন। প্রেসিডেন্টও অনুমোদন করেন এবং উপস্থিত সকলের কাছ থেকেই আমি হাসি ও প্রশংসাসূচক মাথা হেলানো পাই (সে সময় অফিসাররা এখনকার মতো প্রশংসার জন্য অতিশয়োক্তি করতেন না। হাসি এবং ভালো করেছো ধরনের অভিব্যক্তিই তখন যথেষ্ট ছিল।)। পরিকল্পনাটি চূড়ান্ত করার পর আমি আরো একটি সম্ভাবনা বিশ্লেষণের কথা চিন্তা করলাম। এটা ছিল এই অনুমানের ওপর যখন শত্রু পূর্ব পাকিস্তান আক্রমণ করবে এবং পশ্চিম পাকিস্তানের বিরুদ্ধে থাকবে প্রতিরক্ষামূলক অবস্থানে– ঠিক যেমনটি আমার ভাবনার ছ' বছর পর ১৯৭১ সালে ঘটেছিল। এই পরিকল্পনা লেখার জন্য আমি সিজিএস-এর অনুমতি চাইলাম। ইতিমধ্যে আমার পদোন্নতির এবং ঢাকায় বদলির নির্দেশ প্রকাশিত হয়ে গিয়েছিল। সিজিএস তাই বললেন, "আমি নিশ্চিত যে, অন্য কেউ এ কাজটি করবে। কিন্তু তোমাকে ঢাকায় গিয়ে একটি কাজ করতে হবে। পূর্ব পাকিস্তানের ওপর বড় ধরনের

আক্রমণের যে অনুমানটির কথা তুমি বলছো সে ব্যাপারে সুপারিশসমূহ চূড়ান্ত করার উদ্দেশ্যে ১৪ ডিভিশন যুদ্ধ মহড়া পরিচালনা করছে। তোমাকে এই মহড়া পরিচালনায় ১৪ ডিভিশনের জিওসিকে সহায়তা করতে হবে। মহড়াশেষে তুমি যে কোনো সুপারিশ পেশ করতে পারো, তোমার সুপারিশকে যথোচিতভাবে বিবেচনা করা হবে।"

এক্স সুন্দরবন ১ নামের অনুশীলনটির পরিচালক হিসেবে আমি দায়িত্ব পালন করি। অনুশীলন সম্পন্ন করার পর আমার সিদ্ধান্ত ও মতামত আমি সিজিএস মেজর জেনারেল ইয়াকুব খান ও জিওসি মেজর জেরারেল মুজাফ্ফর উদ্দিনের কাছে পেশ করি। এতে আমি তিনটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তুলে ধরি, যেগুলো ছিল তাৎপর্যপূর্ণ এবং সম্ভবত প্রথমবারের মতো পরিষ্কারভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছিল। এগুলো ছিল :

১. পূর্ব পাকিস্তানের অবস্থান দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন পোল্যান্ডের মতো। একে চারদিক থেকে শত্রু ঘিরে আছে। পোল্যান্ডের মতো এরও প্রধান প্রধান শহর সীমান্তবর্তী এলাকায় অবস্থিত হওয়ায় আমাদের বাহিনীসমূহের দৃষ্টি বাইরের দিকে নিবদ্ধ থাকছে। এর ফলে মধ্যভাগে শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছে এবং ঢাকা উন্মোচিত হয়ে আছে শত্রুর সামনে।

২. এই ভূখণ্ডের প্রতি ইঞ্চি জায়গার প্রতিরক্ষা সম্ভব নয়। পাকিস্তান সেনা বাহিনীর ব্রতকে 'পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিরক্ষার পরিবর্তে অস্তিত্ব নিয়ে থাকা'য় পরিণত করতে হবে। প্রথমবারের মতো এই পরিভাষার ব্যবহার হয়েছিল এবং তা পরবর্তীকালে সেনা সদর দফতর থেকে জারিকৃত কার্যক্রমগত নির্দেশনার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল।

৩. ঢাকার ওপর চূড়ান্ত আক্রমণ আসবে উত্তর দিক থেকে, যেমনটি গুডেরিয়ান করেছিলেন পোল্যান্ডে (দুর্ভাগ্যক্রমে আমি কতটা সঠিক ছিলাম!)। সুতরাং যে কোনো মূল্যে ঢাকাকে প্রতিরক্ষার জন্য পর্যাপ্ত প্রতিরক্ষামূলক পদক্ষেপ নিতে হবে।

উভয় জেনারেল অফিসারই এই অভিমতগুলোকে সমর্থন করেছিলেন এবং ১৪ ডিভিশনের জিওসি জেনারেল মুজাফফর উদ্দিন উত্তর সীমান্তের প্রবেশ পথ প্রহরার জন্য এক ব্যাটেলিয়ন সৈন্য মোতায়েন করার নির্দেশ জারি করেছিলেন– যা ঐ সময় পর্যন্ত উপেক্ষিত ছিল।

১৯৬৭ সালের ২ ফেব্রুয়ারি আমি আর্টিলারি ১৪ ডিভিশনের অধিনায়ক হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করি। ১৯৭৪ সালের ২১ এপ্রিল পর্যন্ত নিয়তিনির্ধারিত পরবর্তী বছরগুলো আমাকে পূর্ব পাকিস্তানে ও ভারতে আটকে রাখে। সুন্দরবন ১ নামের অনুশীলন পরিচালনার দায়িত্বপ্রাপ্ত থাকলেও একই সময় সিজিএস আমাকে দুটি নিবন্ধ রচনা করার নির্দেশ দিয়েছিলেন: একটা ১৯৬৫ সালের যুদ্ধের ওপর এবং দ্বিতীয়টি 'পাকিস্তানের জন্য দ্বিতীয় লাইনের বাহিনী'র ওপর। এই নিবন্ধ দুটি লেখার উদ্দেশ্যে আমি সাময়িক দায়িত্বে রাওয়ালপিন্ডিস্থ সেনা সদর দফতরে ফিরে আসি এবং কয়েক মাস এখানে থেকে যাই। প্রকৃতপক্ষে পূর্ব পাকিস্তানে

কার্যকালের প্রথম বছরে সেনা সদর দফতর নির্দেশিত এই কাজ উপলক্ষে রাওয়ালপিন্ডিতে আমি ছ'মাসের বেশি সময় অবস্থান করি।

১৯৬৮ সালে অ্যাবোটাবাদে অনুষ্ঠিত ফরমেশন অধিনায়কদের সম্মেলনে দ্বিতীয় লাইনের বাহিনী সম্পর্কিত নিবন্ধটি ফিল্ড মার্শাল আইউবের কাছে পেশ করা হয়। একজন জেনারেল অফিসার আমাকে প্রশ্ন করেন, "অসামরিক জনগণের হাতে অস্ত্র দিলে কি সরকারের জন্য মারাত্মক হুমকির সৃষ্টি হবে না?" উত্তরে আমি বলেছিলাম, "কোনো জাতি যদি তার শাসকদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে যায় তাহলে তাদেরকে উৎখাত করার জন্য সে জাতির কোনো অস্ত্রের প্রয়োজন হয় না।" আমি সে সময় সামান্য একজন কর্নেল ছিলাম। অফিসারটি প্রেসিডেন্ট ও অন্যান্য উর্ধ্বতন অফিসারের সামনে আমার অতটা স্পষ্ট ও সাহসী জবাব পছন্দ করেন নি। উপস্থিত সকলের মতামত পাওয়ার পর আমাকে নিবন্ধটি পুনরায় পেশ করতে বলা হয়।

সম্মেলনটি বাৎসরিক ছিল এবং অ্যাবোটাবাদেই ১৯৬৯ সালে পরবর্তী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। ইতিমধ্যে গণআন্দোলনের প্রেক্ষাপটে আইউবের কাছ থেকে ইয়াহিয়া খান দেশের শাসন ক্ষমতা নিয়েছেন। আমিও পদোন্নতি পেয়ে ব্রিগেডিয়ার হয়েছি। সম্মেলনকক্ষের দিকে হেঁটে যাওয়ার সময় সামরিক প্রশিক্ষণের মহাপরিচালক মেজর জেনারেল নওয়াজিশ আমাকে বললেন, "ফরমান, আমরা তোমার প্রস্তাবগুলোর সমালোচনা করতে যাচ্ছি।" আমি বললাম, "শুধু এজন্য যে, আমি একটা কিছু লিখেছি। যাঁরা কিছুই লেখেন না এবং কোনো প্রস্তাবও তৈরি করেন না, তাঁদেরকে সমালোচনাও করা যায় না।" ততক্ষণে আমরা হলঘরে প্রবেশ করেছি, যা পূর্ণ ছিল লাল-ব্যাজধারী সব অফিসারে। আমার বক্তব্যের শুরুতেই আমি মন্তব্য করতে গিয়ে বলি,"ভদ্র মহোদয়গণ, একটি প্রশ্নের জবাবে গত বছর আমি বলেছিলাম, কোনো জাতি যদি তার শাসকদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে যায় তাহলে তাদেরকে উৎখাত করার জন্য সে জাতির কোনো অস্ত্রের প্রয়োজন হয় না। পরবর্তী ঘটনা প্রবাহ আমার কথারই সত্যতা প্রমাণ করেছে।"

আমার মতে মুসলমানরা প্রকৃতিগতভাবেই তাদের প্রতি অনুগত থাকে, যারা তাদেরকে অস্ত্রের যোগান দেয়। সাধারণভাবে তারা সুশৃংখল ও যথেষ্ট অনুগত, যদি তাদের ওপর বিশ্বাস রাখা হয়। আমার আগের অভিমত পুনরুল্লেখ করে আমি বলি, সেনাবাহিনী একা কখনো পাকিস্তানকে রক্ষা করতে পারবে না, আমরা কোনোদিনই এজন্য প্রয়োজনীয় বিপুল সম্পদের অর্থ যোগাতে পারব না। আমার অভিমত ছিল, অসামরিক জনগণকে আঞ্চলিক ভিত্তিতে প্রশিক্ষণ দিতে হবে এবং জাতির প্রতিরক্ষা প্রচেষ্টায় তাদের ঐক্যবদ্ধ করতে হবে। আমার প্রস্তাব গৃহীত ও অনুমোদিত হয় এবং তার বাস্তবায়নও সূচিত হয়েছিল, কিন্তু কতিপয় বিশেষ পরিমার্জনার ফলে উদ্দেশ্য ও প্রেষণার মূল দিকটি বিকৃত হয়ে যায় এবং তা দেশপ্রেমের স্থলে অর্থনৈতিক লাভের জন্য ব্যবহৃত হতে থাকে।

আমি সবেমাত্র এক্স সুন্দরবন অনুশীলন পরিচালনার কাজ শেষ করেছি, ঠিক তেমন একটি সময়ে আমাকে হজ্ব পালনোপলক্ষে ছুটিতে গমনকারী ব্রিগেডিয়ার গোলাম ওমরের স্থানে ডিএমও পদে দায়িত্ব পালনের জন্য সেনা সদর দফতরে ডেকে নেয়া হয়। ডিএমও হিসেবে আমি পূর্ব পাকিস্তানে 'অস্তিত্ব নিয়ে থাকা'র ধারণাটি সিজিএসকে দিয়ে অনুমোদন করিয়ে নিতে এবং তাকে 'কর্মগত নির্দেশনা'য় অন্তর্ভুক্ত করাতে পেরেছিলাম। সেটা এখনো ওখানে রয়েছে এবং ১৯৭১ সালে পূর্ব পাকিস্তানে সেনাবাহিনীর বিপর্যয়ের কারণ তদন্তের উদ্দেশ্যে জনাব ভুট্টো গঠিত কমিশনের প্রধান, বিচারপতি হামুদুর রহমান আমাকে তা দেখিয়েছেন। ১৯৬৫ সালের যুদ্ধের ওপর আমার প্রতিবেদনটি অবশ্য কখনো আলোর মুখ দেখেনি। কারণ ওতে যুদ্ধ পরিচালনার সমালোচনা ছিল এবং উপসংহারে বলা হয়েছিল যে, কাশ্মীর প্রসঙ্গকে সক্রিয় করায় আমরা আমাদের উদ্দেশ্য অর্জনে ব্যর্থ হয়েছি, ফলে যুদ্ধ জয় করতে পারিনি।

১৯৬৭ সালের ফেব্রুয়ারী থেকে বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত পরবর্তী দিনগুলোও পূর্ব পাকিস্তানে থাকায় প্রদেশের সমস্যাবলীকে আমি খুব কাছে থেকে পর্যবেক্ষণ করার সুযোগ পেয়েছিলাম। যে পাঁচ বছর সেখানে আমি ছিলাম সে সময়পর্বটি খুবই ঘটনাবহুল। এ সময়ের মাঝেই আগরতলা মামলা প্রকাশ্যে আসে, এর পরপর মুজিবুর রহমানের বিচার ও প্রদেশব্যাপী আন্দোলন অনুষ্ঠিত হয় এবং ঘোষিত হয় ইয়াহিয়ার সামরিক শাসন।

১৯৬৭ সালে আমি খুবই পীড়াদায়ক পরিস্থিতি পেয়েছিলাম। দেশকে ভাঙার লক্ষ্যে আন্দোলনের পরিষ্কার প্রবণতা তখন সুস্পষ্ট। বাংলাদেশের দাবি নিয়ে আলোচনা চলত প্রকাশ্যে। সাধারণ বাংগালীদের চোখে প্রতিফলিত হত পশ্চিম পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ঘৃণা। যে সব বাংগালী পশ্চিম পাকিস্তানীদের সঙ্গে মেলামেশা করত বা কোনো রকম সম্পর্ক রাখত তাদেরকে অন্যরা পরিহার করে চলত। পশ্চিম পাকিস্তানী আধিপত্যের প্রতীক হিসেবে বিবেচিত উর্দুর বিরুদ্ধে প্রচারাভিযান এত প্রবল ও ব্যাপকভিত্তিক ছিল যে, উর্দুতে লেখা কোনো সাইনবোর্ড কোথাও দেখা যেত না। সকল দোকানেই ছিল বাংলা সাইনবোর্ড। ঢাকার কোনো বাজারের মধ্যে গিয়ে কেউ উপস্থিত হলে নিজেকে তার বিচ্ছিন্ন ও বিদেশী মনে হত। আপনি যদি কাউকে উর্দুতে কোনো প্রশ্ন করতেন তাহলে আপনাকে উপেক্ষা করা হতো কিংবা উত্তর দেয়া হত ইংরেজিতে। উর্দুকে ঘৃণা করার প্রচারাভিযান ধর্মের রাজ্যেও আক্রমণ করেছিল। আমি অনেক ছাত্রকে বলতে শুনেছি যে, তারা কোরআন পড়বেন না, কারণ তা উর্দু হস্তলিপিতে লেখা। আমার সে সময় মনে হত ইসলাম সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ এবং ঐ অঞ্চলে ইসলামকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে হলেও তাদেরকে নিজস্ব রাষ্ট্র দিয়ে দেয়া উচিত।

পূর্ব বাংলার ওপর তাদের কথিত পশ্চিম পাকিস্তানের আধিপত্য ও শোষণের বিরুদ্ধে প্রচারাভিযানে সবচেয়ে অগ্রবর্তী অবস্থানে ছিল ছাত্ররা। পূর্ব পাকিস্তানে এই আন্দোলন

যেভাবে প্রবল হয়ে উঠছিল তার মাত্রা, ব্যাপকতা ও সংগঠন সম্পর্কে অনুমান বা ধারণা করা কোনো পশ্চিম পাকিস্তানীর পক্ষে সম্ভব ছিল না। মুজিবুর রহমানের মতো নেতাদের আহ্বানে কয়েক মিনিটের মধ্যে রাস্তায় বা জনসভাস্থলে লক্ষ লক্ষ মানুষ জমায়েত হত। গ্রামের প্রাথমিক স্কুলের পর্যায় পর্যন্ত ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের শাখা ছিল। আমি একথা বললে অত্যুক্তি করা হবে না যে, ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ ডাক দিলে, এমন কি কোনো পাখিকেও উড়তে দেয়া হত না। তাদের অনুমতি ব্যতীত কোনো গাড়ি রাস্তায় চলতে পারত না। ধর্মঘটের দিন মানুষকে নগ্ন পদে হাঁটতে হত। সভা ও মিছিল সংগঠিত করা হত বিশাল আকারে। পশ্চিম পাকিস্তানবিরোধী বিদ্বেষপূর্ণ স্লোগান গেঁথে দেয়ার জন্য সংগঠকদের পক্ষ থেকে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানো হত। বাংলাদেশপন্থী স্লোগান ধ্বনিত হত বলিষ্ঠতা ও আবেগসহযোগে। 'আমার দেশ, তোমার দেশ- বাংলাদেশ-বাংলাদেশ' স্লোগানটি সমস্বরে উচ্চারণ করত লক্ষ লক্ষ মানুষ। শিল্পীরা পশ্চিম পাকিস্তানবিরোধী বিদ্বেষ ও শত্রুতা চিত্রিত করে ছবি আঁকত। এ প্রসঙ্গে দু'একটি উদাহরণ দিলেই যথেষ্ট হবে। একটি ছবিতে দেখানো হয়েছে একজন পাগড়িপরা বিরাট মানুষ হাতে ছুরি লুকিয়ে রেখে ধুতিপরা একজন ক্ষুদ্র মানুষকে জড়িয়ে ধরছে এবং বন্ধুত্বের ছদ্মাবরণে বড় মানুষটি ক্ষুদে মানুষটিকে ছুরিকাঘাত করছে। এর মধ্য দিয়ে বাংগালীদের সঙ্গে পাঞ্জাবীদের বিশ্বাসঘাতকতাকে চিত্রিত করা হয়েছে। অন্য একটি পোস্টারে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মানচিত্র আঁকা হয়েছে। এতে একটি সাপকে দেখানো হয়েছে যা পশ্চিম পাকিস্তান থেকে দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে গিয়ে পূর্ব পাকিস্তানকে ছোবল মারছে। পূর্ব পাকিস্তানের সকল দুর্দশার জন্য পশ্চিম পাকিস্তানকে দোষারোপ করা হত, এমন কি যে বন্যা, ঝড় ও জলোচ্ছ্বাস শতাব্দীকালব্যাপী ঐ অঞ্চলটিকে দুর্ভোগকবলিত করে আসছিল, সেগুলোর ব্যাপারেও পশ্চিম পাকিস্তানের অশুভ উদ্দেশ্যকে দায়ী করা হত।

আমি অচিরেই দেখলাম যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাস্তবে একটি স্বাধীন দ্বীপ। এর অঙ্গনে পাকিস্তানের পতাকা উড়ত না, উড়তে পারত না। প্রায় প্রতিদিন সেখানে ছাত্ররা সভা করত, সভায় সরকারের সকল কার্যক্রমের প্রতিবাদ ও সমালোচনা করা হত তীব্র ভাষায়। এ ধরনের সভাগুলোতে পশ্চিম পাকিস্তানের নিন্দা করা হত এবং দাবি জানানো হত বাংলাদেশ সৃষ্টি করার জন্য।

এই বিচ্ছিন্নতা কত ব্যাপক ছিল তা আমার নিজের অভিজ্ঞতা থেকে অনুমান করা যাবে। নওশেরায় আমি একজন মেজর জামানকে চিনতাম। আমরা ঢাকায় এলাম, তিনি সেনাবাহিনী ত্যাগ করলেন। মাঝে মধ্যে বাজার বা অন্যান্য স্থানে আমাদের দেখা হত, কিন্তু তাঁরা এড়িয়ে চলতেন, এমন কি মেসেও আমি এ রকমটি দেখেছি। বাংগালী অফিসাররা পশ্চিম পাকিস্তানী অফিসারদের সঙ্গে মেলামেশা করতেন না। এই দুটি গ্রুপকে মিলিত

করানোর জন্য জেনারেল মুজাফফর উদ্দিন বিশেষ প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন, কিন্তু তা ব্যর্থ হয়ে যায়। পশ্চিম পাকিস্তানী অফিসারদের বাংলায় কথা বলতে না পারা ছিল এর অন্যতম কারণ।

আমরা সবাই জানতাম যে, শতকরা ৯৫ ভাগ বাংগালী মুসলমান পাকিস্তানের পক্ষে ভোট দিয়েছিল। তারা ইসলামী ভ্রাতৃত্বের অনুভূতি প্রকাশ করেছে এবং সুনির্দিষ্টভাবেই মুসলমানদের জন্য পৃথক আবাসভূমি চেয়েছে। প্রথম গণপরিষদে প্রদেশের বাইরে থেকে আগত মুসলিম সদস্যদেরকে বাংগালী মুসলমানরা নিজেদের প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ দিয়েছে। কিন্তু ১৯৬৭ সালে আমি দেখলাম, ইসলামী ভ্রাতৃত্ব ও ইসলামের ভিত্তিতে পাকিস্তানের সংহতি রক্ষার প্রসঙ্গ তাদের কাছে কোনো বিশেষ অর্থ বহন করে না। দেশ বিভাগের পর বাংগালী বাবুরা বিদায় নিয়েছে সত্য, কিন্তু একটু ভিন্নভাবে হলেও বাংগালী জাদু তখনো সক্রিয় ছিল বলে মনে হয়েছে। পশ্চিম পাকিস্তান তাদের কাছ থেকে সবকিছু ছিনিয়ে নিয়েছে এই ধারণায় সর্বস্তরের ভুখা বাংগালী জনগণ বিদ্যুস্পৃষ্ট হয়েছিল। তারা তাই নিজের দূরবর্তী ভাই পশ্চিম পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিল। ইতিহাসের মিথ্যা বর্ণনা করা হয়েছে, ইতিহাসকে অস্বীকার করতে চাওয়া হয়েছে, যদিও পাকিস্তান ভাঙনের পর অতিক্রান্ত দুটি দশক সে প্রচেষ্টাকে নিষ্ফল হিসেবে প্রমাণ করেছে।

বিচ্ছিন্নতা

পাকিস্তানের দুই প্রদেশের মধ্যে কিভাবে বিচ্ছিন্নতা ও শত্রুতা বিকশিত হয়েছিল? এর সূচনা ঘটে প্রথম দিকেই। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ঠিক প্রাক্কালে বাংলার মুসলমানদের মহান নেতা জনাব সোহরাওয়ার্দী অবিভক্ত স্বাধীন বৃহত্তর বাংলার ধারণা ও দাবির পক্ষে প্রচারণা চালিয়েছিলেন। তিনি ঘোষণা করেন, "বাংলাকে একটি মহান দেশ বানাও এবং বাংগালী মুসলমান, হিন্দু ও তফসিলী সম্প্রদায়কে নিয়ে একটি মহান জাতি গড়ে তোল।" তিনি গান্ধীজি, কায়েদে আযম ও অন্যান্য নেতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। কিন্তু একমাত্র বাংলার মুসলিম নেতৃবৃন্দের অধিকাংশ ব্যতীত কেউই তাঁর এই ধারণাটিকে পছন্দ করেন নি। শ্যামা প্রসাদ মুখার্জির নেতৃত্বাধীন হিন্দুরা প্রস্তাবটির বিরোধিতা করেছিলেন। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় এ ধারণার স্বাভাবিক মৃত্যু ঘটে। কিন্তু তা জাতীয়তাবাদের এই ধারণার বীজ বপন করে যায় যে, বাংগালীরা একটি পৃথক জাতি।

আলোচনার মধ্য দিয়ে একথাও বেরিয়ে এসেছে যে, পাকিস্তান সম্পর্কেও দুই প্রদেশের কল্পনায় ভিন্নতা ছিল। বাংগালীরা বেশি গুরুত্ব আরোপ করত লাহোর প্রস্তাবের ওপর যার ভেতরে তাদের মতে দুটি স্বাধীন মুসলিম দেশের কথা বলা হয়েছিল। তারা রাজনৈতিক ক্ষমতা কাঠামোয় তাদেরকে আরো বেশি স্বীকৃতি দেয়ার দাবি জানাত। অথচ ১৯৪৬ সালে জনাব সোহরাওয়ার্দীর উদ্যোগে লাহোর প্রস্তাবে এই মর্মে সংশোধনী আনা হয়েছিল যে, পাকিস্তান একটি রাষ্ট্র হবে।

ভাষা ও পররাষ্ট্রনীতির মতো প্রধান দুটি জাতীয় নীতির প্রশ্নে তীব্র ও ক্ষতিকর মতভিন্নতা প্রকাশ্যে এসে গিয়েছিল। বাংগালীরা এমন কি কায়েদে আযম মুহম্মদ আলী জিন্নাহর উর্দুকে জাতীয় ভাষা করার ঘোষণাকে মেনে নেয়নি, যদিও তিনি পরিষ্কারভাবে বলেছিলেন যে, ঐ প্রদেশে বাংলা ভাষার সম্পূর্ণ ভূমিকা অব্যাহত থাকতে দেয়া হবে। পররাষ্ট্রনীতির প্রশ্নে ভারতকে নিজেদের স্বাভাবিক অংশীদার হিসেবে বিবেচনা করে বাংগালীরা ভারতের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রাখতে চেয়েছিল।

প্রতিনিধিত্বের প্রশ্নের কারণে সংবিধান রচনা ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত বিলম্বিত হয়। অধিক জনসংখ্যার কারণে পূর্ব বাংলার বেশি ভোট থাকলেও জাতীয় পরিষদে তাদের প্রতিনিধির সংখ্যা কম ছিল। কারণ ভারতের অন্যান্য প্রদেশের মুসলিম সদস্যদেরকে বাংগালীদের কোটা থেকে আনা হয়েছিল। পশ্চিম পাকিস্তান বাংগালীদের আধিপত্যকে ভয় পেতো এবং সেজন্য সে সংখ্যাসাম্য চাপিয়ে দিয়েছিল।

ঐতিহাসিক কারণে অসামরিক প্রশাসনে এবং সশস্ত্র বাহিনীসমূহেও বাংগালীদের কম প্রতিনিধিত্ব ছিল। সমগ্র ভারতীয় সিভিল সার্ভিসে মাত্র একজন আইসিএস অফিসার এবং ভারতীয় পুলিশ বাহিনীতে ১৭ জন বাংগালী ছিলেন। পাকিস্তানের প্রশাসন পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় লোকজনের বেশির ভাগ নেয়া হয়েছিল ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে দেশত্যাগ করে আগতদের মধ্য থেকে। এদেরকেও পশ্চিম পাকিস্তানী হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। সশস্ত্র বাহিনীসমূহে কম প্রতিনিতিত্বের জন্য দায়ী ছিল বৃটিশ নীতি– ইংরেজরা বাংগালীদের অযোদ্ধা জাতি মনে করত, এমন কি ১৯৫৫ সালে বেশ কিছু বাংগালীকে নেয়ার পরও (১৯৬৭ সালে পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে) মাত্র একজন বাংগালী ব্রিগেডিয়ার এবং কয়েকজন মাত্র বাংগালী কর্নেল ছিলেন।

অর্থনৈতিক দিক থেকে পূর্ব বাংলা ছিল বেশী দরিদ্র এলাকা এবং অবকাঠামোগত দিক থেকেও তা ছিল পশ্চাদপদ। এর জন্য পশ্চিম পাকিস্তানকে দায়ী করে বলা হত যে, পশ্চিম পাকিস্তান তাদের সম্পদ শোষণ করে নিয়ে গেছে। বাস্তব তথ্যটি হল ঐ অঞ্চলে জনসংখ্যা ছিল অত্যধিক এবং সম্পদ ছিল খুবই সামান্য। বাংলাদেশ হওয়ার পর এ কথার সত্যতা প্রশমিত হয়েছে- দেশটি পৃথিবীর ভিক্ষার পাত্র হিসেবে বর্ণিত হচ্ছে।

পাকিস্তান সরকারের পক্ষ থেকে আন্তরিক প্রচেষ্টা নেয়া হলে ওপরের সকল কারণকেই প্রমাণিত করা সম্ভব হত। পূর্ব বাংলা মুসলিমলীগের সুপারিশগুলোকে অন্তত পাকিস্তান সরকারের গ্রহণ করা উচিত ছিল যার মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানের জন্য অধিক স্বায়ত্তশাসনসহ ফেডারেল ধরনের সরকারের কথা বলা হয়েছিল। যোগাযোগ ও বাণিজ্যের ব্যবস্থাপনার পাশাপাশি তারা কতিপয় বিষয়কে প্রদেশের নিয়ন্ত্রণাধীন রাখতে চেয়েছিল। এ সবই ছিল ন্যায়সঙ্গত দাবি, সেগুলো অস্বীকৃত হওয়ার ফলে এসেছিল ৬ দফা।

সশস্ত্র বাহিনীসমূহে বাংগালী অফিসারদের সংখ্যাস্বল্পতা থাকায় সামরিক শাসনের প্রবর্তনের মধ্য দিয়েও পূর্ব পাকিস্তানের মর্যাদাকে উপনিবেশের অবস্থানে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, এমন কি এখনো মানুষ পূর্ব পাকিস্তানকে হারানোর কারণে আক্ষেপ করে। এ সবের জন্য দায়ী ছিল আমলাদের আচরণ, যারা বৃটিশ রাজদের মতো মনোভাব পোষণ করত।

অতএব, ঢাকায় পরিবেশ হয়ে পড়েছিল শ্বাসরুদ্ধকর। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের সাধারণ মানুষের সম্পর্কের মধ্যেও বিদ্বেষপূর্ণ মনোভাবের বিকাশ ঘটেছিল। একটি দিক-

পরিবর্তনকারী সময়পর্বে দাঁড়িয়ে থাকার স্মৃতি আমাকে নাড়া দেয়। এক জাতি হিসেবে পাকিস্তানের টিকে থাকার সম্ভাবনাই তখন প্রশ্নের সম্মুখীন হয়ে পড়েছিল। ভারতের সঙ্গে ১৯৬৫ সালের যুদ্ধ বাংগালীদেরকে নিজেদের বিচ্ছিন্নতার ব্যাপারে সচেতন করে তোলে। পূর্ব পাকিস্তানকে চীন রক্ষা করেছে বলে জনাব ভুট্টোর ঘোষণাও বাংগালীদের মধ্যে এই মনোভাব জাগিয়ে তোলে যে, পূর্ব পাকিস্তানের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য পশ্চিম পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্ক রাখা অত্যাবশ্যক নয়, যদি সে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জন করে।

অন্য যে কোনো একক কারণের তুলনায় আগরতলা মামলা একাই পাকিস্তানের সংহতির জন্য অনেক বেশি ক্ষতি করেছিল। 'উদ্ঘাটিত' ষড়যন্ত্রের আলোকে মামলাটি সাজানো হয়েছিল। এই মামলায় অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগটি ছিল, তারা ভারতের দেয়া অস্ত্র, গোলা-বারুদ ও অন্যান্য সামগ্রী দিয়ে সশস্ত্র পন্থায় পূর্ব পাকিস্তানকে রাওয়ালপিন্ডির নিয়ন্ত্রণ থেকে বিচ্ছিন্ন করার পরিকল্পনা করেছিলেন। আইএসআই ও আইবিসহ গোয়েন্দা সংস্থাগুলো অভিযোগ করে যে, আমাদের সশস্ত্র বাহিনীর তিন শাখরাই কিছু সংখ্যক বাংগালী সদস্য মুজিবুর রহমান ও অন্য কতিপয় রাজনীতিবিদের সক্রিয় সমর্থনে পাকিস্তানকে ধ্বংস করার ষড়যন্ত্র করেছেন এবং এই ষড়যন্ত্রটিকে ভারতীয়দের সঙ্গে সম্পূর্ণরূপে সমন্বিত করা হয়েছে। সীমান্ত সংলগ্ন ভারতীয় শহর আগরতলায় ভারতীয়দের সঙ্গে তাদের বেশ কয়েকটি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে আগরতলা মামলা সঠিকভাবে পরিচালনা করা হয়নি। অনেক ভুল করা হয়েছে, যার ফলে অন্য যে কোনো কিছুর চাইতে এই মামলা পাকিস্তানের সংহতির ব্যাপারে অনেক বেশি ক্ষতি করেছিল।

আমি তখন আর্টিলারির অধিনায়ক। জিওসি মেজর জেনারেল মুজাফফর উদ্দিনের সঙ্গে আলোচনাকালে আমি মামলায় মুজিবের নাম অন্তর্ভুক্ত না করার পরামর্শ দিয়েছিলাম। আন্তঃবাহিনী গোয়েন্দা বিভাগ (আইএসআই)-এর মহাপরিচালক মেজর জেনারেল আকবর কথাটিকে অন্যভাবে নিলেন এবং ভাবলেন যে, তাঁকে অন্তর্ভুক্ত করা অত্যাবশ্যক। "জনগণ তার চামড়া তুলে নেবে", তিনি বললেন। মুজিবুর রহমানের অন্তর্ভুক্তি মামলাটিকে রাজনৈতিক মামলায় পরিণত করল। তিনি রাতারাতি বাংগালীদের এমন এক জাতীয় নায়কে পরিণত হলেন, যিনি তাঁর পূর্ব পাকিস্তানের ভাইদের অধিকার আদায়ের জন্য পাকিস্তান রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করছেন। এই মামলা বিশেষ ট্রাইব্যুনালে হয়েছে। নানা কারণে মামলাটি দীর্ঘায়িত হয়েছিল। এর শুনানি চলতো প্রকাশ্যে। সংবাদপত্রে প্রায় অক্ষরে অক্ষরে এর পূর্ণাঙ্গ বিবরণী প্রকাশিত হতো। সাক্ষী ও প্রত্যক্ষদর্শীরা আদালতকে একটি রাজনৈতিক মঞ্চ হিসেবে ব্যবহার করেছেন। যেখানে প্রতিনিধিত্ব, নিযুক্তি ও পদোন্নতিসহ বিভিন্ন ব্যাপারে বাংগালীদের বিরুদ্ধে সংঘটিত বৈষম্যের মারাত্মক অভিযোগগুলোকে সবিশেষ গুরুত্বসহকারে তুলে ধরা হত। তথ্য ও অর্ধসত্যকে মিথ্যার সঙ্গে মিশিয়ে এমন পন্থায়

উপস্থাপন করা হত যাতে সমগ্র বাংগালী জনগোষ্ঠীর সহানুভূতি জাগিয়ে তোলা ও সমর্থন আদায় করা যায়। এ সব কথা তারা আগে কখনো শোনেনি। আগরতলা মামলা পাকিস্তানী বাংগালীদের বাংগালী জাতীয়তাবাদীতেও রূপান্তরিত করেছিল।

মামলাটিকে টেনে নেয়া হচ্ছিল। মামলা তখনো সমাপ্ত হয়নি, তেমন একটি সময়ে পশ্চিম পাকিস্তানে আইউ ববিরোধী আন্দোলন শুরু হয়। প্রাথমিক পর্যায়ে পূর্ব পাকিস্তানের আন্দোলন শান্তিপূর্ণ ছিল, যদিও ব্যতিক্রমী ছাত্ররা অতীতের মতোই বেশি সক্রিয় হয়ে উঠেছিল। যাহোক, পশ্চিম পাকিস্তানে পিপিপি-র নেতৃত্বাধীন আন্দোলনের চাপে কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ ঝাঁকুনি খাওয়ার পর পূর্ব পাকিস্তানও উঠে দাঁড়ায়। ভাসানীর 'আগুন জ্বালো-সবকিছু পুড়িয়ে দাও' শ্লোগান সহকারে পূর্ব পাকিস্তানের আন্দোলন ছিল অনেক বেশি সহিংস, বাস্তবে এই শ্লোগান বাস্তবায়িত হচ্ছিল। আগরতলা মামলা চরমপন্থীদের কেন্দ্রীয় অংশের জন্য ঘটনা প্রবাহের নিয়ন্ত্রণ দখল করার অজুহাত সৃষ্টি করে। সার্জেন্ট জহুরুল হকের মৃত্যু আগুনে বাড়তি ইন্ধন যোগায়। যেখানে যখনই কেন্দ্র দুর্বল হয়েছে সেখানে তখনই প্রাদেশিক শাসকরা নিজেদের স্বাধীনতার পতাকা তুলে ধরেছেন- মুসলিম ইতিহাসের এই দিকটির আরো একবার পুনরাবৃত্তি ঘটলো। পশ্চিম পাকিস্তানে আইউবের অবস্থান দুর্বল হয়ে পড়ে। পূর্ব পাকিস্তানের রাজনীতিকরা পরিস্থিতির পূর্ণ সুযোগ নিলেন এবং তাদের নিজেদের আন্দোলন শুরু করলেন। সমগ্র দেশব্যাপী পরিচালিত আন্দোলনের পরিণতিতে আইউব আহূত গোলটেবিল সম্মেলন স্থগিত হয়ে গেল। মুজিবকে মুক্তি দেয়ার আগে এবং তাঁকে বৈঠকে আমন্ত্রণ জানানো না হলে পশ্চিম পাকিস্তানী নেতৃবৃন্দ গোলটেবিল সম্মেলনে অংশ নিতে অস্বীকার করলেন। এভাবেই মুজিব নেতাদের নেতায় পরিণত হলেন। তাঁকে এক অসমীচীন গুরুত্ব দেয়া হলো, এর ফলে পূর্ব পাকিস্তানে তাঁর অবস্থান আরো ওপরে উঠে গেলো।

কতটা প্রামাণিক ছিল আগরতলা মামলা? এ কথা প্রমাণিত হয়েছিল পরবর্তী ঘটনাবলী ও ১৯৭১-এর মধ্য দিয়ে, যখন আন্তর্জাতিক আচরণের সকল রীতিনীতির বিরুদ্ধে ভারত তার প্রতিবেশীর ভাঙন ঘটানোয় সক্রিয়ভাবে অংশ নিয়েছিল। এ প্রসঙ্গে আমি আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার একজন অভিযুক্ত মরহুম লেঃ কমান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেনের পত্নী মিসেস কোহিনূর হোসেনের লেখা একটি চিঠির উল্লেখ করতে পারি। স্বামীর স্মরণে শ্রদ্ধা জ্ঞাপনোপলক্ষে রচিত এই চিঠিটি ১৯৭২ সালের ২৬ মার্চ ঢাকার দৈনিক 'পূর্বদেশ'-এ প্রকাশিত হয়েছিল। আমি এখনো এর কয়েকটি লাইন সুস্পষ্টভাবে স্মরণ করতে পারি। বাংলা থেকে সেগুলোর প্রায় হুবহু ইংরেজি অনুবাদ আমি নিচে উদ্ধৃত করছি:

'প্রিয়তম স্বামী... তুমি আর আমার সঙ্গে নেই। স্বাধীন বাংলাদেশের লক্ষ্যাভিসারী তোমার অবদান আমি স্মরণ করি। আমার মনে পড়ে কিভাবে ছুটি নিয়ে করাচী থেকে

ছদ্মনামে তুমি ঢাকায় আসতে, অন্যান্য ভারতীয় ও বাংলাদেশী অফিসারকে সঙ্গে নিয়ে কিভাবে তুমি ভারতীয় দূতাবাসের প্রথম সচিব পি এন ওঝার সঙ্গে আগরতলায় সাক্ষাৎ করতে। অস্ত্র ও অন্য বিভিন্ন ধরনের সাহায্যের জন্য তুমি ভারতীয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ ও আলোচনা করেছিলে...'

ভারতীয় উপমহাদেশের পাঠকরা হয়তো স্মরণ করতে পারেন যে, এই পি এন ওঝা অন্য কেউ নন, বরং তিনিই, যাকে 'গোয়েন্দাবৃত্তি ও ধ্বংসাত্মক তৎপরতা'র অভিযোগে পাকিস্তান সরকার দেশ থেকে বহিষ্কৃত করেছিল। এ ব্যাপারে সন্দেহের কোনো অবকাশ থাকতে পারে না যে, ভারতীয়রা পূর্ব পাকিস্তানের বিচ্ছিন্নতার লক্ষ্যে সব সময় কাজ করে এসেছে এবং পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধীনতার দাবিতে সৃষ্ট পরিস্থিতি পরিপূর্ণ সুযোগ নিয়েছে।

পশ্চিম পাকিস্তানী নেতাদের চাপের কাছে আইউব খান নতি স্বীকার করেন। প্যারোলে শেখ মুজিবের শর্তসাপেক্ষে মুক্তির এবং তাঁকে রাওয়ালপিন্ডি নেয়ার আয়োজন করার জন্য জেনারেল মুজাফফর উদ্দিনকে নির্দেশ দেয়া হয়। মুজাফফর উদ্দিনের সঙ্গে সাক্ষাৎকালে মুজিব একজন অনুগত ও দেশপ্রেমিক পাকিস্তানীর মতো মধুর ব্যবহার করেন, আইউবের তিনি প্রশংসা করেন। তিনি রাওয়ালপিন্ডি যাওয়ার এবং দেশে শান্তি ফিরিয়ে আনার প্রচেষ্টায় আইউবকে সাহায্য করার অঙ্গীকার করেন। প্যারোলে যেতেও তিনি আগ্রহ দেখিয়েছিলেন। কিন্তু এই আয়োজনের গোপনীয়তা ভঙ্গ করা হয় যখন মুজিবের রাজনৈতিক প্রতিপক্ষরা তাঁর প্যারোলে মুক্তির বিষয়টি প্রকাশ করে বিবৃতি দেন। বৃটিশ শাসনকালের উত্তরাধিকার হিসেবে এ ধরনের আয়োজনকে দুর্বলতা ও অসম্মানজনক বলে চিহ্নিত করা হয় এবং মওলভী ফরিদ আহমদের বিবৃতির কথা জানার পর মুজিব প্যারোলে মুক্তি গ্রহণে অস্বীকার করে বসেন; পরিবর্তে তিনি নিঃশর্ত মুক্তির জন্য দাবি জানান।

গোলটেবিল সম্মেলনের প্রস্তুতির পাশাপাশি একই যোগে সামরিক শাসন ঘোষণার প্রশ্নেও পর্যালোচনা চলছিল। এই উদ্দেশ্যে একটি প্রস্তাব নিয়ে প্রতিরক্ষামন্ত্রী অ্যাডমিরাল এ আর খান ঢাকায় এসেছিলেন। সামরিক গোয়েন্দা পরিদফতরের পরিচালক জেনারেল আওয়াল (তখন ব্রিগেডিয়ার) তাঁর সঙ্গে ছিলেন। প্রস্তাবটি ছিল শুধু পূর্ব পাকিস্তানে সামরিক শাসন জারি করার। আমরা একে খুবই বিপজ্জনক এবং অনুচিত পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচনা করি। উভয় প্রদেশেই, পশ্চিম পাকিস্তানে ভুট্টোর এবং পূর্ব পাকিস্তানে মুজিবের নেতৃত্বে মানুষ আইউবের বিরুদ্ধে উঠে দাঁড়িয়েছিল। সুতরাং সেই আইউবের নেতৃত্বে শান্তি-শৃংখলা রক্ষার এবং তার সরকারকে টিকিয়ে রাখার উদ্দেশ্যে সামরিক শাসনের প্রবর্তন নিশ্চিতভাবেই একটি অজনপ্রিয় পদক্ষেপ হবে এবং জনগণ তাকে সরাসরি প্রত্যাখ্যান করতে পারে। আমাদের অভিমত ছিল, শান্তির পরিবর্তে আইউবের দ্বিতীয় সামরিক শাসন দেশের জন্য অনেক বড় বিপর্যয়ের কারণ হতে পারে।

সামরিক শাসন প্রবর্তনের প্রস্তাবটি অগ্রহণযোগ্য হওয়ার পর মুজিবকে মুক্তিদানের নির্দেশ দেয়া হয়। গোল টেবিল সম্মেলনে যাওয়ার আগে মুজিব একটি জনসভায় ভাষণ দেয়ার অনুমতি চাইলেন। তাঁকে সুযোগ দেয়া হলো। তাঁর আহ্বানে বক্তৃতা শোনার জন্য রেসকোর্স ময়দানে প্রায় ছয় লাখ লোকের সমাবেশ হল। জনতার স্তব ও চিৎকার আরো একবার তাঁর মাথা ঘুরিয়ে দিল। তাঁর মনোভাবে পরিবর্তন ঘটে গেলো এবং ভুট্টোর গোলটেবিল সম্মেলন বর্জনের পাশাপাশি মুজিবের উত্থাপিত দাবিকে আইউব অগ্রহণযোগ্য মনে করলেন। গোলটেবিল সম্মেলন ব্যর্থ হলো, বন্ধ হয়ে গেল রাজনৈতিক মীমাংসার সকল দরজা। প্রেসিডেন্ট ও সর্বাধিনায়কের মনোজগতে একই সঙ্গে অশুভ চিন্তা-ভাবনা ঘুরপাক খেতে শুরু করলো। আইউবের অসুস্থতার সময় ইয়াহিয়া ক্ষমতার স্বাদ আস্বাদন করেছিলেন। অঘোষিত নির্বাহী প্রধান হিসেবে তিনি মন্ত্রিপরিষদের সভায় সভাপতিত্ব করেছেন, সিদ্ধান্ত দিয়েছেন এবং নির্দেশ জারি করেছেন। অন্য যে কোনো মানুষের মতো তিনি এসব উপভোগ করেছিলেন। এবার তিনি তাই ক্ষমতা দখল করতে চাইলেন। অসুস্থতার পরিণতিতে আইউব অনেকাংশেই তাঁর দৃঢ়তা ও সিদ্ধান্ত প্রদানের ক্ষমতা হারিয়েছিলেন। তিনি কোমল এবং ভাগ্যের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছিলেন। আইউবের দুর্বলতার সুযোগ নিতে ইয়াহিয়া তাঁর মন স্থির করে ফেলেন। প্রস্তুতিমূলক পদক্ষেপ হিসেবে ১৯৬৮ সালের ডিসেম্বরে সেনাবাহিনীর সকল ঘাঁটিতে প্রেরিত এক সার্কুলারে তিনি জানিয়ে দেন যে, ক্ষমতার সংঘাতে সেনা বাহিনী নিরপেক্ষ থাকবে। আইউবের কর্তৃত্ব খর্ব করার লক্ষ্যে এটা ছিল একটি পরিষ্কার রাজনৈতিক পদক্ষেপ।

ইয়াহিয়া আইউবের স্থলাভিষিক্ত

কোনো না কোনো রাজনৈতিক দলের সমর্থন ছাড়া কোনো সামরিক শাসনই সাফল্যার্জন করতে পারে না। ভুট্টো গোপনে ইয়াহিয়ার সঙ্গে দেখা করেছিলেন। ইয়াহিয়ার সঙ্গে ভুট্টোর সাক্ষাৎকারের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে পিলু মুদীর 'জুলফি মাই ফ্রেন্ড' গ্রন্থে। ভুট্টোর জন্য অপেক্ষারত ইয়াহিয়ার কাছে যাওয়ার উদ্দেশ্যে কিভাবে ভুট্টোর বিমান দিক পরিবর্তন করে রাওয়ালপিন্ডি গিয়েছিল সে ঘটনার বর্ণনা রয়েছে এতে। সমর্থন চাইলে ভুট্টো ইয়াহিয়াকে সমর্থন দেয়ার অঙ্গীকার করেছিলেন। সেই দিনটি থেকে পরবর্তীকালে ভুট্টো ও ইয়াহিয়া পরস্পরের খুব ঘনিষ্ঠ ছিলেন। যদিও প্রকাশ্যে ও আপাতদৃষ্টিতে ভুট্টো ক্ষমতাসীনদের সমালোচনা করতেন, এমন কি কখনো কখনো তীব্রভাবেও, কিন্তু তারপরই ইয়াহিয়ার কাছে গিয়ে তিনি এভাবে ব্যাখ্যা দিতেন যে, রাজনীতিতে একজন নেতাকে জনগণের সমর্থন অর্জন করার জন্য সরকারের সমালোচনা করতে হয়। নিয়তিনির্দিষ্ট পরবর্তী বছরগুলোতে ভুট্টোর রাজনৈতিক বিচক্ষণতা ও নির্দেশনার ওপর ইয়াহিয়া সর্বতোভাবে নির্ভর করেছেন।

প্রেসিডেন্টের সিওএস এবং প্রকৃতপ্রস্তাবে প্রধান মন্ত্রী পদে জেনারেল পীরজাদা থাকায় সরকারের সকল গোপন তথ্যই ভুট্টো জানতে পারতেন এবং পীরজাদার মাধ্যমে ইয়াহিয়ার অনেক সিদ্ধান্তের ব্যাপারেই তিনি প্রভাব খাটাতেন।

১৯৬৯ সালের ১৯ মার্চ রাওয়ালপিন্ডিতে সি-ইন-সি আহূত এক সভায় ঢাকার ১৪ ডিভিশনের জিওসি জেনারেল মুজাফর উদ্দিন যোগ দিয়েছিলেন। এই সভায় সারা দেশে সামরিক আইন জারি করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়, তারিখ নির্ধারিত হয় ২৫ মার্চ। অবনতিশীল আইন-শৃংখলার ব্যাপারে সেনাবাহিনীর উদ্বেগের কথা প্রেসিডেন্টের কাছে পৌছে দেয়া হয় এবং রাজনৈতিক সংকটের আশু সমাধানের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। প্রেসিডেন্ট সশস্ত্র বাহিনীসমূহের বার্তা যথাযথ গুরুত্বসহকারে গ্রহণ করেন। তিনি পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান উভয় প্রদেশের জন্যই নতুন গভর্নরের নিযুক্তি দেন। আর্মি কমান্ডারদের বিক্ষুব্ধ মন সম্পর্কে তাদের অবহিত করে তিনি দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতির উন্নয়ন ঘটানোর মতো সুনির্দিষ্ট ও আশু পদক্ষেপ নেয়ার জন্য তাদের তাগিদ দেন। তিনি অবশ্য জানতেন না যে, আর্মি চিফ ইতিমধ্যেই ক্ষমতা দখল করার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছেন।

পূর্ব পাকিস্তানের নতুন গভর্নর হিসেবে ২৪ মার্চ ঢাকায় জনাব এম. এন. হুদার শপথ নেয়ার কথা ছিল। রাওয়ালপিন্ডি থেকে ফেরার পর ২২ মার্চ জেনারেল মুজাফফর উদ্দিন আমাকে ২৫ মার্চ সামরিক আইন জারির ব্যাপারে জি এইচ কিউ-এর সিদ্ধান্ত জানিয়েছিলেন। যখন শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান চলছিল, আমি তখন এই অভিনয় দেখে আহত হয়েছিলাম। মুজাফফর উদ্দিনের দিকে ঘুরে আমি বলেছিলাম, "স্যার, এ সব কি? আমরা আগামীকাল সামরিক আইন জারি করতে যাচ্ছি। এসব তাহলে কেন?" তিনি বললেন, "তুমি শুধু ঘটনাবলীর সঙ্গে যেতে থাকো।"

আইউবের জন্য তখন সময় পেরিয়ে গিয়েছিল, তিনি যদি আরো আগে মন্ত্রিপরিষদে প্রশাসনিক পরিবর্তন আনতেন এবং দুই গভর্নরকে পরিবর্তন করতেন তাহলে হয়তো তিনি ঘটনা প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করতে পারতেন। মুসা ও মোনেম দু'জনই অজনপ্রিয় ছিলেন। ৬৯ সালের ফেব্রুয়ারির প্রথমদিকে আইউব যখন ঢাকায় সফরে এসেছিলেন তখন জেনারেল মুজাফফর উদ্দিন তাঁকে মোনেম সম্পর্কে বলেছিলেন। কিন্তু তিনি কোনো ব্যবস্থা নেননি। আইউব একজন প্রাচীনপন্থী ও অধীনস্থদের প্রতি অনুগত ব্যক্তি ছিলেন। একজন আর্মি জেনারেলের মধ্যে প্রশংসনীয় গুণ হলেও একজন রাজনৈতিক নেতার জন্য এটা ছিল একটি প্রতিবন্ধকতা পরিবর্তন ঘটানো হয়েছিল, কিন্তু খুব বেশি বিলম্বে। আর ওদিকে ইয়াহিয়া ক্ষমতা নেয়ার জন্য অধৈর্য হয়ে পড়েছিলেন।

২৫ মার্চ সামরিক শাসন জারি হওয়ার পর '৬৯ সালের ১০ এপ্রিল জেনারেল গুল হাসান ঢাকায় এম এল অ্যাডমিনিস্ট্রেটরের অফিস পরিদর্শনে এসেছিলেন। গভর্নর হাউসে তিনি

যখন ইয়াহিয়ার ক্ষমতা দখলের কাহিনী শোনাচ্ছিলেন আমি তখন সেখানে উপস্থিত ছিলাম। তিনি খুব উৎসাহের সঙ্গে বলছিলেন কিভাবে সামরিক শাসনের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ নিতে তিনি ইয়াহিয়াকে চাপ দিয়েছিলেন। আইউব যখন সামরিক শাসন জারি করার প্রস্তাব দিলেন, ইয়াহিয়া তখন বললেন, "হ্যাঁ, সামরিক শাসন হবে, কিন্তু তা থাকবে আর্মির নিয়ন্ত্রণে।" আইউব তৎক্ষণাৎ সাড়া দিলেন, "আপনি কি বলতে চাচ্ছেন তা আমি বুঝতে পারছি। প্রয়োজনীয় পেপারস তৈরি করুন, আমি স্বাক্ষর দেব।" আইউব একজন মর্যাদাবান ব্যক্তি ছিলেন। তিনি ক্ষমতাকে আঁকড়ে থাকতে চাননি। তিনি দেশের স্বার্থে পদত্যাগ করেছিলেন। বিদায় ভাষণে আইউব উল্লেখ করেছেন যে, পশ্চিম পাকিস্তানে এক ইউনিটের বিলুপ্তি এবং ছয় দফা তাঁর কাছে গ্রহণযোগ্য ছিল না। কারণ এগুলো দেশকে দুর্বল করবে। দেশে বিদ্যমান রাজনৈতিক সংকটের নিরসন করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে ইয়াহিয়া ক্ষমতা দখল করলেন।

সামরিক শাসন প্রবর্তিত হওয়ার অব্যবহিত পরই সমগ্র দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সকল আন্দোলনেরই দ্রুত সমাপ্তি ঘটেছিল। আইউবের মতো ইয়াহিয়া রাজনৈতিক দখলগুলো নিষিদ্ধ করেন নি। তিনি ঘোষণা করেন যে, সাংবিধানিক সরকার প্রতিষ্ঠার উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি করা এবং প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটে মুক্ত ও নিরপেক্ষভাবে নির্বাচিত জনগণের প্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করাই তাঁর উদ্দেশ্য।

পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর বিদায় নিয়েছিলেন। ১৪ ডিভিশনের জিওসি মেজর জেনারেল মুজাফফর উদ্দিনকে পূর্বাঞ্চলের এম এল এ বানানো হয় এবং তাকেই গভর্নরের দায়িত্ব পালন করতে দেয়া হয়, যদিও সরকারিভাবে তাঁকে গভর্নর বলা হয়নি। ১৯৬৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে আমার সাধারণ কার্যকালের দু'বছর পূর্ণ হয়েছিল এবং লাহোরে আমার বদলির আদেশও জারি হয়ে গিয়েছিল। তারপরও মার্শাল ল অ্যাডমিনিস্ট্রেটরকে সাহায্য করার উদ্দেশ্যে আমাকে তিন মাসের জন্য থেকে যেতে হয়। গভর্নর পদে ঘন ঘন পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আমার অবস্থানের মেয়াদও বাড়ানো হতে থাকে। আমি মুজাফফর উদ্দিন, আহসান, ইয়াকুব খান, টিক্কা খান ও ডাঃ মালিকের সঙ্গে কাজ করেছি। আমার সকল সন্তান লাহোরে পড়ালেখা করত বলে পরিবারও পশ্চিম পাকিস্তানে থাকত। যেহেতু কার্যমেয়াদ সমাপ্ত করেছিলাম, তাই আমি পশ্চিম পাকিস্তানে ফিরে যেতে চেয়েছিলাম। কিন্তু কোনো গভর্নরই আমাকে ছাড়তে রাজি হননি। এর ফলে আমি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছি, আমার পরিবারও কষ্ট পেয়েছে, কিন্তু সেজন্য আমি কখনো অভিযোগ করিনি। আমার অনেক সিনিয়র ও জুনিয়র অফিসারকে আমি জানি, যাঁরা পূর্ব পাকিস্তানের ব্যাপারে মারাত্মকভাবে ভীত ছিলেন এবং কোনো না কোনো অজুহাত দেখিয়ে তারা পূর্ব পাকিস্তানে না আসার বিষয়টি ব্যবস্থা করেছিলেন। পরবর্তীকালে এই অফিসারদেরই অনেকে ১৯৭১ সালে পূর্ব

পাকিস্তানকে রক্ষার কাজে নিয়োজিত এবং পরিস্থিতির শিকার সৈনিক ও অফিসারদের সমালোচনায় সোচ্চার হয়ে উঠেছিলেন।

অসামরিক প্রশাসনের কার্যক্রম তদারকি করার জন্য আমাকে সিভিল অ্যাফেয়ার্সের ব্রিগেডিয়ার পদে নিযুক্তি দেয়া হয়। আমরা রাজনৈতিক পরিস্থিতির মূল্যায়ন করেছিলাম। পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকে অনেক বড় বড় পরিবর্তন ঘটেছিল। নতুন প্রজন্মের নেতৃবৃন্দ ও মানুষ সামনে চলে এসেছিলেন। তাঁদের ধ্যান-ধারণায় উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটেছে। পূর্ব পাকিস্তানে নিজেদের তীব্র জাতীয় গৌরব এবং কেন্দ্রীভূত রাজনৈতিক কাঠামো থেকে যথেষ্ট পরিমাণে স্বাধীন হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করার পদক্ষেপ হিসেবে ছয় দফা একটি গৃহীত ফর্মুলায় পরিণত হয়েছিল। এর প্রথম দফায় লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে পার্লামেন্টারী ধরনের সরকারের কথা বলা হয়, যেখানে আইন পরিষদের ক্ষমতা হবে সার্বভৌম এবং এই পরিষদ সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে জনগণের সরাসরি ভোটে নির্বাচিত হবে। দ্বিতীয় দফায় দাবি জানিয়ে বলা হয়, কেন্দ্রীয় বা ফেডারেল ক্ষমতা কেবল দুটি বিষয়ে সীমাবদ্ধ থাকবে। দেশরক্ষা ও বৈদেশিক নীতি। বাকি সকল বিষয়ে অঙ্গরাষ্ট্রগুলোর ক্ষমতা থাকবে নিরংকুশ। তৃতীয় দফায় প্রস্তাব করা হয় যে, দুই প্রদেশের জন্য দুটি পৃথক অথচ অবাধে বিনিময়গযোগ্য মুদ্রা চালু থাকবে। পরবর্তীকালে তাঁরা এই শর্তে একই মুদ্রা গ্রহণ করতে সম্মত হয়েছিলেন যে, পূর্ব পাকিস্তান থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে মূলধন পাচার বন্ধ করে সংবিধানে ফলপ্রসূ ব্যবস্থা রাখা হবে। চতুর্থ দফায় কেন্দ্রীয় সরকারের করারোপ করার অধিকার অস্বীকৃত হয়েছিল এতে ফেডারেল সরকারকে তার ব্যয় নির্বাহের জন্য প্রয়োজনীয় রাজস্ব সম্পদ দেয়ার ব্যবস্থা রাখা হয়। এই দফায় অঙ্গরাজ্যগুলোকে বিদেশের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপনের অধিকার দেয়ার প্রস্তাব করা হয়। পঞ্চম দফায় বলা হয়েছিল, দুই প্রদেশের বৈদেশিক মুদ্রার দুটি পৃথক হিসাব থাকবে। আর ষষ্ঠ দফায় পূর্ব পাকিস্তানের জন্য একটি মিলিশিয়া বা আধা-সামরিক বাহিনী গঠনের দাবি জানানো হয়েছিল।

ছয় দফায় স্পষ্টতই বিচ্ছিন্নতার বীজ নিহিত ছিল। এই দফাগুলো হুবহু গ্রহণ করা হলে বাস্তবে দুটি স্বাধীন দেশের সৃষ্টি করা হত। কিন্তু চরিত্রের দিক থেকে এগুলো অবশ্যই রাজনৈতিক দাবি ছিল। এই রাজনৈতিক দাবির প্রশ্নে সরকারও রাজনৈতিকভাবেই সাড়া দিতে পারত। মুজিব ইঙ্গিত দিয়েছিলেন যে, দাবিগুলি আলোচনা সাপেক্ষ, কিন্তু সরকার বিরোধ প্রশমনের পরিবর্তে মুখোমুখি সংঘর্ষের পথে এগিয়েছিল।

আগরতলা মামলা থেকে মুক্তি পাওয়ার দিনটিতে মুজিবের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়েছিল। মুক্তি দেয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়ার পর আইন-শৃংখলাজনিত সমস্যা এড়ানোর জন্য মুজিবকে গোপনে তাঁর বাড়িতে পৌছে দেয়ার প্রয়োজন দেখা দেয়। ঢাকার পরিস্থিতি তখন এত উত্তেজনাপূর্ণ ও বিস্ফোরনোন্মুখ যে, সশস্ত্র প্রহরায় তাঁকে নিয়ে যাওয়া বিপজ্জনক

বিবেচিত হয়। কারণ এর ফলে বিক্ষিপ্ত সংঘর্ষ ও সহিংস ঘটনা ঘটতে পারত। নিরস্ত্র ও প্রহরাহীন অবস্থায় এই দায়িত্ব পালনের জন্য কেউই সম্মত হয়নি। তখন আমি এগিয়ে আসি। যে মেসটিতে তাঁদের আটক রাখা হয়েছিল, সেখান থেকে অন্য দু'জন বন্দীসহ মুজিবকে একটি জিপে চড়িয়ে আমি তাঁর বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে আসি। কথা ছিল আমি তাঁদেরকে মুজিবের বাড়ির সামনে নামিয়ে দিয়ে দ্রুত সেনানিবাসের স্বর্গে ফিরে আসব। কিন্তু তাঁরা নিরাপদে যার যার বাড়িতে পৌঁছানো পর্যন্ত আমি সেখানে থেকে যাই। আমার এই সদিচ্ছা সম্ভবত মুজিবকে আকৃষ্ট করে এবং তিনি আমার প্রতি বন্ধুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠেন। আমাদের এই সম্পর্ক ১৯৭১ সালের মার্চে আবারও তিনি গ্রেফতার হওয়ার আগে পর্যন্ত স্থায়ী ছিল।

আমাদের বিশ্লেষণে একথা বেরিয়ে আসে যে, পূর্ব পাকিস্তানের পরিস্থিতির বিপজ্জনক অবনতি ঘটেছে। এক সময় যারা পাকিস্তানের জন্য সংগ্রাম করেছে, প্রাথমিক পর্যায়ে স্বায়ত্তশাসনের দাবি জানানোর পর সেই তারাই এখন স্বাধীন বাংলাদেশের প্রবক্তাদের দিকে আনুগত্য পরিবর্তন করছে।

আমরা প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার কাছে একটি প্রতিবেদন পেশ করি। এতে আমরা উল্লেখ করি, 'বাংগালী বুদ্ধিজীবী ও শিক্ষিতদের বিরাট সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ এখন বিচ্ছিন্নতার পক্ষে।' আমাদের অভিমতে বলা হয়, সামরিক শাসনের মাধ্যমে রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান করা সম্ভব নয় এবং সে কারণে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব নির্বাচন অনুষ্ঠান করার জন্য আমরা সুপারিশ করেছিলাম। প্রতিবেদনটিকে ভালো চোখে গ্রহণ করা হয়নি। পরবর্তীতে ১৯৬৯ সালের মে মাসে আমি রাওয়ালপিন্ডিতে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের সদর দফতরে গেলে একজন বাংগালী স্টাফ অফিসার কর্নেল কাইউমের সঙ্গে আমার দেখা হয়। তিনি আরেক বাংগালী অফিসার ব্রিগেডিয়ার (পরবর্তীকালে মেজর জেনারেল) ইস্কান্দারুল করিমের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। কর্নেল কাইউম বললেন, "আপনাদের দফতরে কে সেই পাগল লোকটি যিনি বলেন যে, পূর্ব পাকিস্তানে বিচ্ছিন্নতাবাদীরা রয়েছে?" আমি বললাম, "সেই পাগল লোকটি আপনাদের সামনেই দাঁড়িয়ে আছে।" তারপর আমি জানতে চাইলাম, "শেষবার কবে আপনি পূর্ব পাকিস্তানে গিয়েছিলেন?" তিনি আমাকে ৬ বা ৭ বছরের হিসেব দিলেন। কারণ একজন পশ্চিম পাকিস্তানী মেয়ের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়েছিল। আমি তাঁকে নিকট ভবিষ্যতে পূর্ব পাকিস্তানে যাওয়ার এবং স্বয়ং পরিস্থিতি মূল্যায়ন করার জন্য অনুরোধ জানিয়েছিলাম। তাঁর বড় দু'ভাই, কবির চৌধুরী ও মুনীর চৌধুরী ছিলেন পূর্ব পাকিস্তানের শীর্ষস্থানীয় বুদ্ধিজীবী এবং বাংলাদেশের বলিষ্ঠ প্রবক্তা। ঢাকায় সফরকালে তিনি আমার সঙ্গে দেখা করতে আসেন এবং তাঁর প্রশংসা করতে হয়। কারণ আমি তাঁকে যে কথা বলেছিলাম তা তিনি স্বীকার করে নিয়েছিলেন। তিনি বললেন, মানুষের চিন্তায় ঘটে যাওয়া

বিরাট পরিবর্তন তাঁকে বিস্মিত করেছে। তিনি নিজে অবশ্য পাকিস্তানের সমর্থক হিসেবে থেকে যান এবং বাংলাদেশে চলে যাননি। এভাবেই মনের পরিবর্তন ঘটে। এমন কি এ ধরনের প্রশ্নে পরিবারও বিভক্ত হয়ে পড়ে। যা হোক, আমার পরবর্তীকালের অভিজ্ঞতায় আমি জনগণের মনোভাবে অনেক বেশি অপ্রীতিকর পরিবর্তন দেখেছি। উপ-জাতীয়তাবাদ একটি ভয়ংকর ব্যাধি। এটা এইডসের মতোই খারাপ। এটা বিচ্ছিন্নতা প্রতিরোধ করার আবেদন ও আহ্বানকে ধ্বংস করে দেয়।

দেশে রাজনৈতিক, প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে মারাত্মক ক্ষতিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল। সবচেয়ে খারাপ বিষয়টি ছিল এই যে, প্রতিষ্ঠানসমূহকে নিষ্ক্রিয়, দুর্বল কিংবা ধ্বংস করা হয়েছিল। জাতীয় ঐক্য আঞ্চলিকতার জন্য পথ ছেড়ে দিয়েছিল। ইয়াহিয়া গৃহকে সুশৃংখল করার দায়িত্ব নিজের ওপর নিয়েছিলেন। ইয়াহিয়া ছিলেন অত্যন্ত সক্ষম অধিনায়ক এবং একজন তেজস্বী মানুষ। তিনি জানতেন কিভাবে ক্ষমতা অর্পণ করতে হয় এবং কিভাবে নিজ থেকে সিদ্ধান্ত দিতে হয়। সেনাবাহিনীতে তিনি একজন সফল পুরুষ ছিলেন এবং অধিনায়ক হিসেবে তাঁর সামর্থ্যের ব্যাপারে কেউই প্রশ্ন তুলতে পারত না। কিন্তু তিনি রাজনীতিক ছিলেন না। সে কারণে রাজনৈতিক পরামর্শের জন্য তিনি অন্যদের ওপর সর্বতোভাবে নির্ভর করতেন। পশ্চিম পাকিস্তানী রাজনীতিকদের পরামর্শে ইয়াহিয়া এক ইউনিট বাতিল করেছিলেন। আর এক রাজনৈতিক উপদেষ্টা, জনাব জি ডব্লিউ চৌধুরীর পরামর্শে তিনি সংখ্যাসাম্য পরিত্যাগ করে এক লোক এক ভোটের নীতি মেনে নিয়েছিলেন। এ দুটি সিদ্ধান্তেরই সুদূরপ্রসারী ফলাফল ছিল। এক ইউনিটের ভাঙনের ফলে পশ্চিম পাকিস্তানে প্রাদেশিকতা মাথা চাড়া দিয়েছিল। অন্যদিকে এক লোক এক ভোট নীতির পরিণতি ছিল পশ্চিম পাকিস্তানের স্বার্থরক্ষার জন্য জনাব ভুট্টোর আহ্বান এবং তাঁর 'ওখানে তুমি এখান আমি' শ্লোগান, যা শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠা ঘটিয়েছিল।

ইয়াহিয়া ১৯৬২ সালের সংবিধান বাতিল করেছিলেন। তাঁর সামনে তাই দুটি বিকল্প ছিল- ১৯৫৬ সালের সংবিধান পুনর্বহাল করা কিংবা নতুন একটি সংবিধান রচনার উদ্দেশ্যে গণপরিষদ গঠন করা। পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর ভবনে অবস্থানরত আমরা ১৯৫৬ সালের সংবিধানের পক্ষে ছিলাম। এটা ছিল একটি সম্মত ও গৃহীত সংবিধান। এর পুনর্বহাল নতুন বিতর্কের সৃষ্টি করত না। সাংবিধানিক সমস্যার প্রশ্নে যে কোন নতুন উদ্যোগই অনিবার্যভাবে বিতর্কের জন্ম দিয়ে থাকে। অনেক সমস্যা কাটিয়ে এবং স্বাধীনতার ১০ বছর পর ১৯৫৬ সালে একটি সর্বসম্মত সংবিধান চূড়ান্ত করা হয়েছিল। যদিও ১৯৫৬ সালের সংবিধানে প্রদত্ত স্বায়ত্তশাসনের পরিমাণ নিয়ে পূর্ব পাকিস্তানে কিছুটা দ্বিমত ছিল, তথাপি আমাদের বিশ্বাস, সামরিক শাসন প্রবর্তনের অব্যবহিত পরেই ইয়াহিয়া যদি ঐ সংবিধানটি পুনর্বহাল করতেন তাহলে পূর্ব পাকিস্তানের নেতৃবৃন্দ তা মেনে নিতেন। তার চেয়ে বড় কথা, এটা

করা হলে ১৯৬৯ সালেই নতুন নির্বাচন করা যেত, যার ফলে বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তিগুলো পরবর্তীকালের বিভিন্ন ঘটনার সুযোগ নেয়ার অবকাশ পেত না।

যা হোক, গভর্নর আহসানের সুপারিশ উপেক্ষা করে ইয়াহিয়া খসড়া কমিটির সুপারিশ গ্রহণ করেন এবং ১৯৬৯ সালের ২৮ নভেম্বর ক্ষমতা হস্তান্তরের পরিকল্পনা প্রকাশ করেন। এক লোক এক ভোট ভিত্তিতে ১৯৭০ সালের অক্টোবরে জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদসমূহের নির্বাচনের তারিখ নির্ধারিত হয়। নিজ নিজ দলকে সংগঠিত করার এবং জনমতকে পক্ষে টেনে আনার জন্য রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে পুরো একটি বছরের সময় দেয়া হয়। এই সময়টুকু নবগঠিত রাজনৈতিক দল পিপিপি-র জন্য ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সংগঠন করার এবং বক্তব্য প্রচারণার জন্য এই দলটির সময়ের প্রয়োজন ছিল। এর নেতা ইয়াহিয়ার ঘনিষ্ঠ জন ছিলেন ও সেজন্য পশ্চিম পাকিস্তানে সময় আদায় করে নিতে সমর্থ হয়েছিলেন।

কিন্তু এক বছরব্যাপী নির্বাচনী তৎপরতা পাকিস্তানের আদর্শ ও ধারণার ওপর ধ্বংসাত্মক প্রভাব ফেলেছিল। যদিও ১৯৭০ সালের মার্চে ইয়াহিয়া ঘোষিত আইনগত কাঠামো আদেশে ছয় দফা দাবিকে স্বীকার করে নেয়া হয়নি, কিন্তু এর অধীনে প্রদত্ত রাজনৈতিক তৎপরতা চালানোর স্বাধীনতার পরিপূর্ণ সুযোগ নিয়েছিলেন আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিব। আওয়ামী লীগের লক্ষ্য ছিল পূর্ব পাকিস্তানে সর্বাধিক আসনে জয় লাভের মাধ্যমে জাতীয় পরিষদে কর্তৃত্ব করার মতো সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করা। এক লোক এক ভোট নীতিতে পূর্ব পাকিস্তানকে পরিষদের বেশির ভাগ আসন দেয়ার ফলে অমন একটি কৌশলের সফলতার সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছিল। আওয়ামী লীগের প্রচারণার প্রধান ও মূল সুরটিতে ছিল তাদের নিজেদের ছয় দফা এবং ছাত্রদের ১১ দফার ভিত্তিতে সংবিধান রচনা করার অঙ্গীকার। উন্নয়নশীল দেশগুলোতে কোন ব্যক্তি যদি কেউ বাংগালীদের দাবির মতো কোনো সংকীর্ণ দাবি ও উদ্দেশ্যকে এগিয়ে নিতে পারে, তাহলে অশিক্ষিত জনগণের মধ্যে সে নিশ্চিতভাবেই জনপ্রিয় হয়ে উঠবে এবং অর্জন করবে নির্বাচনী বিজয়। দিনের পর দিন সমগ্র বছরব্যাপী আওয়ামী লীগও বাংগালীদের অভাব-অভিযোগের বৃত্তান্ত তুলে ধরেছে যার আংশিক সত্য ও আংশিক বানোয়াট ছিল এবং পাঞ্জাবী 'শোষকদের' বিরুদ্ধে তাদের ভাবাবেগকে উত্তেজিত করেছে। মুজিব ছিলেন অসাধারণ বক্তা। তিনি বুদ্ধিজীবী ছিলেন না, এমন কি খুব বুদ্ধিমানও ছিলেন না। তিনি ছিলেন এমন একজন বক্তৃতাবাগীশ নেতা, যিনি জনগণের ভাবাবেগ নিয়ে খেলতেন। তিনি তাঁর নিজের ও দলের পক্ষে সুদৃঢ় সমর্থন অর্জন করতে সমর্থ হয়েছিলেন। অন্য দলগুলো ছিল জামায়াতে ইসলামী, জমিয়তুল উলামায়ে পাকিস্তান, জমিয়তুল উলামায়ে ইসলাম, পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক পার্টি, মুসলিম লীগের তিনটি অংশ-কাউন্সিল, কাইউম ও কনভেনশন এবং দুটি অংশসহ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি-মস্কোপন্থী ও পিকিংপন্থী।

নির্বাচনী প্রচারণার প্রাথমিক পর্যায়েই এটা পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল যে, 'জাতীয়' ইসলাম-পছন্দ দলগুলোর সামান্যই জনসমর্থন ছিল। সমর্থনের ধারা ছিল আঞ্চলিকতামুখী ও বামপন্থী। বামপন্থী দলগুলো সাংবিধানিক পন্থায় পুরোপুরি বিশ্বাস করত না। তারা মনে করত কেবল সংঘাত ও সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমেই বাংগালীর অধিকার আদায় করা সম্ভব। রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় অংশ গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেয়ায় আওয়ামী লীগ বামপন্থী দলগুলোর চাইতে সুবিধাজনক অবস্থান অর্জন করেছিল। ওদিকে অন্য কেউ নন, বামপন্থীদের স্বাধীনতার দাবিটি উচ্চারণ করেছিলেন মওলানা ভাসানী, যিনি ছিলেন পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতা সংগ্রামীদের একজন। তাঁর হৃদয়ের এই পরিবর্তনের ব্যাপারে আমরা মওলানা ভাসানীকে প্রশ্ন করেছিলাম। তিনি বলেছেন, "মুজিব ছয় দফার জন্য দাবি জানাচ্ছে। তার চেয়ে সুবিধাজনক অবস্থানে যাওয়ার জন্য আমাকে বেশি কিছু চাইতে হবে।" এভাবেই একদল রাজনীতিক নির্বাচনে জয় লাভের উদ্দেশ্যে একজন অন্যজনকে অতিক্রম করে যান এবং জয় লাভ করে থাকেন।

ছয় দফার প্রচারণার ব্যাপারে কি মনোভাব নিতে হবে সে প্রসঙ্গে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের সদর দফতরের কাছ থেকে আমরা একটি স্পষ্ট নির্দেশনা পাওয়ার চেষ্টা করেছিলাম। আমাদের মতে ছয় দফা ছিল আইনগত কাঠামো আদেশ (এল এফ ও) -এর অস্বীকৃতি। এল এফ ও ভবিষ্যত সংবিধানের নির্ধারক বৈশিষ্ট্যসমূহ সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছিল। এতে পাকিস্তানের জন্য একটি গণতান্ত্রিক ও ফেডারেল সরকারের কথা বলা হয়েছিল। প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের প্রশ্নে এল এফ ও-তে বলা হয়, প্রদেশগুলোকে আইন প্রণয়ন এবং প্রশাসনিক ও আর্থিক ব্যাপারে সর্বাধিক ক্ষমতা দেয়া হবে। পাশাপাশি বৈদেশিক সম্পর্ক এবং দেশের স্বাধীনতা ও আঞ্চলিক অখণ্ডতা রক্ষার দায়িত্ব পালনের জন্য আইন প্রণয়ন, প্রশাসনিক ও আর্থিক ব্যাপারে ফেডারেল সরকারের হাতেও পর্যাপ্ত ক্ষমতা থাকবে। এই স্পষ্ট ব্যাখ্যা থাকার পরও আওয়ামী লীগ কর্তৃক এল এফ ও উপেক্ষিত হচ্ছিল। আমার এক সফরকালে সামরিক শাসন সংক্রান্ত বিষয়ের তৎকালীন ব্রিগেডিয়ার রহিমের কাছে আমি জানতে চেয়েছিলাম, আমরা ছয় দফার প্রচারণা চালাতে দেব কি না। সি এম এল এ সদর দফতরে উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সঙ্গে আলোচনার পর তাঁর উত্তর ছিল, "আমরা সিন্ধু দেশ-এর প্রচারণা চালাতে দিয়েছি, ছয় দফাকেও কেন দেব না?" পূর্ব পাকিস্তানের সামরিক শাসন কর্তৃপক্ষও ছয় দফার প্রচারণা বন্ধ করার কোনো পদক্ষেপ নেয়নি। আওয়ামী লীগের উদ্দেশ্য অর্জনের তৎপরতা তাই অবাধে এগিয়ে গিয়েছিল।

১৯৭০-এর নির্বাচন

১৯৭০ সালের ৩১ ডিসেম্বরের সমাপ্তি এবং ১৯৭১ সালের ১ জানুয়ারির সূচনালগ্নে আকস্মিক প্রচণ্ডতা নিয়ে নির্বাচনী প্রচারাভিযান শুরু হয়েছিল। পরবর্তী সন্ধ্যায় আওয়ামী লীগ এক মশাল মিছিল বের করে। এতে বাতাস কাঁপিয়ে বাংলাদেশ শ্লোগান দেয়া হয়, নিন্দা করা হয় পশ্চিম পাকিস্তানী সাম্রাজ্যবাদের। মিছিলের সাধারণ মনোভাব ছিল পশ্চিমের প্রদেশবিরোধী প্রতিরোধের, এমন কি সহিংসতারও। পরবর্তীকালে অন্য দলগুলোও প্রদেশব্যাপী মিছিল ও সভার আয়োজন করেছে, কিন্তু জনসমর্থনের দিক দিয়ে প্রথম থেকেই আওয়ামী লীগ ছিল অন্য সকলের চাইতে অনেক বেশি অগ্রণী অবস্থানে। নেতা ও কর্মীদের সকলেই ছিলেন উদ্বুদ্ধ, ভাবাবেগে বাংগালী জাতীয়তাবাদের অনুরক্ত, দলের ছিল অনেক ভালো সাংগঠনিক কাঠামো এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হল, আওয়ামী লীগ নির্ভরযোগ্য আর্থিক পৃষ্ঠপোষকতা পেয়েছিল। আওয়ামী লীগের অর্থ সম্পদ সীমাহীন বলে মনে হয়েছে। জনগণের কাছে নেতৃবৃন্দকে এবং দলকে তুলে ধরার ক্ষেত্রে এই অর্থ সম্পদ সাহায্য করেছিল। একটি উদাহরণ দেয়া যাক। আওয়ামী লীগের নির্বাচনী প্রতীক ছিল নৌকা। সকল শহরের মোড়ে মোড়ে এবং দেশের সর্বত্র কাঠের তৈরি শত শত নৌকা ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। কেবল এজন্যই দলটির খরচ হয়েছে অন্তত এক কোটি টাকা। আওয়ামী লীগ এই অর্থ কোথা থেকে পেয়েছিল? আওয়ামী লীগের সদস্যরা ধনী ছিল না, জনগণও তাদের প্রচুর অর্থ দেয়ার মতো অবস্থায় ছিল না। পূর্ব পাকিস্তানে আওয়ামী লীগের প্রতি গভীরভাবে নিবেদিত কোনো বড় শিল্পপতিও ছিলেন না। গুজবে শোনা গেছে যে, ভারত আওয়ামী লীগকে তার প্রয়োজনীয় সমুদয় অর্থের যোগান দিয়েছিল। আমার মতে তখনো একথা আমি বলেছি যে, ভারতীয়দের দৃষ্টিকোণ থেকে তারা দৃঢ় ভিত্তির ওপরই বিনিয়োগ করেছিল। আমরা সে সময় একটি ব্যালটের যুদ্ধের মুখোমুখি হচ্ছিলাম, বুলেটের যুদ্ধের নয়। ব্যালটের যুদ্ধে অর্থ নির্ধারকের ভূমিকা পালন করে, এমন কি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো দেশেও কোনো

প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থীর অর্থের ঘাটতি থাকলে তিনি সাফল্যার্জন করতে পারেন না। প্রেসিডেন্ট পদের জন্য নিক্সন ও হামফ্রের প্রথমবারের ব্যর্থ প্রচেষ্টা এর দৃষ্টান্ত। পাকিস্তানপন্থী দলগুলো প্রেসিডেন্টের কাছে সাহায্যের আবেদন জানিয়েছিল। তাদের যুক্তি ছিল ১৯৭০ সালের নির্বাচন পাকিস্তানের ভাগ্য নির্ধারণ করবে। পাকিস্তান অখণ্ড রাষ্ট্র হিসেবে টিকে থাকবে না বাংলাদেশের সৃষ্টি হবে, তা নির্ভর করছে নির্বাচনের ফলাফলের ওপর। আমি তাদের অভিমত পুরোপুরি সমর্থন করে আর্থিক সাহায্য দেয়ার আবেদন জানিয়েছিলাম। আমি দুটি পরামর্শ দিয়েছিলাম। একটি ছিল মুসলিম লীগের তহবিল সম্পর্কে। কনভেনশন, কাউন্সিল ও কাইউম-এই তিন মুসলিম লীগের বিরোধের কারণে সামরিক শাসন কর্তৃপক্ষ দলটির তহবিল বাজেয়াপ্ত করেছিল। মুসলিম লীগ তিনটি এই তহবিলের আইনসঙ্গত স্বত্বাধিকারী ছিল। শুধু নিজেদের জন্য নয়, পাকিস্তানের সংহতি রক্ষার জন্য তাদের এই অর্থের প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল। আমি খান আবদুল কাইউম খান ও ফজলুল কাদের চৌধুরীর সঙ্গে দেখা করে তাদেরকে তহবিল ভাগাভাগি করতে রাজি করাই। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া অবশ্য বাজেয়াপ্তকৃত তহবিল ফেরৎ দিতে সম্মত হননি।

দ্বিতীয় প্রস্তাবে আমি বলেছিলাম, যেহেতু পাকিস্তানের অস্তিত্বের প্রশ্ন জড়িত রয়েছে, তাই নির্বাচনকে পাকিস্তানের প্রতিরক্ষার অংশ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল জনগণের ভোটে, সেই জনগণের ভোটেই এর ভাঙনও ঘটতে পারে। পাকিস্তানের আঞ্চলিক অখণ্ডতা রক্ষার দায়িত্ব যাদের ওপর ন্যস্ত রয়েছে, তাদের উচিত পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে দেশের সংহতির প্রতি হুমকি সৃষ্টিকারী সকল অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক শক্তির বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে প্রতিরক্ষা নিশ্চিত করা। গণতান্ত্রিক নির্বাচনের স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় সরকার অবশ্যই নিরপেক্ষ থাকবে। কিন্তু ১৯৭০-এর নির্বাচন কোনো স্বাভাবিক বিষয় থাকছে না। এতে একটি প্রধান রাজনৈতিক দল দেশের ভাঙন ঘটানোর উদ্দেশ্যে জনগণের রায় চাচ্ছে। পাকিস্তানকে রক্ষা করতে হলে এই দলটির ক্ষমতায় আসার সম্ভাবনাকে নস্যাৎ করতে হবে। এই উদ্দেশ্যে আমি প্রস্তাব করি, দ্বিতীয় স্তরের বাহিনীর জন্য প্রাপ্ত তহবিলের অর্থ থেকে পাকিস্তানপন্থী দলগুলোকে সাহায্য দেয়া হোক। কিন্তু আমার পরামর্শটি গৃহীত হয়নি। মুজিব এ কথা ইয়াহিয়াকে বোঝাতে সক্ষম হয়েছিলেন যে, ছয় দফার প্রচারণার উদ্দেশ্য ছিল নির্বাচনে জয় লাভ করা। তিনি পাকিস্তানবিরোধী নন এবং নির্বাচনের পর তিনি তাঁর মনোভাব পরিবর্তন করবেন। আমার মনে হয়, নির্বাচনের আগে মুজিবের প্রতি ইয়াহিয়ার এমনিতর বন্ধুত্বপূর্ণ মনোভাবের কারণ ছিল এই যে, ইয়াহিয়াকে পাকিস্তানের ভবিষ্যত প্রেসিডেন্ট হিসেবে গ্রহণ করতে মুজিব অঙ্গীকার করেছিলেন। ক্ষমতাসীনরা অবশ্য ইসলামপছন্দ দলগুলোকে কতিপয় শিল্পপতির মাধ্যমে সাহায্য করেছিলেন, যারা বাধ্য হয়ে অনিচ্ছার সঙ্গে রাজনৈতিক দলগুলোকে অর্থ দিয়েছিলেন। আমি

যতদূর জানি, সব রাজনৈতিক দলই লাভবান হয়েছিল, কিন্তু যেহেতু অর্থের পরিমাণ কম এবং দলের সংখ্যা অত্যধিক ছিল তাই প্রচেষ্টাটি ফলপ্রসূ হতে পারেনি।

নির্বাচনে অর্থ একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। যদিও কোনো রাজনৈতিক দলেরই হাত নিষ্কলংক নয়, তথাপি শোষক ও বিদেশী সরকারের কাছ থেকে অর্থ লাভের অভিযোগে একদল অন্য দলের বিরুদ্ধে সমালোচনা করে থাকে। ভারতে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ও কংগ্রেসের অব্যাহত শাসনের প্রধান কারণ হল, সে দেশে শীর্ষস্থানীয় শিল্পপতি ও কংগ্রেস পার্টির মধ্যে সুসমন্বিত সহযোগিতা রয়েছে। অন্যদিকে পাকিস্তানের শীর্ষস্থানীয় ধনিক শ্রেণী এসেছেন কৃষিজীবীদের মধ্যে থেকে, যারা নিজেরাই নির্বাচনে অংশ নিতে চান। অথচ ভারতের শিল্পপতিরা তাদের অর্থ সাহায্যে পরিষদে প্রতিনিধি পাঠানোকেই নিরাপদ মনে করেন।

নির্বাচনী প্রচারাভিযান পূর্ণ বেগে চলতে থাকল। মুজিব এবং অন্য নেতৃবৃন্দ সড়ক ও রেলপথে, নৌকাযোগে এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে ঘুরে বেড়াতে থাকলেন। আওয়ামী লীগের মূল সুরটি ছিল ছয় দফা দাবি আদায় করা, এই উদ্দেশ্যে দলটি বাংগালী জাতীয়তাবাদকে উস্কে দিয়েছিল। পশ্চিম পাকিস্তানের কথিত শোষণ ও অবিচার, চাকরিতে বৈষম্য, মূলধন পাচার, অবজ্ঞা-বঞ্চনা ছিল তাদের পক্ষ থেকে জনগণের ভাবাবেগকে উত্তেজিত করার কয়েকটি বিষয়। প্রচারণার মূল সুরটি মর্মস্পর্শী হওয়ায় তার লভ্যাংশ আওয়ামী লীগ পেয়েছিল।

অব্যাহত এই প্রচারণা ক্রমান্বয়ে সরকারি কর্মচারিদের ওপর প্রভাব ফেলতে শুরু করেছিল। এটা উপ-জাতীয়তাবাদের একটা বৈশিষ্ট্য। এটা একবার ছড়িয়ে পড়লে- সাধারণত তা ছড়িয়ে থাকেই- সরকারি কর্মচারি ও সংস্থাসমূহের আনুগত্য, দক্ষতা ও বিশ্বস্ততা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকে। সরকার তার নির্বাহীদের সমর্থন হারায়, যার ফলে তার পরিচালনা করার এবং আইন-শৃংখলা রক্ষার সামর্থ্যের ওপর প্রতিকূল প্রভাব পড়ে। সরকারের সিনিয়র সচিবসহ সরকারি কর্মচারিদের বেশির ভাগই আওয়ামী লীগের চিন্তাধারার সমর্থকে পরিণত হয়েছিল। সরকারের চাইতে মুজিবের প্রতিই তাদের আনুগত্য বেশি ঝুঁকতে থাকে।

খুবই তাৎপর্যপূর্ণ ও অশান্তিকর একটি ব্যাপারও লক্ষণীয় হয়ে উঠেছিল-যা এই ইঙ্গিতই দিচ্ছিল যে, এমন কি পূর্ব পাকিস্তানের সশস্ত্র বাহিনী সদস্যদের আনুগত্যও অনেক কমে গেছে। চাকরিরত ও অবসরপ্রাপ্ত সামরিক অফিসারদের ঘন ঘন সভা অনুষ্ঠিত হত কর্নেল এম এ জি ওসমানীর সভাপতিত্বে। এর উদ্দেশ্য ছিল আওয়ামী লীগের জন্য এমন একটি গোপন বাহিনী সংগঠিত করা যা সাংবিধানিক প্রক্রিয়া ব্যর্থ হলে এগিয়ে আসবে। এক লোক এক ভোট নীতি প্রবর্তনের ফলে আওয়ামী লীগের জন্য ক্ষমতায় যাওয়ার দরজা উন্মুক্ত

হয়েছিল এবং ক্ষমতায় গিয়ে অতীতে সংঘটিত 'অন্যায়' ও 'অবিচার'-এর প্রতিশোধ নেয়ার উদ্দেশ্যেই আওয়ামী লীগ আসন্ন নির্বাচনে অংশ গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। অবশ্য দলের মধ্যে তাজউদ্দিনের নেতৃত্বাধীন একটি গ্রুপ ছিল, যারা মনে করতেন যে, পশ্চিম পাকিস্তান শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতার হস্তান্তর করবে না। সে কারণে নির্বাচনী প্রচারাভিযানের পাশাপাশি সম্ভাব্য পরিস্থিতিতে সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে 'কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যার্জনের উদ্দেশ্যে সংগঠন এবং প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

সকল বিরুদ্ধবাদীকে নিষ্ক্রিয় ও ধ্বংস করার জন্য আওয়ামী লীগ খুবই কঠোর পন্থা নিয়েছিল। এক্ষেত্রে ছাড় দেয়া হয়েছিল কেবল বামপন্থী দলগুলোকে। উন্নয়নশীল দেশগুলোতে এটাও একটি সাধারণ ঘটনা যে, বিশৃংখলা ও গোলযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে চূড়ান্ত ভাঙন ঘটানোর উদ্দেশ্যে বামপন্থী দলগুলো উপ-জাতীয়তাবাদকে সমর্থন দিয়ে থাকে। ১৯৭০ সালের জুলাই মাসে মওলানা মওদুদী পূর্ব পাকিস্তান সফরে আসেন। তাঁর জন্য পল্টন ময়দানে বিরাট সমাবেশ অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা করা হয়। পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক প্রাঙ্গণ হিসেবে পল্টন ময়দান প্রসিদ্ধ ছিল এবং বলা হত যে, পল্টন ময়দান যার দখলে থাকবে পূর্ব পাকিস্তানও থাকবে তারই দখলে। জামায়াতে ইসলামী তার কার্যকর ও সক্রিয় সংগঠনের জন্য সুপরিচিত ছিল। দলটিতে নিজস্ব নিবেদিতপ্রাণ ছাত্র ও কর্মী ছিল। আমি ব্যক্তিগতভাবে তাদেরকে আওয়ামী লীগের দুষ্কৃতকারীদের ব্যাপারে সতর্ক থাকতে বলেছিলাম। তারা একটি প্রতিরক্ষা গ্রুপ গঠন করে, প্রচুর লাঠিসহ প্রস্তুতিও নিয়েছিল তারা। কিন্তু আওয়ামী লীগ অনেক ভালো পরিকল্পনাকারী ও বাস্তবায়নকারী হিসেবে নিজেদের প্রমাণ দিয়েছিল। তারা কেবল জনসভাকেই সম্পূর্ণরূপে ভেঙে দেয়নি, সেই সাথে অংশ গ্রহণকারীদেরকেও নির্দয়ভাবে পিটিয়েছিল। জামায়াত এত মারাত্মকভাবে উৎপাটিত হয়েছিল যে, এই ঘটনার পর আওয়ামী লীগ আর কোনো বিরোধিতারই সম্মুখীন হয়নি। ঐ দিনটিতেই আমাকে পশ্চিম পাকিস্তানে তলব করে নেয়া হয়। আমার সব সময় ধারণা হত যে, আমাকে অনুপস্থিত রাখার পরিকল্পনা আগেই করা হয়েছিল। সামরিক শাসনের ব্রিগেডিয়ার মাজেদ উল হক জামায়াতে ইসলামীকে পুলিশ দিয়ে সামান্যও সাহায্য করেন নি।

জুলাই মাসে পূর্ব পাকিস্তানে বন্যা আঘাত হানে। এই বন্যা আওয়ামী লীগের গোলযোগকামীদের জন্য নতুন মূল সুরের যোগান দিয়েছিল। বন্যাজনিত দুর্দশাকে পুঁজি বানিয়ে তারা পরিস্থিতির সুযোগ নেয়। কেউ কেউ বলতে গিয়ে এত দূর পর্যন্তও চলে যায় যে, বন্যা পাকিস্তান সরকারের সৃষ্ট। কারণ সরকার বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য ক্রুগ মিশনের সুপারিশমালা বাস্তবায়ন করতে ব্যর্থ হয়েছে। ক্রুগ মিশনের প্রতিবেদন বা তার সুপারিশগুলো পড়ার প্রয়োজনও কেউ মনে করেনি। অথচ এই প্রতিবেদন ও সুপারিশমালা ছিল বিতর্কিত এবং তার বাস্তবায়ন সমগ্র গ্রামাঞ্চলের জন্য ক্ষতিকর হত।

প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া আগস্ট মাসে পূর্ব পাকিস্তানে আসেন এবং বন্যাদুর্গত সকল এলাকা পরিদর্শন করেন। সাধারণ মানুষ তাঁকে বিপুল উদ্দীপনা নিয়ে অভিনন্দিত করে এবং 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ' ও 'আইউব জিন্দাবাদ' শ্লোগান দেয়। তারা তখনো জানতই না যে, আইউব আর প্রেসিডেন্ট পদে নেই এবং যিনি তাদের দেখতে এসেছেন তিনি ইয়াহিয়া। এর মধ্য দিয়ে আইউবের জনপ্রিয়তার এবং পাকিস্তানের প্রতি সাধারণ মানুষের আনুগত্যেরও প্রকাশ ঘটেছিল। পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ শেষ পর্যন্তও অনুগত পাকিস্তানী ছিল। নেতারা তাদের বিভ্রান্ত এবং তাদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিলেন। আর পশ্চিম পাকিস্তানের নেতারা তাদের পাকিস্তানের বাইরে ছুঁড়ে দিয়েছিলেন।

প্রেসিডেন্ট বন্যার কারণে নির্বাচন স্থগিত করার সম্ভাব্যতা নিয়ে আলোচনা করেছেন। আওয়ামী লীগ ছাড়া সকল দলই নির্বাচন স্থগিত করার দাবি জানাচ্ছিল। প্রকাশ্যে মুজিব সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করতেন, কিন্তু ইয়াহিয়ার মুখোমুখী এলে নীরবে তার সিদ্ধান্ত মেনে নিতেন। নির্বাচন স্থগিত হয়ে গেল। বিরাট সংখ্যক রাজনৈতিক নেতার মধ্যেই মনোভাবের এমনিতর দ্বিমুখীনতা স্বাভাবিক ছিল। এমন কি ইয়াহিয়ার সঙ্গে একান্তে সাক্ষাৎকালে মওলানা ভাসানীও খুব সহযোগিতামূলক ধারায় ব্যবহার করতেন। এ ধরনের একটি বৈঠকে আমি উপস্থিত ছিলাম, যেখানে মওলানা ভাসানী ইয়াহিয়াকে বলেছিলেন, "আপনি চেয়ার দখলে রাখতে থাকুন। আমরা আন্দোলনকারী, আন্দোলন চালিয়ে যাব, আপনি যেখানে আছেন সেখানেই বসে থাকুন।"

প্রদেশের ছাত্র ও বুদ্ধিজীবীদের উদ্যোগে সে সময় পূর্ব পাকিস্তানে পরিষ্কারভাবে চোখে পড়ার মতো বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন চলছিল। কোনো ধারণার জন্ম ও বিকাশ ঘটলে এবং তার প্রচারণা চালানো হলেই একটি আন্দোলন সংঘটিত হয়। বাহুবল দিয়ে এ ধরনের আন্দোলনের বিরোধিতা করা যায় না, করতে হয় পাল্টা ধারণার মাধ্যমে। ধারণার শক্তির পাশাপাশি তার উপস্থাপনা ও প্রচারণা দিয়ে এই যুদ্ধ জয় করতে হয়। পূর্ব পাকিস্তানে বসে যে কেউ তখন সুস্পষ্টভাবে দেখতে পাচ্ছিলেন যে, আওয়ামী লীগ যদি বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায় তাহলে মারাত্মক সমস্যার সৃষ্টি হবে। আওয়ামী লীগের বিজয় শেষ পর্যন্ত স্বাধীনতাকামী চরমপন্থীদের শক্তি বৃদ্ধি করবে। পশ্চিম পাকিস্তানবিরোধী ভাবাবেগজাত উত্তেজনা বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও প্রদেশে পাকিস্তানপন্থী কিছু দলও ছিল। এই দলগুলোকে যদি একটি ঐক্যবদ্ধ মঞ্চে আনা যায় এবং তারা যদি যৌথ প্রার্থী দাঁড় করায়, তাহলে আওয়ামী লীগের সংখ্যাগরিষ্ঠতা হ্রাস পাবে এবং ফলে পাকিস্তানের সংহতির ব্যাপারে আরো বেশি যুক্তিসঙ্গত মনোভাব গ্রহণ করতে আওয়ামী লীগকে প্রভাবিত করা যাবে। এই চিন্তা থেকে এবং আওয়ামী লীগের সংখ্যাগরিষ্ঠতা কমিয়ে আনার একমাত্র উদ্দেশ্যে আমি ইসলাম-পছন্দ দলগুলোকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য জনাব নূরুল আমীন ও খাজা খায়েরুদ্দিনের

প্রচেষ্টাকে সমর্থন দিয়েছিলাম। এ ঐক্য প্রচেষ্টার উদ্দেশ্য ছিল দুটিঃ এক. ইসলাম-পছন্দ দলগুলোর মধ্যে ঐক্য ও সমঝোতা গড়ে তোলা এবং দুই. আসন্ন নির্বাচনে ধর্মনিরপেক্ষ ও সমাজতন্ত্রী শক্তিসমূহের কবল থেকে পাকিস্তানের আদর্শ ও সংহতিকে রক্ষা করা। আমরা কিছুটা সফলও হয়েছিলাম, কিন্তু ৮০টি আসনে মনোনয়ন ঠিক করার পর এই প্রক্রিয়াটি বাধাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। আমি তীব্র পিঠের ব্যথায় আক্রান্ত হই এবং প্রতিদিন আমাকে ১০-২০টি বেদনানাশক ট্যাবলেট খেতে হচ্ছিল। প্রেসিডেন্ট আমার ওপর সদয় হন এবং ১৯৭০ সালের ১ অক্টোবর আমাকে অস্ত্রোপচারের জন্য লন্ডন যাওয়ার নির্দেশ দেন। আমি যখন নির্বাচনে আমার উপস্থিতির প্রয়োজনীয়তার কথা তুলে এর প্রতিবাদ করি, প্রেসিডেন্ট তখন বললেন, "নির্বাচন গোল্লায় যাক। তুমি আজই চলে যাও।" সুতরাং আমি লন্ডন যাই এবং অস্ত্রোপচারও সফলভাবে সম্পন্ন হয়। আমি তিন সপ্তাহ দেশের বাইরে কাটাই, এদিকে এরই মধ্যে ইসলাম–পছন্দ দলগুলোর আলোচনা ভেঙে যায়। আমরা পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের পাকিস্তানপন্থী ভাবাবেগ প্রদর্শন করার সম্ভাবনাকে সদ্ব্যবহার করতে পারিনি। কিন্তু ঢাকায় 'মিষ্টি ও বিস্কুট বিতরণে'র অভিযোগে পিপিপি আমাকে অব্যাহতভাবে দোষারোপ করতে থাকে। আমি রাজনৈতিক পন্থায় পাকিস্তানকে রক্ষা করার প্রচেষ্টা নেয়ার কারণে দোষ স্বীকার করে নিয়েছিলাম।

নির্বাচনের পর শেখ মুজিবের সঙ্গে আমি যখন সাক্ষাৎ করি, তখন তিনি আমার আওয়ামীলীগ বিরোধী দৃষ্টিভঙ্গীর জন্যে আমাকে অভিযুক্ত করেন। বললাম, তাকে সাহায্য করার জন্যই আমি চেষ্টা করছিলাম। কারণ বিরাট সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়ে গেলে তিনি চরমপন্থীদের ক্রীড়নকে পরিণত হবেন। যদিও সে সময় তিনি বলেছিলেন যে, এরকমটি হবে না, কিন্তু পরবর্তী ঘটনাবলী আমার কথাকেই সত্য প্রমাণিত করেছিল। অন্য নেতাদের মতো তিনিও দাবি করেছিলেন যে, জনগণের ওপর তার এমন ক্ষমতা রয়েছে তিনি যা বলবেন জনগণ তাই করবে- তারা বসতে বললে বসবে, উঠতে বললে উঠে দাঁড়াবে। কিন্তু পরবর্তীকালে প্রেসিডেন্টকে ব্যক্তিগতভাবে দেয়া তার ছয় দফা সংক্রান্ত সকল প্রতিশ্রুতির বিরুদ্ধে তাকে যেতে হয়েছিল। প্রেসিডেন্টকে তিনি বলেছিলেন যে, ছয় দফা আলোচনাসাপেক্ষ, কিন্তু ছয় দফার ব্যাপারে নিজেকে এবং সকল এম এন একে উৎসর্গীত করে তাঁকে শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান করতে হয়েছিল। তাঁর যদি কিছুটা কম সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকত তাহলে তিনি আরো আপোসকামী মনোভাব নেয়ার মত নমনীয় পন্থা বেছে নেয়ার সুযোগ পেতেন।

১৯৭০ সালের ১২-১৩ নভেম্বর রাতে পূর্ব পাকিস্তানের দক্ষিণ অঞ্চলে এক নজিরবিহীন জলোচ্ছ্বাস আঘাত হানলে আমাদের সমস্যা আরো জটিল হয়ে পড়ে। পূর্ব পাকিস্তানের উপকূলীয় পাঁচটি জেলার সর্বত্রই এই ঝড় ও জলোচ্ছ্বাস মানুষ, পশু ও সম্পদের ব্যাপক

ধ্বংস ঘটায়। সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল ভোলার দ্বীপাঞ্চল (বরিশাল জেলা), হাতিয়া (নোয়াখালী জেলা), সন্দ্বীপ (চট্টগ্রাম জেলা) এবং পটুয়াখালী জেলার প্রায় সম্পূর্ণ। এই দুর্যোগের ফলে ক্ষয়ক্ষতি ছিল সকল ধারণার বাইরে। বহুদিন পর্যন্ত মৃতের সঠিক সংখ্যা জানা যায়নি। সরকারি হিসেবে অবশ্য ১,৯৪,৮০৩ জনের মৃত্যু এবং ১৩,৯০৬ জনের নিখোঁজ হওয়ার তথ্য জানানো হয়েছিল।

এই প্রাকৃতিক দুর্যোগ মুহূর্তের জন্য নির্বাচনী তৎপরতাকে পেছনে সরিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু নির্বাচনের জয়-পরাজয় নিয়ে আচ্ছন্ন ধূর্ত রাজনীতিকরা ঐ ট্রাজেডিকেও রাজনৈতিক ফায়দার জন্য ব্যবহার করার সুযোগ হাতছাড়া করেন নি। একে পুঁজি বানিয়ে তাঁরা পশ্চিম পাকিস্তান বিরোধী শ্লোগান দেয়ার মধ্য দিয়ে নিজেদের অবস্থানকে আরো সংহত করেছিলেন। তাঁরা পশ্চিম পাকিস্তানের কথিত উদাসীনতার সমালোচনায় মুখরিত হন এবং পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের দাবিকে তুলে ধরেন। কেউ কেউ এমন কি সম্পূর্ণ স্বাধীনতার দাবিও জানাতে থাকেন। তাদের মতে ভৌগোলিক বিচ্ছিন্নতার কারণে, এমন কি শান্তিপূর্ণ পরিস্থিতিতেও পশ্চিম পাকিস্তান কোনো উপকারে আসতে পারে না, তাই স্বাধীনতা ছিল এর সমাধান। এই বিদ্বেষ প্রচারকালে তাঁরা সেনাবাহিনীকেও ছাড় দেননি।

দুর্গতদের ত্রাণসামগ্রী প্রদান এবং মৃতদের সৎকার করার বিশাল ব্যবস্থাপনা করা প্রাদেশিক সরকারের পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়ে। ফলে মানুষের দুর্দশা লাঘবের জন্য স্বতঃস্ফূর্তভাবে সশস্ত্র বাহিনী সাহায্যে এগিয়ে আসে, তারা যানবাহন ও সামগ্রী দিয়ে এবং শারীরিক ও নৈতিকভাবে সাহায্য করতে থাকে। শুরুতে সেনাবাহিনীর একটি মাত্র হেলিকপ্টারকে প্রতিদিন ৯-১০ ঘণ্টা বিরতিহীনভাবে সেবা কাজে দেখা যেত, পরবর্তীতে সেনাবাহিনী ইঞ্জিনিয়ার্সের এলসিটি এবং বিমান বাহিনীর সি-১৩০ নিয়োজিত হয়েছিল।

নৌবাহিনীর সৈনিকদের প্রচেষ্টা যদিও ১৩ ও ১৪ নভেম্বরেই শুরু হয়েছিল. কিন্তু তা দু'একদিন পর্যন্ত সাধারণ মানুষ বা সাংবাদিকদের চোখে পড়েনি। ফলে বিতর্কের সৃষ্টি হয়। সশস্ত্র বাহিনী অবশ্য যথারীতি নীরবে তাদের কাজে নেমে পড়েছিল। ত্রাণসামগ্রী গ্রহণ ও বিতরণ, সকল প্রাপ্ত সম্পদের সদ্ব্যবহার এবং মৃত লোকজনের দাফন ও পশুদের সৎকারের সমগ্র কার্যক্রম তারা সমন্বয় ও পরিচালনা করেছে। কাজটি ছিল বিশাল কিন্তু সম্পদ ছিল কম। বিদেশী সংবাদপত্র ও রেডিওর মাধ্যমে দুর্যোগের খবর ছড়িয়ে পড়লে বিশ্ব স্তম্ভিত হয়ে পড়ে এবং পৃথিবীর সকল দিক থেকে ত্রাণ আসতে শুরু করে। বিদেশী সাহায্য ও বিমানের ব্যবস্থাপনা কঠিন কাজ হলেও সেনাবাহিনী ত্রাণ কার্যক্রমকে সুষ্ঠুভাবে সমন্বিত ও সংগঠিত করেছিল।

অবশ্য সশস্ত্র বাহিনীর এই নীরব প্রচেষ্টাকে জনগণ ও সংবাদপত্রের কাছে বিকৃতভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। একে দুর্যোগের ব্যাপারে প্রশাসনের উদাসীন মনোভাব হিসেবে

ব্যাখ্যা করা হয়েছে। বিস্ময়কর হল, পূর্ব পাকিস্তানকে ধ্বংস করার জন্য কেন্দ্রের 'ষড়যন্ত্র' হিসেবেও একে বর্ণনা করা হয়েছিল। সংবাদপত্র ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ পশ্চিম পাকিস্তানী রাজনীতিকদের অনুপস্থিতিকে 'বাংগালীবিরোধী' মনোভাবের বহিঃপ্রকাশ হিসেবে চিহ্নিত করেছিলেন। এই ভুলবোঝাবুঝি অনেক রাজনৈতিক বিতর্কের সৃষ্টি করে, যার মধ্যে বিদেশী সংবাদপত্রগুলো জড়িত হয়ে যায়-এরা স্থানীয় রাজনীতিতে নাক গলাতে শুরু করে। একথা বলা হয় যে, ১৯৬৫ সালের যুদ্ধকালে অনুভূত ভৌগোলিক বিচ্ছিন্নতার প্রতিক্রিয়া ছয় দফা দাবির উপস্থাপনার কারণ ঘটিয়েছিল এবং ঝড় ও জলোচ্ছ্বাসজনিত ধ্বংস সে তত্ত্বকে আরো শক্তিশালী করেছিল। দিল্লীভিত্তিক বিদেশী সাংবাদিকরা আগুনে বাড়তি ইন্ধন যুগিয়েছিলেন। তাঁরা পূর্ব-পশ্চিম পাকিস্তানের সম্পর্কের তিক্ততার দিকটির ওপর সমগ্র মনোযোগ টেনে আনেন এবং স্বায়ত্তশাসনকামী বাংগালী জাতীয়তাবাদী নেতাদের কেন্দ্রীয় সরকারবিরোধী ঘৃণাকে প্রাধান্যে নিয়ে আসেন। মনে হচ্ছিল যেন কেন্দ্র ও পশ্চিম পাকিস্তানের ওপর নির্ভরশীল থাকার অসুবিধা এবং সম্পূর্ণ স্বায়ত্তশাসিত রাষ্ট্রে পরিণত হওয়ার সুবিধাসমূহ সম্পর্কে পূর্ব পাকিস্তানীকে ঘরে ঘরে গিয়ে অবহিত করার দায়িত্বটি তাঁরা নিজেদের ওপর নিয়েছিলেন। যেখানে ছয় দফার প্রবক্তারাও নির্বাচনের প্রাক্কালে বিচ্ছিন্নতা প্রসঙ্গে কথা বলা এড়িয়ে চলছিলেন, সেখানে পশ্চিম পাকিস্তানের ত্রাণ সাহায্য সম্পর্কে জনগণকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ বিভিন্ন প্রশ্ন করার মধ্য দিয়ে বিদেশী সাংবাদিকরা বিষয়টির উল্লেখকে নিশ্চিত করেছিলেন।

পশ্চিম পাকিস্তানবিরোধী প্রচারণা বাড়তে থাকল, এমন কি রিলিফ কমিশনার, যিনি একজন সিএসপি অফিসার ছিলেন, কেন্দ্রীয় সরকারকে উদাসীনতার দায়ে অভিযুক্ত করলেন এবং আরো বেশি সংখ্যায় পশ্চিম পাকিস্তান থেকে হেলিকপ্টার আনার দাবি জানালেন। আমার স্থানচ্যুত অস্তির অস্ত্রোপচার এবং ওমরাও হজ্ব পালনশেষে পাকিস্তান ফেরার পথে আমি এই ট্র্যাজেডির খবর শুনি। আমাকে ছ' সপ্তাহের চিকিৎসা ছুটি এবং পূর্ণ বিশ্রামে থাকার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। কিন্তু দ্রুত ঢাকা চলে আসি এবং এসেই দেখতে পাই যে, সরকারের সামরিক ও অসামরিক শাখার সম্পর্কের মধ্যে সংকট সৃষ্টি হয়েছে। অ্যাডমিরাল আহসান তখন গভর্নর এবং জেনারেল ইয়াকুব সামরিক আইন প্রশাসক ছিলেন। দু'জনেই ছিলেন চমৎকার মানুষ ও ভালো প্রশাসক। এক উগ্র বাংগালী জাতীয়তাবাদী ছিলেন রিলিফ কমিশনার। তিনি জনগণের দুর্দশার ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকার ও পশ্চিম পাকিস্তানের নিষ্ক্রিয়তা ও সংবেদনহীনতার অভিযোগ এনে প্রতিদিন বিবৃতি প্রচার করতেন। ১৪ ডিভিশনের স্টাফ কর্নেল সাদউল্লাহ খুব ঋজু প্রকৃতির সৈনিক ছিলেন এবং তাঁর মধ্যেও ছিল সেই স্পষ্টবাদিতার সাধারণ দুর্বলতা, যে দুর্বলতায় প্রত্যেক সেনা অফিসারই ভুগে থাকেন। ত্রাণ সমন্বয় সভায় সামরিক ও অসামরিক প্রশাসনের মধ্যে সংঘাত ঘটেছিল এবং এর ফলে

দুটি পরস্পরবিরোধী শিবিরের সৃষ্টি হয়েছিল। একদিন সকালে আমি সে অফিসে পৌঁছে পূর্ব পাকিস্তান সরকারের কয়েকজন সচিবকে দেখলাম, তাঁরা গভর্নরের সঙ্গে সাক্ষাতের অপেক্ষা করছিলেন। তাঁরা ত্রাণ তৎপরতার দায়িত্ব গ্রহণ করার জন্য আমাকে অনুরোধ জানিয়ে বললেন, অন্য কোনো সামরিক অফিসারের অধীনে তাঁরা কাজ করবেন না। আমি গভর্নরের সঙ্গে দেখা করতে গেলে তিনিও একই কথার পুনরাবৃত্তি করলেন। আমি গভর্নরকে জানালাম যে, আমার পিঠের ক্ষত তখনো কাঁচা এবং চিকিৎসকরা আমাকে দীর্ঘক্ষণ চেয়ারে বসে থাকতে নিষেধ করেছেন। না হলে পিঠের এই ব্যথায় আমাকে সারা জীবন কষ্ট করতে হবে। তিনি বুঝলেন, সহানুভূতিও জানালেন। কিন্তু তারপরও আমাকে দায়িত্ব নিতে বললেন। কারণ তা না হলে সামরিক -অসামরিক প্রশাসনের সম্পর্ক স্বাভাবিক হবে না।

ত্রাণ তৎপরতার সমন্বয় করার দায়িত্ব নেয়া ছাড়া আমার আর কোনো বিকল্প ছিল না। তখন রমযান মাস। আমরা তারাবী নামাজ পড়ে রাত সাড়ে ৯টায় কাজ শুরু করতাম, কাজ শেষ হত রাত ১২টায়। খাদ্য ও ত্রাণসামগ্রীসহ বিমান, হেলিকপ্টার, নৌযান ও গাড়ি পাঠানোর আয়োজন করার কাজটি ছিল অত্যন্ত কঠিন ও পরিশ্রমের। বিদেশী ও পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আগত ত্রাণ ও সাহায্য গ্রহণের আয়োজনও করতে হত। স্বল্পকালের মধ্যেই আমি বিবদমান দল দুটির মধ্যে ঐক্য ও সমঝোতা সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিলাম। ত্রাণ কার্যক্রম এত সফল হয়েছিল যে, কোনো একজন মানুষও ক্ষুধা, রোগ বা মানব সৃষ্ট অন্য কোনো কারণে মারা যায়নি। কিন্তু এই কাজ করতে গিয়ে আমি সত্যি সত্যিই আমার পিঠ ভেঙে ফেলেছিলাম। ক্ষত তখনো কাঁচা এবং পাশের পেশী দুর্বল ছিল। এই ব্যথা ও অসুবিধা ভোগ করতে করতেই আমাকে কবরে যেতে হবে, কিন্তু আমার সান্ত্বনা, দেশের সেবা করতে গিয়ে এর কারণ ঘটেছিল। ১৯৯১ সালে বাংলাদেশে আবারও ঝড় ও জলোচ্ছ্বাস আঘাত হেনেছে। এবার কিন্তু ক্ষুধা, রোগ ও দুর্বল ত্রাণ ব্যবস্থাপনার কারণে হাজার হাজার মানুষের মৃত্যু ঘটেছে এবং মৃতদেহগুলোকে পুড়িয়ে ফেলা হয়েছে।

সেই দিনটিতেই আমি জানতে পারি যে, সিঙ্গাপুর থেকে ফেরার পথে বৃটিশ সেনাবাহিনীর ইউনিটগুলো ত্রাণ কার্যক্রম পরিচালনার উদ্দেশ্যে পটুয়াখালী অঞ্চলে অবতরণ করবে। কেন্দ্রীয় সরকার রাজনৈতিকভাবে বিচক্ষণতাবর্জিত এই পদক্ষেপে সম্মত হওয়ায় আমরা তাদের অবতরণ বন্ধ করতে পারিনি। আমি অবশ্য একথা শুনে আতংকিত হয়ে পড়েছিলাম যে, বৃটিশ বাহিনী যখন নামবে তখন তাদেরকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য পাকিস্তানের কোনো সেনাই সেখানে উপস্থিত থাকবে না। আমি শোনামাত্র সেনানিবাসে চলে গেলাম এবং সামরিক আইন প্রশাসকের সঙ্গে দেখা করলাম। আমরা সামরিক - অসামরিক প্রশাসনের সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করলাম। জেনারেল ইয়াকুব মত প্রকাশ করে জানালেন যে, এই সম্পর্কের উন্নয়ন ঘটানো উচিত। আমি তাকে একথা বোঝাতে সমর্থ

হলাম যে, বৃটিশ দলটিকে যথাযথভাবে অভ্যর্থনা জানানো দরকার। শেষ পর্যন্ত সেটাই করা হয়েছিলঃ ঐ অঞ্চলের ব্রিগেড কমান্ডার তাদের অভ্যর্থনা জানিয়েছিলেন।

পশ্চিম পাকিস্তানের বিলম্বিত সাড়ার অভিযোগ তখনো চলছিল। বাংগালীদের নিজেদের উদাসীনতার দিকটি উন্মোচনের উদ্দেশ্যে আমি রিলিফ কমিশনারকে ঢাকায় কয়েকটি স্থানে শাড়ি সংগ্রহের আয়োজন করতে বললাম। স্পষ্টত শাড়ি তো আর পশ্চিম পাকিস্তান বা অন্য কোথাও থেকে আসবে না। বেশ কয়েকটি স্থানে সংগ্রহকেন্দ্র স্থাপিত হল এবং রেডিও-টেলিভিশনে শাড়ি দান করার জন্য আবেদন প্রচার করা হতে থাকল। কিন্তু ঢাকার জনগণের দিক থেকে সাড়া ছিল বেদনাদায়ক। আমরা শাড়ি পাইনি, কিন্তু এই পদক্ষেপটি পশ্চিম পাকিস্তানবিরোধী প্রচারণাকারীদের মুখ বন্ধ করে দিয়েছিল। এই প্রচারণা এত মারাত্মক ও বিদ্বেষপূর্ণ ছিল এবং আমরা ভাবতেও পারতাম না যে, নিজেরই জনগণ ও সরকারের বিরুদ্ধে কিভাবে তারা অমনভাবে বলতে পারত। কিন্তু সেটাই চলত, আর একমাত্র উদ্দেশ্যটি ছিল বিচ্ছিন্নতাবাদী ও বাংগালী জাতীয়তাবাদীদের স্বার্থকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। পাকিস্তান সরকারের সমালোচনার এবং পশ্চিম পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ঘৃণাকে উস্কে দেয়ার প্রতিটি সুযোগকে তারা সদ্ব্যবহার করত। পূর্ব পাকিস্তানে সেনাবাহিনী তাদের ভাইদেরকে সাহায্য করার জন্য সম্ভব সব কিছুই করেছিল। রাজনীতিকরা যখন দেখলেন যে, জনগণের মধ্যে সেনাবাহিনীর প্রতি কোমল মনোভাবের বিকাশ ঘটছে, সাথে সাথে তারা ধর্ষণসহ বিভিন্ন মিথ্যা অভিযোগ তুলতে শুরু করে দিলেন। এমন দৃষ্টান্তও রয়েছে যে, সামান্য কিছু টাকার বিনিময়ে মানুষ কবর থেকে আত্মীয়-স্বজনের মৃতদেহ উঠিয়ে এনেছে এবং বিদেশী সাংবাদিকরা সেগুলোর ছবি তুলেছেন। এর পর অভিযোগ উত্থাপন করা হয়েছে যে, পশ্চিম পাকিস্তানীরা মৃতদেহের দাফন করছে না।

যে রাজনৈতিক দলগুলো দায়সারাভাবে নির্বাচনে অংশ নিচ্ছিল, নির্বাচনে পরাজয় আশংকা করছিল বা প্রচারাভিযানে পিছিয়ে পড়েছিল, তাদের জন্য এই বিপর্যয় এক আশীর্বাদ হয়ে দেখা দিয়েছিল। এ ধরনের নেতৃবৃন্দ নির্বাচনকে স্থগিত করার দাবি তুললেন। আওয়ামী লীগ প্রার্থীদের বিরুদ্ধে জয় লাভের ব্যাপারে তারা কোনোভাবেই নিশ্চিত ছিলেন না। যাদের সামান্য হলেও পরিষদে যাওয়ার আশা ছিল, তারাও আওয়ামী লীগের আধিপত্যাধীন পরিষদে গিয়ে বিচ্ছিন্ন হতে চাচ্ছিলেন না। উদ্দেশ্য যা-ই হোক না কেন, নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা থেকে তারা বিরত হয়েছিলেন।

প্রত্যাহারের সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নির্বাচনটি এক তরফা বিষয়ে পরিণত হয়ে পড়ছিল। প্রথম থেকে এগিয়ে থাকা আওয়ামী লীগকে উল্লেখযোগ্য কোনো প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্মুখীন হতে হয়নি। ধারণা করা হয়েছিল যে, নির্বাচনের প্রাক্কালে আওয়ামী লীগ বাংগালী জাতীয়তাবাদের অনুভূতিকে উস্কে দেয়ার এবং তার ফলকে কাজে লাগানোর উদ্দেশ্যে

কতিপয় বিষয়কে সামনে নিয়ে আসবে। কিন্তু সে প্রচেষ্টা আর চালাতে হয়নি। তাদেরকে শুধু ঠোঁট নাড়তে হয়েছে, বাকি কাজ করে দিয়েছে প্রকৃতি, স্থানীয় সংবাদপত্র ও বিদেশী সাংবাদিকরা।

মনে হয়েছে 'নিয়তি' আমাদেরকে বিচ্ছিন্নতার পথে এগিয়ে নিচ্ছিল। প্রথমত, মুজিবের প্রকাশ্য বিচার দিক পরিবর্তনের অনুঘটক হিসেবে কাজ করেছিল। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর প্রথম থেকে যে বাংগালী জাতীয়তাবাদ বিদ্যমান ছিল, এই বিচার তার স্ফুরণ ঘটিয়েছিল। তারপর ইয়াহিয়া এক লোক এক ভোট প্রবর্তন করায় এবং এক ইউনিট ভেঙে দেয়ায় পূর্ব পাকিস্তানের জন্য স্থায়ী সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন ও শাসন করার সম্ভাবনা সৃষ্টি হল। পশ্চিম পাকিস্তানে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অধীনস্থ হয়ে পড়ার ভীতি সঞ্চারিত হল। এর পর বন্যার পরপর সংঘটিত নজিরবিহীন ঝড় ও জলোচ্ছ্বাস পাকিস্তানবিরোধী মনোভাবকে বাড়িয়ে দিতে সাহায্য করল। রাষ্ট্রপ্রধান হওয়ার একই আকাঙ্ক্ষা নিয়ে একযোগে এগিয়ে এলেন মুজিব ও ভুট্টো। বেশি ভোট কিন্তু কম মস্তিষ্কের ক্ষমতা নিয়ে মুজিব বুদ্ধিমান, উচ্চাকাঙ্ক্ষী ও নির্দয় ভুট্টোর বিরুদ্ধে ঝামেলায় পড়ে গেলেন।

সেনাবাহিনী দীর্ঘকাল ধরে পাকিস্তানে শাসন চালিয়েছিল। সকল রাজনৈতিক নেতা তাদের কবল থেকে মুক্তি পেতে চাইলেন এবং সম্ভবত সঠিকভাবেই তা চাইলেন। সেনাবাহিনীর শাসন করার কোনো অধিকার নেই। তারা আইন-শৃংখলা উদ্ধার করার জন্য আসতে পারে, কিন্তু যত দ্রুত সম্ভব তাদের উচিত বেসামরিক কর্তৃপক্ষের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করা। জনাব ভুট্টোর মতে পাকিস্তানে তখন তিনটি শক্তি ছিল- আওয়ামী লীগ, পিপলস পার্টি ও সেনা বাহিনী। কম বুদ্ধি নিয়ে মুজিবের পক্ষে সেনাবাহিনীর মুখোমুখী হওয়া সম্ভব ছিল না। প্রতিভাধর মানুষটি এত নিপুণভাবে কৌশল খাটালেন যাতে এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় যখন সেনাবাহিনী আওয়ামী লীগকে ধ্বংস করে দেবে এবং সে প্রক্রিয়ায় নিজেরাও ধ্বংস হয়ে যাবে। আর তার ফলে পিপিপি-র জন্য তার নিজের শক্তির এলাকা পশ্চিম পাকিস্তানে পড়ে থাকবে খালি ময়দান।

১৯৫৮ সালে সামরিক শাসন ঘোষিত হওয়ার পর সকল রাজনৈতিক দল ও রাজনৈতিক কার্যক্রম নিষিদ্ধ হয়েছিল। রাজনৈতিক দলগুলোকে নিষিদ্ধ করা হলেও ছাত্র সংসদগুলোকে টিকে থাকতে এবং তৎপরতা চালাতে দেয়া হয়েছিল। রাজনীতিকরা তাদের ধারণা ও বক্তব্য প্রচারণার বাহন হিসেবে ছাত্র সংসদগুলোকে বেছে নিয়েছিলেন। পূর্ব পাকিস্তানে ছাত্র সংসদগুলো সবচেয়ে শক্তিশালী সরকার বিরোধী সংগঠনে পরিণত হয়েছিল। পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ একটি উল্লেখযোগ্য শক্তি ছিল। প্রাথমিক পর্যায় পর্যন্ত তারা শাখা গঠন করেছিল। তাদের কর্মসূচী ছিল আওয়ামী লীগের ছয় দফা ও ছাত্রদের ১১ দফা বাস্তবায়ন করা। তারা পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক চিন্তা ও দাবির অগ্রবর্তী দল

হিসেবে ভূমিকা পালন করত। সব সময়ই তারা সামনে এগিয়ে থাকতঃ দাবি জানাত রাজনৈতিক দলগুলোর চাইতে অনেক বেশি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিরাপদ আশ্রয়স্থলে তারা বিদ্বেষপূর্ণ ভাষণের মাধ্যমে নিজেদের চিন্তাধারার প্রকাশ ঘটাত। ছাত্ররা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসকে একটি জনশূন্য ভূমিতে এবং বিদ্রোহীদের নিরাপদ স্বর্গে পরিণত করেছিল। বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় পুলিশকে ঢুকতে দেয়া হত না।

ছাত্রদের শক্তি, প্রভাব এবং কার্যক্ষমতা সম্পর্কে ধারণা করা পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণের পক্ষে সম্ভব ছিল না। ছাত্ররা নতুন কোন চিন্তা ও দাবি তুলে ধরা মাত্র রাজনৈতিক দলগুলি তাকে গ্রহণ করে নিত। ছাত্ররা আন্দোলন শুরুর পর ধর্মঘটের ডাক দিলে সমগ্র প্রদেশ তা মান্য করতঃ কোনো চাকা ঘুরত না, পথচারীদের দেখা যেত খালি পায়ে হেঁটে যেতে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্ররা সক্রিয় থাকায় ছাত্রদের নির্দেশ গ্রাম পর্যন্ত প্রতিপালিত হত। এ কথা বললে ভুল হবে না যে, হরতালের দিন এমন কি পাখিরা পর্যন্ত উড়তে দ্বিধান্বিত হয়ে পড়ত।

যখনই ইচ্ছা করত তখনই ছাত্র সংগঠনগুলো সরকারের বৈধ ও আইনসঙ্গত কর্তৃত্বকে অমান্য করত। তাদের দর্শন ছিল জাতীয়তাবাদী, সমাজতন্ত্রী ও ইসলামবিরোধী। পাকিস্তানী জাতীয়তার ভিত্তিতে দেশকে সংহত করার প্রতিটি পদক্ষেপেরই বিরোধিতা করত ছাত্ররা। পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র লীগের একজন ছাত্র নেতা আ স ম আবদুর রব ছাত্রদের মতামত তুলে ধরতে গিয়ে ১৯৭০ সালের ১৭ আগস্ট খোলাখুলিভাবে বলেছিলেন, "আমরা ঘোষণা করতে চাই যে, যাদের বয়স চব্বিশ বছরের নিচে তাদের ভেতরে একটি নতুন মানচিত্র দেখার এবং একটি নতুন রাষ্ট্র ও নতুন জাতি গঠন করার স্বপ্ন রয়েছে।" তার প্রতিপক্ষ ছাত্র সংগঠন পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন ১৯৭০ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি ঘোষণা দেয়, "সকল সমস্যার সমাধান রয়েছে স্বাধীন জনগণতান্ত্রিক পূর্ব বাংলা প্রতিষ্ঠার মধ্যে।"

নির্বাচন যত এগিয়ে আসছিল, পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক চিন্তাধারার তত বেশি স্পষ্ট প্রতিফলন ঘটছিল। আওয়ামী লীগ এই ভাবনা থেকে নির্বাচনে অংশ নিতে সম্মত হয়েছিল যে, শান্তিপূর্ণ ও সাংবিধানিক পন্থায় সরকারের নিয়ন্ত্রণ অর্জনে তার জন্য একটি সুযোগ রয়েছে। সেই সাথে বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানানোর এবং প্রয়োজনে সহিংস পন্থায় লক্ষ্য অর্জনের ঘোষণা দেয়ার মাধ্যমে চাপ অব্যাহত রাখার জন্য আওয়ামী লীগ ছাত্র ও চরমপন্থীদের উৎসাহও যুগিয়েছিল। এই প্রবণতা আরো স্পষ্ট হয়েছিল যখন এমন কি মওলানা ভাসানী পর্যন্ত চার তারকাসম্বলিত লাল পতাকার নিচে স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানিয়েছিলেন। পরিস্থিতি সম্পর্কে আমার মূল্যায়ন ছিল, একমাত্র মুসলিম লীগ ছাড়া উল্লেখযোগ্য সকল রাজনৈতিক দলেরই একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের স্বপ্ন ছিল। আওয়ামী লীগ চেয়েছিল বাংলাদেশ, ন্যাপ (ওয়ালী খান গ্রুপ) চেয়েছিল মস্কোপন্থী

বাংলাদেশ আর মওলানা ভাসানী চেয়েছিলেন পিকিংপন্থী বাংলাদেশ। আমি সাহস নিয়ে একথা বলতে পারি যে, এমন কি জামায়াতে ইসলামীও একটি মুসলিম বাংলা চেয়েছিল। পাকিস্তানে বিদ্যমান কেন্দ্রীভূত ব্যবস্থার বিরুদ্ধে ঘটনার আশংকা তখন মারাত্মকভাবে প্রবল হয়ে উঠেছিল।

নির্বাচনের পর

১৯৭১ সালের জানুয়ারির মধ্যে নির্বাচন সম্পন্ন হয়ে গিয়েছিল। পূর্ব পাকিস্তানে দুটি ছাড়া সকল আসনে জয় লাভ করায় জাতীয় পরিষদে আওয়ামী লীগ একক বৃহত্তম দলে পরিণত হয়েছিল। সংখ্যাসাম্যের নীতির বিলুপ্তি তখন এক অস্বাভাবিক জটিল পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। এই জটিলতার সমাধান অন্বেষণ করতে গিয়ে রাজনৈতিক মূল্যায়ন স্পষ্ট হতে শুরু করেছিল। যে বুদ্ধিজীবীরা বাংগালী জাতীয়তাবাদের প্রবক্তা ছিলেন, তারা এই নির্বাচনী বিজয়কে বাংলাদেশ অর্জনের লক্ষ্যে ব্যবহার করতে প্রতিজ্ঞ হয়ে উঠছিলেন। যুব সমাজ চাচ্ছিল তাৎক্ষণিক বিচ্ছেদ। একটি আপোষমূলক সমাধানও উপস্থাপিত হয়েছিল- যার প্রবক্তারা দাবি করেছিলেন যে, তাদের প্রস্তাব গ্রহণ করা হলে সম্পূর্ণ স্বাধীন বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠা হওয়াকে স্তিমিত করা সম্ভব। ধারণাটি ছিল প্রকৃতপ্রস্তাবে একটি কনফেডারেশন গঠন করার, যার রাষ্ট্রপ্রধান পালাক্রমে নির্বাচিত হবেন। বলা হয়েছিল, তেমন আয়োজন করা গেলে ঐতিহাসিক বিকাশ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে তা দেশকে একটি সুখী ফেডারেশনে পরিণত করবে, না হলে শান্তিপূর্ণভাবে বিচ্ছেদ ঘটাবে। পশ্চিম পাকিস্তানেও চাপ তৈরি হচ্ছিল। এই চাপও এক রাষ্ট্রের ধারণাকে খর্বিত করেছে। জনাব ভুট্টো ঘোষণা করেছেন, ''ঐকমত্য ছাড়া প্রণীত যে কোনো ভবিষ্যত সংবিধান হবে নিষ্ফল প্রচেষ্টা।'' তিনি আশা প্রকাশ করতে গিয়ে বলেছেন,''আওয়ামী লীগ এই প্রক্রিয়ায় তার নিরংকুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার বল প্রয়োগ করবে না।'' তিনি সেই সাথে দুই সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নজিরবিহীন ও অবাস্তব তত্ত্বও উপস্থাপিত করেছিলেন।

একটি মীমাংসার তাগিদ খুব জরুরিভাবে অনুভূত হচ্ছিল। নেতৃবৃন্দের করণীয় ছিল সকল হতাশা, অবিশ্বাস ও ঘৃণাকে জয় ও নিশ্চিহ্ন করা। খোলামেলা আলোচনার মাধ্যমে মীমাংসায় আসার এবং সাংবিধানিক সমস্যার প্রশ্নে পরস্পরের কাছে গ্রহণযোগ্য একটি সমাধানে পৌছানোর সময় এসে গিয়েছিল। প্রয়োজন ছিল সমঝোতা, সংযম ও সর্বোচ্চ

সতর্কতার সঙ্গে সংকট কাটিয়ে ওঠার। কিন্তু বাস্তবে মুখোমুখি সংঘাতের সেই পদক্ষেপ নেয়া হয়েছিল, যা বড় ধরনের বিপর্যয় তথা দেশের ভাঙন ঘটাবে।

ঐতিহাসিকভাবে ছয় দফা ছিল বিশেষ একটি পরিবেশের ফলাফল, যে পরিবেশে পূর্ব পাকিস্তানীদের মনে এই ভাবনার জন্ম হয়েছিল যে, কেন্দ্রীভূত সরকার পদ্ধতির অধীনে তারা কোনোদিনই ক্ষমতার ন্যায্য হিস্যা পাওয়ার আশা করতে পারে না। অবশ্য এক ইউনিটের বিলুপ্তি এবং সংখ্যাসাম্য নীতির বাতিল পরিস্থিতিকে সম্পূর্ণ পরিবর্তিত করেছিল। অবিশ্বাস সৃষ্টির জন্য দায়ী অবস্থা তখন আর বিদ্যমান ছিল না। স্পষ্টতই বাংগালীরা এবার সমগ্র পাকিস্তানকে শাসন করার জন্য প্রতীক্ষা করছিল। এবার পশ্চিম পাকিস্তানীরা পূর্ব পাকিস্তানের নিরংকুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার বিরুদ্ধে নিরাপত্তা নিয়ে কথা বলতে শুরু করেছিল। ভূমিকা, আশংকা ও দাবির সে ছিল এক বিচিত্র বিপরীত অবস্থা। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ঘোষিত আইনগত কাঠামো আদেশে ১২০ দিনের মধ্যে সংবিধান প্রণয়ন সম্পন্ন করার সময়সীমা নির্ধারণ করা হয়েছিল। আওয়ামী লীগ এই সময়কে যথেষ্ট মনে করেছে। কিন্তু পিপলস পার্টির নেতৃত্ব ভেবেছেন অন্য রকমঃ পুনর্মূল্যায়ন এবং বিভিন্ন মতামতের ভিত্তিতে একটি মীমাংসায় পৌছানোর উদ্দেশ্যে তারা আরো বেশি সময়ের মেয়াদ চেয়েছেন। সেজন্য তারা প্রাক-অধিবেশন আলোচনার দাবি তুলেছেন।

আওয়ামী লীগ ও পিপলস পার্টির মধ্যে যখন দেশভিত্তিক আলোচনা এগিয়ে চলছিল তখন অন্তত প্রাদেশিক পর্যায়ে আইন শৃঙ্খলা বজায় রাখার ব্যাপারে আমি আওয়ামী লীগের সঙ্গে আলোচনা করার প্রয়োজন বোধ করলাম। গভর্নর অ্যাডমিরাল আহসানকে পরামর্শ দিতে গিয়ে আমি জানালাম, এ ধরনের সংলাপ খুব উপকারী হবে এবং তাঁর উচিত শেখ মুজিবুর রহমানকে আলোচনার জন্য আহ্বান জানানো। গভর্নর আহসান অবশ্য বললেন যে, তিনি যেহেতু প্রেসিডেন্টের কাছ থেকে কোনো নির্দেশ পাননি, তাই তাঁর পক্ষে কোনো অর্থপূর্ণ আলোচনা করা সম্ভব নয়। আমি তাঁর সীমাবদ্ধতার কারণ জানতাম। আওয়ামী লীগের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার জন্য আহসানকে দোষারোপ করে পশ্চিম পাকিস্তানী নেতারা (পিপলস পার্টি) গুজব রটিয়েছিলেন। গভর্নরকে সম্মত করতে ব্যর্থ হয়ে আমি মার্শাল ল অ্যাডমিনিস্ট্রেটর জেনারেল ইয়াকুবকে উদ্যোগ নেয়ার অনুরোধ জানালাম। তিনিও জড়িত হতে অস্বীকার করলেন। আমি তখন নিজে মুজিবের সঙ্গে দেখা করার অনুমতি চাইলাম। পাকিস্তানের ভবিষ্যতের জন্য মুজিবের মতামত জানার এবং চরমপন্থী ধ্যান-ধারণার বিরোধিতা করতে তাঁকে প্রভাবিত করার উদ্দেশ্যে আমি বিষয়টিকে গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনা করেছিলাম। আমাকে অনুমতি দেয়া হল।

উভয়ের বন্ধু, মুঘল টোব্যাকো কোম্পানীর জনাব মুজতবার বাসায় আমি মুজিবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলাম। আলোচনার শুরুতেই তিনি অভিযোগ তুলে বললেন যে, নির্বাচনের সময় আমি তাঁর বিরোধিতা এবং ইসলাম-পছন্দ দলগুলোকে সাহায্য করেছি। আমি তাঁকে

বললাম, তার অভিযোগগুলো আমি মেনে নিচ্ছি। বললাম, সন্দেহ নেই আমি তাঁর বিরোধিতা করেছি, কিন্তু কোনো খারাপ উদ্দেশ্যে তা করিনি। আমার প্রচেষ্টার উদ্দেশ্য ছিল দীর্ঘ মেয়াদে পরোক্ষভাবে তাঁকে সাহায্য করা। আমার মতে তিনি যদি কিছুটা কম সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেতেন তাহলে তাঁর নিজেরই মঙ্গল হতো। কেননা এর ফলে তিনি পদক্ষেপ ও কৌশল গ্রহণের ক্ষেত্রে অনেক বেশি স্বাধীনতা ভোগ করতে পারতেন। ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে আমি বললাম, যে নিরংকুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা তিনি পেয়েছেন তা প্রকৃতপ্রস্তাবে তাঁকে ছয় দফার দাসে পরিণত করেছে। ফলে আমার মতে তিনি এখন একজন দুর্বল ব্যক্তি। তিনি এই মতের সঙ্গে একমত হলেন না এবং উচ্চ গ্রামে বললেন (যা তার স্বাভাবিক অভ্যাস ছিল), 'আমি বঙ্গবন্ধু। আমি যদি তাদের দাঁড়াতে বলি তারা দাঁড়াবে, যদি বসতে বলি তারা বসবে।' তিনি তাঁর অবস্থান সম্পর্কিত আমার মূল্যায়ন মেনে নিলেন না, কিন্তু পাকিস্তানের ভবিষ্যত সংবিধান প্রসঙ্গে আমাদের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ আলোচনা হল। তিনি একমত হলেন যে, তাঁর ছয় দফার দুই মুদ্রা, প্রতি প্রদেশের উপার্জিত বৈদেশিক মুদ্রার ওপর নিয়ন্ত্রণ এবং বিদেশের সঙ্গে সাহায্য/ঋণের ব্যাপারে পৃথক যোগাযোগ সংক্রান্ত তিনটি দফা পশ্চিম পাকিস্তানে বিরোধিতার কারণ ঘটিয়েছে।

মুজিব নিজে থেকেই দুই মুদ্রার ধারণাটি পরিত্যাগ করলেন। সাহায্যের জন্য যোগাযোগের প্রশ্নে তিনি বিশেষ প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে এই প্রদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যসম্বলিত পাকিস্তানভিত্তিক প্রতিনিধি দল গঠনে সম্মত হলেন। এটা কোনো আপত্তিকর প্রস্তাব ছিল না, বরং ছিল ইতিবাচক ও সুষ্ঠু প্রস্তাব। বৈদেশিক মুদ্রার প্রশ্নে পূর্ব পাকিস্তান অনুধাবন করেছিল যে, পরিস্থিতিতে পরিবর্তন ঘটেছে এবং পশ্চিম পাকিস্তানের উপার্জনের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে শতকরা ৫৪ ভাগে। ফলে এই দফার অন্তর্ভুক্তিতে পশ্চিম পাকিস্তানই লাভবান হবে, সুতরাং পূর্ব পাকিস্তানের নিজের স্বার্থেই দফাটি পরিত্যাগ করা উচিত।

এটা খুবই পরিষ্কার হয়েছিল যে, পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যকার রাজনৈতিক মতপার্থক্য দূর করা সম্ভব। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে ক্ষমতাসীন তথা পশ্চিম পাকিস্তানী নেতৃত্বের দিক থেকে তেমন কোনো মনোভাব দেখানো হয়নি। অন্যদিকে মতপার্থক্য বাড়িয়ে দেয়ার এবং উভয় পক্ষকে মুখোমুখি সংঘাতে দাঁড় করানোর লক্ষ্যে প্রতিটি পদক্ষেপ নেয়া হয়েছিল। আমি জেনারেল ইয়াকুবের কাছে আমাদের আলোচনার ওপর একটি লিখিত রিপোর্ট পেশ করেছিলাম। রিপোর্টটি প্রেসিডেন্টের কাছে পেশ করা হয়েছিল। কিন্তু প্রেসিডেন্টের চারদিকে থাকা পূর্ব পাকিস্তানবিরোধী উপদেষ্টারা তাঁকে বিদ্যমান সুযোগকে কাজে লাগাতে দেননি। পরবর্তীকালে ১৯৭১ সালের মার্চে একটি বিলম্বিত প্রচেষ্টা নেয়া হয়েছিল, কিন্তু কতিপয় কারণে তা নিষ্ফল হয়ে যায়। এই কারণগুলো আমরা পরে আলোচনা করব। সমস্যা সমাধানোর ক্ষেত্রে সময় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আজ যে সমাধানটি সঠিক ও গ্রহণযোগ্য, কিছুদিন পর সেটাই বেসুরো এবং ফলে অগ্রহণযোগ্য হয়ে উঠতে

পারে। বিমান যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হওয়ায় চরমপন্থীরা পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি জানানোর সুযোগ পেয়েছিল। এটা একই সাথে ভুট্টোর স্বার্থকেও সিদ্ধি করেছিল।

আওয়ামী লীগের আনুষ্ঠানিক বা অফিসিয়াল অবস্থান অবশ্য সাংবিধানিকভাবেই বজায় ছিল। নির্বাচনে যে চূড়ান্ত বিজয় দলটি অর্জন করেছিল তাঁর সুবিধা তারা কাজে লাগাতে চেয়েছিলেন। তারা তাই বিলম্বিত না করে খসড়া সংবিধান চূড়ান্ত করার কাজটুকু সেরে নিচ্ছিলেন। পাকিস্তানের জন্য সংবিধানের বিল প্রস্তাব করার ক্ষেত্রে সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসেবে নিজেদের দায়িত্ব সম্পর্কে তাঁরা সচেতন ছিলেন। বিল পাস করিয়ে নেয়ার ব্যাপারে শেখ মুজিব নিশ্চিত ছিলেন, এমন কি তা যদি দলীয় কর্মসূচী ছয় দফার ভিত্তিতেও হতো। এল এফ ও দুই-তৃতীয়াংশের সাধারণ প্রয়োজনীয়তার বিধানটি আরোপ করেনি, ফলে নিরংকুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ দল আওয়ামী লীগের জন্য সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠতায় পরিষদে পাস না হওয়ার কোনো কারণ ছিল না। শেখ মুজিব এই আশাবাদও ব্যক্ত করেছিলেন যে, প্রেসিডেন্ট বিলম্ব না করে সংবিধানটি সত্যায়ন করবেন এবং একটি যুক্তিসঙ্গত সময়ের মধ্যে জাতির নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করা হবে।

চরমপন্থীরা চাপ অব্যাহত রাখছিল। পশ্চিম পাকিস্তানী নেতাদের প্রতিটি পদক্ষেপ ও বক্তব্যকেই সন্দেহের চোখে দেখা হচ্ছিল এবং পূর্ব পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র হিসেবে চিহ্নিত করা হচ্ছিল। এদের মনোভাবের প্রকাশ ঘটিয়ে এমন কি শেখ মুজিবও প্রকাশ্যে বলেছেন, "বাংলাদেশের জনগণকে যদি বুলেটও মোকাবিলা করতে হয় তবু ছয় দফার বিজয় অর্জন করা হবে।" আওয়ামী লীগের অন্য কয়েকজন নেতা বলেছেন, প্রেসিডেন্ট যদি ছয়দফা ভিত্তিক সংবিধান সত্যায়ন না করেন তাহলে তারা এক তরফাভাবে স্বাধীনতার ঘোষণা দেবেন।

প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া জানুয়ারির দ্বিতীয় সপ্তাহে ঢাকা সফর করেন। মুজিব ও তাঁর টিমের সঙ্গে প্রেসিডেন্টের বিস্তারিত আলোচনা হয় এবং তিনি ছয় দফার একটি একটি করে দফার ব্যাপারে ব্যাখ্যা চান। এতে প্রতিভাত হয় যে, মুজিবের টিম সদস্যদের অনেকের মধ্যে বিচ্ছিন্নতাবাদী প্রস্তাবনা থেকে সুসংবদ্ধ ফেডারেল পদ্ধতি পর্যন্ত নানা রকম ব্যাখ্যা রয়েছে। মুজিবের ব্যক্তিগত মনোভাবের কঠোরতায় প্রেসিডেন্ট নিরাশ হয়েছিলেন। অথচ নির্বাচনের আগে মুজিব অনুগত ও খুবই সহযোগিতাপূর্ণ ছিলেন এবং অকুণ্ঠিত চিত্তে পূর্ব পাকিস্তানের দাবির প্রশ্নে তিনি নমনীয়তা দেখানোর অঙ্গীকার করেছিলেন। সেই একই মুজিব এবার সর্বজনবিদিত সংখ্যাগরিষ্ঠতার আড়াল নিয়ে এবং জনগণের দাবির মূল সুরকে ব্যবহার করে আক্রমণাত্মক ও কঠোর মনোভাব দেখিয়েছিলেন। ইয়াহিয়া একে বিশ্বাসভঙ্গ হিসেবে মনে করলেন। নির্বাচনের আগে মুজিব ইয়াহিয়াকে বুঝিয়েছিলেন যে, ছয় দফাকে তিনি নির্বাচনে জয় লাভ করার জন্য ব্যবহার করছেন এবং নির্বাচিত হয়ে গেলে তিনি তাঁর অবস্থান পরিবর্তন করবেন। ইয়াহিয়া দেখলেন যে, সহযোগিতা ও সমঝোতার মনোভাব নিয়ে দাবি

কমিয়ে আনার পরিবর্তে পূর্ব পাকিস্তানের নেতারা অনমনীয় হয়ে উঠছিলেন। পশ্চিম পাকিস্তান যেমনটি আগে করেছে সেভাবে তারা আগামী বিশ বছর পশ্চিম পাকিস্তানকে শাসন করার মনোভাব নিয়ে কথা বলছিলেন।

যা হোক, নিজের ভাবাবেগ ও সিদ্ধান্ত গোপন রেখে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে ঢাকা বিমান বন্দরে প্রেসিডেন্ট ঘোষণা করেন যে, মুজিব পাকিস্তানের ভবিষ্যত প্রধান মন্ত্রী। এই ঘোষণাকে ঢাকায় ভালোভাবে গ্রহণ করা হয়েছিল।

জেনারেল হামিদ তাঁকে ক্ষমতাচ্যুত করেছেন ধরনের গুজবের প্রেক্ষিতে বিবিসি-র সংবাদদাতার প্রশ্নের উত্তরে প্রেসিডেন্ট বলেন, "আমিই এখানো ক্ষমতায় আছি।" প্রেসিডেন্ট করাচী গেলেন এবং সেখান থেকে জনাব ভুট্টোর সঙ্গে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে ১৭ জানুয়ারি তিনি সরাসরি লারকানা যান। এটাও পূর্ব পাকিস্তানের জন্য একটি স্পর্শকাতর বিষয় হয়ে ওঠে। ঢাকায় অবস্থানকালে আমন্ত্রণ জানানোর পরও যেখানে তিনি শেখ মুজিবের ধানমণ্ডির বাসভবনে যেতে রাজি হননি, সেখানে এবার তিনি মুজিবের শত্রুর বাড়ি লারকানায় গেছেন বাংলাদেশের জনগণের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতে-এমনি ধরনের কথা তখন বলাবলি হচ্ছিল। মুজিবের মনোভাবের কঠোরতায় বিরক্ত প্রেসিডেন্ট বিষয়টি বিশ্বাসঘাতকতা হিসেবে নিয়েছিলেন এবং ভুট্টোর করা পরিস্থিতির মূল্যায়ন গ্রহণ করতে তিনি আগ্রহী হয়ে উঠেছিলেন। মুজিবের উদ্দেশ্যকে, এমন কি পাকিস্তানের প্রতি তাঁর আনুগত্যকেও তাঁরা সন্দেহ করে বসলেন।

আমি লারকানায় উপস্থিত ছিলাম না, ফলে সেখানে কি ঘটেছিল আমি জানি না। কিন্তু পরবর্তীকালে জেনারেল ওমর আমাকে বলেছিলেন যে, ভুট্টোর তত্ত্বকেই গ্রহণ করা হয়েছিল। তাঁর তত্ত্বটি কি ছিল? জেনারেল ওমরের মতে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত করে প্রেসিডেন্ট মুজিবের আনুগত্য পরীক্ষা করবেন। মুলতবিকরণকে মুজিব যদি মেনে নেন তাহলে তিনি অনুগত পাকিস্তানী হিসেবে বিবেচিত হবেন। আর যদি মেনে না নেন তাহলে তাঁকে স্পষ্টতই একজন অবাধ্য হিসেবে গণ্য করা হবে। ভুট্টোর সমালোচকরা বলেন, এর ঠিক উল্টোটি যদি করা হত, অর্থাৎ যদি ঘোষিত তারিখ ৩ মার্চে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বসত, তাহলে জনাব ভুট্টো নিজে কোন্‌টি প্রমাণিত হতেন- অনুগত না অবাধ্য পাকিস্তানী?

ভুট্টোকে প্রেসিডেন্ট পূর্ব পাকিস্তান সফরে যেতে এবং মুজিবের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে মত পার্থক্য কাটিয়ে উঠতে বললেন। একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন প্রতিনিধিদল নিয়ে ২৭ জানুয়ারি ভুট্টো ঢাকায় এলেন এবং মুজিব ও আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের সঙ্গে তিন দিন ধরে বিস্তারিত আলোচনা চালালেন। আলোচনা ফলপ্রসূ হয়নি, কিন্তু জনাব ভুট্টো সংলাপ অব্যাহত রাখার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। ক্ষমতা ভাগাভাগি করার প্রশ্নেই প্রধান মতপার্থক্য সৃষ্টি হয়েছিল। জনাব ভুট্টোর বক্তব্য ছিল, ভৌগোলিক বিচ্ছিন্নতা এবং অন্যান্য ঐতিহাসিক

কারণে দেশের এক অংশের ওপর অন্য অংশের আধিপত্য যুক্তিসিদ্ধ হবে না। তাই তাঁর মতে যে কোনো একটি অংশের ক্ষমতাকে অস্বীকার করে রচিত সংবিধান হবে নিষ্ফল পণ্ডশ্রম। মুজিব ও তাঁর দল এই অভিমত তুলে ধরেন যে, সংবিধান রচনা এবং সরকার গঠন করা দুটি পৃথক কাজ। সংবিধান রচনা করার আগেই ক্ষমতা ভাগাভাগির ব্যাপারে সম্মত হতে তারা অস্বীকার করেছিলেন।

তথাকথিত কাশ্মীর লিবারেশন ফ্রন্টের সদস্যদের দ্বারা ভারতের বিমান ছিনতাইয়ের ঘটনাটিকে ঢাকায় যথেষ্ট সন্দেহের চোখে দেখা হয়েছিল। দুর্ভাগ্যজনকভাবে ঘটনার সময় জনাব ভুট্টো ঢাকায় ছিলেন। সেখান থেকে ফিরে ২ ফেব্রুয়ারি তিনি লাহোর বিমান বন্দরে ছিনতাইকারীদের সঙ্গে সাক্ষাত করেন এবং তাদের সঙ্গে সংহতি প্রকাশ করেন। এ ব্যাপারে তাঁর আরো সতর্ক হওয়া উচিত ছিল; পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে আকাশ পথে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করার অজুহাত সৃষ্টির উদ্দেশ্যে ছিনতাই ঘটনাটি ভারতের উদ্যোগেও হয়ে থাকতে পারে। ভারতের পদক্ষেপের উদ্দেশ্য ছিল পূর্ব পাকিস্তানীদের মনে ১৯৬৫ সালের যুদ্ধকালীন বিচ্ছিন্নতার স্মৃতিকে জাগিয়ে তোলা- যা পূর্ব পাকিস্তানের বুদ্ধিজীবীদেরকে পূর্ণ স্বাধীনতার দাবিটির ব্যাপারে পুনরায় গুরুত্ব আরোপ করতে উৎসাহিত করেছিল। মুজিব একে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহ্বানে বিলম্ব ঘটানোর মাধ্যমে ছয় দফাকে অবদমিত ও খর্বিত করার উদ্দেশ্যে কায়েমী স্বার্থবাদীদের ষড়যন্ত্র হিসেবে চিহ্নিত করেন। বেশি বুদ্ধিমান হিসেবে প্রশংসিত ভুট্টোর মুজিবের চাইতে পরিষ্কারভাবে ছিনতাই ঘটনার ফলাফল অনুধাবন করা উচিত ছিল। ছিনতাইকারীদের সঙ্গে তাঁর করমর্দন রাজনৈতিক উদ্দেশ্যবিহীন ছিল না। কারণ এর পরপরই বিমানটি উড়িয়ে দেয়া হয়েছিল। ভারতীয়রা তাৎক্ষণিকভাবে প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছিল এবং ভারতের ওপর দিয়ে বিমান চলাচল বন্ধ করে দিয়েছিল। পাকিস্তানকে শ্রীলংকার ওপর দিয়ে বিমান চালাতে বাধ্য করা হয়েছিল। সৌভাগ্যবশত শ্রীলংকায় তখন একটি বন্ধুত্বপূর্ণ ও বলিষ্ঠ সরকার ছিল। শ্রীলংকা অবতরণের অনুমতি না দিলে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে এই কষ্টকর আকাশ যোগাযোগও ভেঙে পড়তো কিংবা পড়ত প্রচণ্ড চাপে। পুনরায় জ্বালানি নেয়ার জন্য অবতরণ করা ছাড়া সি-১৩০ সামরিক বিমানের পক্ষে সরাসরি ঢাকা যাওয়া সম্ভব ছিল না। শ্রীলংকা এই সুবিধাটুকু দিয়েছিল।

৬ ফেব্রুয়ারি সি এম এল এ এইচ কিউ-এর ব্রিগেডিয়ার (পরবর্তীতে মেজর জেনারেল) ইস্কান্দার-উল-করিমের কাছ থেকে আমি একটি অর্ডার পেলাম। এতে বলা হয়, কতিপয় বিষয়ে ব্যাখ্যা চাওয়ার উদ্দেশ্যে প্রেসিডেন্ট জনাব মুজিবকে ইসলামাবাদে সাক্ষাতের জন্য যেতে বলেছেন। আমি মুজিবকে ফোন করলাম এবং বার্তাটি জানিয়ে জানতে চাইলাম তিনি কবে যেতে চান। কারণ তার যাওয়ার আয়োজনের দায়িত্ব আমাকে দেয়া হয়েছিল। তিনি বললেন, "আরেকটি আলোচনার দরকার কোথায়? মাত্র ক'দিন আগেই প্রেসিডেন্ট এখানে

এসেছিলেন। আমাদের মধ্যে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। যাই হোক, সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসেবে আমাদেরকে সংবিধান রচনা ও তা উপস্থাপন করতে হবে। আমি ও আমার দল এই কাজে ব্যস্ত রয়েছি। ১৪, ১৫ ও ১৬ ফেব্রুয়ারি আমার দলের নির্বাহী কমিটি খসড়া সংবিধান বিবেচনার জন্য সভায় মিলিত হতে যাচ্ছে। আমার সেখানে যাওয়ার পরিবর্তে সর্বশেষ ২১ ফেব্রুয়ারির মধ্যে প্রেসিডেন্টের বরং ঢাকা আসা উচিত, যাতে আমি তাঁকে সারসংক্ষেপ জানাতে পারি।" আমি মুজিবের কথাগুলো ব্রিগেডিয়ার করিমকে জানালাম, মুজিবের সাড়ায় তিনি খুশি হলেন না।

এদিকে মুজিবকে ইসলামাবাদে ডেকে পাঠানোর বিষয়টি মারাত্মক প্রতিক্রিয়া ঘটিয়েছিল, আওয়ামী লীগ মহলে এর কঠোর সমালোচনা করা হয়েছে। তাঁরা জোর দিয়ে বললেন যে, ভুট্টোর ষড়যন্ত্রের শিকারে পরিণত হওয়া মুজিবের উচিত নয়। তাঁদের মতে প্রেসিডেন্ট ও সেনাবাহিনী আরো একবার পশ্চিম পাকিস্তানী শোষক ও লুটেরাদের স্বার্থ ও আধিপত্য রক্ষার কাজে নেমে পড়েছে। তারা বললেন, মুজিবকে হত্যা করার জন্যই ইসলামাবাদে ডাকা হয়েছে। তাদের মতে পশ্চিম পাকিস্তানী গোয়েন্দা এজেন্সি বৈরুতে সোহরাওয়ার্দীকে হত্যা করেছিল।

ব্রিগেডিয়ার করিমের সঙ্গে তিনজন ফেডারেল মন্ত্রী মুজিবকে রাজি করানোর উদ্দেশ্যে ৯ ফেব্রুয়ারি ঢাকা এলেন, কিন্তু কাজ হল না। মুজিব ইসলামাবাদ যেতে অস্বীকার করলেন। এই অস্বীকৃতিকে অবাধ্যতার লক্ষণ হিসেবে চিহ্নিত করে তাঁর নিন্দুকরা সর্বাত্মক প্রচারণায় নেমে পড়লো। আমি আবার তাঁর সঙ্গে কথা বললাম এবং শেষ পর্যন্ত তিনি যেতে রাজি হলেন এবং অনীহার সঙ্গে জানালেন ১৯ ফেব্রুয়ারি তিনি ইসলামাবাদ পৌঁছাবেন। মুজিবের রাজি হওয়ার সংবাদ নিঃসন্দেহে ভুট্টো জানতে পেরেছিলেন। ভুট্টোর টেস্ট থিওরী ব্যর্থ হতে বসেছিল। পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ চাচ্ছিল মুজিব প্রেসিডেন্টের নির্দেশ অমান্য করুন। ১৮ ফেব্রুয়ারি প্রদত্ত এক বিবৃতিতে ভুট্টো বলে বসলেন, "পশ্চিম পাকিস্তানীদের জন্য ঢাকা কসাইখানায় পরিণত হবে এবং পশ্চিম পাকিস্তানী এম এন এ-দের 'ডাবল হোস্টেজ' বানানো হবে।" মুজিব আমাকে ফোন করলেন এবং বললেন যে, তিনি ইসলামাবাদ যাচ্ছেন না। "ঢাকা যদি পশ্চিম পাকিস্তানীদের জন্য কসাইখানা হয়, তাহলে ইসলামাবাদও পূর্ব পাকিস্তানীদের জন্য কসাইখানা হবে," তিনি বললেন। ফলে রাজনৈতিক সমঝোতার আরো একটি সম্ভাব্য সম্ভাবনা নস্যাৎ হয়ে গেল। আমরা এবার সংঘাতের সামনে পড়লাম এবং পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের সম্মুখ মোকাবিলার দিকে এগোতে থাকলাম।

প্রেসিডেন্ট ২২ ফেব্রুয়ারি সকল গভর্নর ও এম এল এ-র একটি সভা ডেকেছিলেন। পূর্ব পাকিস্তান থেকে আহসান ও ইয়াকুবের এতে যোগ দেয়ার কথা ছিল। আমাকে অবশ্য প্রেসিডেন্টের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য ক'দিন আগেই ডেকে নেয়া হয়েছিল। জেনারেল পীরজাদার সঙ্গে আমি ১৯ ফেব্রুয়ারি প্রেসিডেন্টের অফিসে তাঁর সঙ্গে দেখা করলাম।

আমাদের বৈঠকটির বিবরণী অনেকটা এরকম। আমরা বসার সাথে সাথে প্রেসিডেন্ট বলে উঠলেন, "আমি ঐ বাস্টার্ডকে শায়েস্তা করতে যাচ্ছি।" আমি বললাম, "স্যার তিনি এখন আর বাস্টার্ড নন। তিনি জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি এবং এখন সমগ্র পাকিস্তানের তিনি প্রতিনিধিত্ব করছেন।" ইয়াহিয়া সত্যিই ক্রুদ্ধ ছিলেন এবং জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত করার ব্যাপারে মন স্থির করে ফেলেছিলেন। আমি বললাম, "এর ফলে মিলিটারি অ্যাকশনে যেতে হবে।" "তাই হোক।" তিনি বললেন। আমি বললাম, "স্যার, কঠোর অ্যাকশন নেয়ার মতো আপনার চারটি সম্ভাব্য উপলক্ষ রয়েছে। আপনি এখনই তা নিতে পারেন। কিন্তু আমি সে পরামর্শ দেব না। অধিবেশন অনুষ্ঠিত হতে দিন। দ্বিতীয় উপলক্ষ তৈরি হবে যখন মুজিব তার প্রস্তাবিত সংবিধান উপস্থাপন করবেন এবং পশ্চিম পাকিস্তানী নেতারা (আপনি নন) তাকে অগ্রহণযোগ্য মনে করবেন। তখন তাঁরা আপনার কাছে আসবেন এবং আপনি অ্যাকশন নিতে পারেন। সেটাও আমি পরামর্শ দেব না। কারণ আমি মনে করি, সংসদীয় রীতিনীতি অনুসারে প্রস্তাবিত সংবিধানের প্রয়োজনীয় সংশোধনীর সকল পদক্ষেপই পশ্চিম পাকিস্তানী নেতাদের নেয়া উচিত। ধরা যাক, পার্লামেন্টে সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোর খাটানো হলো এবং পশ্চিম পাকিস্তানের মতামত বিবেচনা না করেই সংবিধান পাস হয়ে গেল। সেটা আপনার স্বাক্ষরের জন্য আপনার কাছে আসবে। আপনি স্বাক্ষর দিতে অস্বীকার করতে এবং মিলিটারি অ্যাকশন নিতে পারেন। আমি সেটাও পরামর্শ দেব না। আমি সুপারিশ করব, আপনি মুজিবের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করুন। আমি আশ্বাস দিতে পারি যে, ছ' মাসের মধ্যে মুজিব পূর্ব পাকিস্তানে সবচেয়ে অজনপ্রিয় মানুষে পরিণত হবেন।"

প্রেসিডেন্ট আমার পরামর্শগুলো গ্রহণ করলেন না এবং কঠোর অ্যাকশনের ব্যাপারেই জোর দিলেন। বোঝাতে ব্যর্থ হয়ে আমি বললাম, "কঠোর অ্যাকশনের ক্ষেত্রে আপনাকে অবশ্যই ভারসাম্যপূর্ণ হতে হবে এবং পশ্চিম পাকিস্তানী নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধেও কিছু অ্যাকশন নিতে হবে।" আমি আরো বললাম, "আমি দেখেছি পূর্ব পাকিস্তানে আপনার অ্যাকশন যদি আকস্মিক ও কঠোর না হয় তাহলে পরিস্থিতির অবনতি ঘটে এবং তা নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়।" আপনি যদি অ্যাকশনের সিদ্ধান্ত নেন, যেমনটি নেয়ার আপনি পরিকল্পনা করছেন, তাহলে অনুগ্রহ করে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড, জনসভা ইত্যাদির ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করুন এবং উভয় প্রদেশেই সংবাদপত্রের ওপর সেন্সরশীপ দিন। তা না করা হলে পরিস্থিতির নিয়ন্ত্রণ করা অসম্ভব হয়ে পড়বে।" আমার পরামর্শগুলোর সঙ্গে তিনি একমত হলেন, কিন্তু সেগুলো বাস্তবায়ন করলেন না। তিনি যা করলেন তা হল পরিষদের অধিবেশন মুলতবিকরণ।

সাক্ষাৎকারের শেষে আমি একান্তে কথা বলতে চেয়ে অনুরোধ জানালাম। এখানে আসার আগে মুজিবের সঙ্গে আমার কথা হয়েছে এবং সেগুলো আমি প্রেসিডেন্টকে জানাতে

চাইলাম। জেনারেল পীরজাদা চলে গেলেন, আমরা দু'জন রইলাম। এবার আমি প্রেসিডেন্টকে বললাম যা মুজিব বলেছিলেন, "ভুট্টোর সঙ্গে আমার কোনো মত পার্থক্য নেই। ছয় দফার প্রশ্নেও কোনো মতপার্থক্য নেই। আমরা দু'জনই রাজনীতি থেকে আর্মিকে তাড়াতে চাই। অনেক বেশি সময় ধরে তারা দেশকে শাসন করছে। পার্থক্যটি হল, আমি চাই আর্মি ক্ষমতা থেকে সরে যাক, আর ভুট্টো চান আর্মি ধ্বংস হয়ে যাক। তিনি ছয় দফার ব্যাপারে একমত হয়েছেন। কিন্তু তিনি ক্ষমতায় ভাগ চান। আমাদের মধ্যে আলোচনাকালে ভুট্টো প্রস্তাব দিয়েছেন, যেহেতু প্রধান মন্ত্রী হবেন পূর্ব পাকিস্তান থেকে, তাই পশ্চিম পাকিস্তান থেকে প্রেসিডেন্ট করা হোক। আপনি (মুজিব) যেহেতু পূর্ব পাকিস্তানের নেতা হিসেবে প্রধান মন্ত্রী হবেন, তাই পশ্চিম পাকিস্তানের নেতা হিসেবে আমাকে (ভুট্টো) প্রেসিডেন্ট মনোনয়ন করতে দিতে হবে- এটাই ভুট্টো বলেছিলেন। আমি (মুজিব) বলেছি, আমি তাঁকে তা করতে দিতে পারি না। আমি এখন সমগ্র পাকিস্তানের নেতা এবং সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা হিসেবে প্রেসিডেন্ট মনোনয়নের অধিকারটুকু আমার হাতে থাকবে- অবশ্য প্রেসিডেন্টকে নিঃসন্দেহে পশ্চিম পাকিস্তান থেকেই নেয়া হবে। আমি তাঁকে একথাও বলেছি যে, আমি ইতিমধ্যেই একজনকে পদটির ব্যাপারে কথা দিয়ে ফেলেছি। ভুট্টো জবাবে বলেছেন, "এমন যদি হয়, আপনার মনে যাঁর কথা রয়েছে আমিও তাঁকেই মনোনয়ন দিতে চাই। আমি বলেছি, তাহলেও আমি আমার কর্তৃত্ব ও দায়িত্ব বিসর্জন দিতে পারি না।" এরপর মুজিব বলেছেন, "ফরমান, আপনি জানেন তাঁকে প্রেসিডেন্ট মনোনয়ন করতে দিলে কি ঘটত? তিনি নিজেকেই মনোনীত করতেন এবং তারপর দশ দিনের মধ্যেই আমাকে বরখাস্ত করতেন।"

এই কাহিনীর বর্ণনা দিয়ে মুজিবের ব্যাপারে তাঁর সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার জন্য আমি প্রেসিডেন্টকে বললাম। তিনি যাকে মুজিবের বিশ্বাস ভঙ্গ বলে ভেবেছেন, সে কারণে আগেই তিনি নিরাশ হয়েছিলেন। তিনি তাই বললেন, "আমি তাকে বিশ্বাস করি না।" আমি যাওয়ার জন্য উঠে দাঁড়ালাম। অপ্রত্যাশিতভাবে আমাকে বিদায় জানাতে প্রেসিডেন্ট দরজা পর্যন্ত এলেন এবং যা তিনি বললেন তা আমাকে নাড়া দিলো, "আমি আমার নিজের জন্য ভীত নই। পশ্চিম পাকিস্তান আমার ভিত্তি। আমাকে এর প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে।" আমি বুঝলাম এবং আমার এই অনুভূতি হল যে, ভুট্টোর কথামতো কাজ করার জন্য তিনি পশ্চিম পাকিস্তানী জেনারেলদের প্রচণ্ড চাপে রয়েছেন। রাজনীতির প্রাথমিক দিনগুলো থেকেই জনাব ভুট্টো সিনিয়র আর্মি অফিসারদের সঙ্গে বিশেষভাবে বন্ধুত্ব তৈরি করেছিলেন। আইউবের কাছ থেকে ক্ষমতা নিতে তিনি ইয়াহিয়াকে প্ররোচিত করেছেন এবং অন্যদের সঙ্গেও তাঁর নিয়মিত যোগাযোগ চলছিল। ইয়াহিয়ার ভীতির পেছনে কারণ হিসেবে ছিল তিনি ঢাকায় অবস্থানকালে দেশব্যাপী প্রচারিত সেই কথাটি যে, হামিদ ইয়াহিয়ার কাছ থেকে ক্ষমতা দখল করে নিয়েছেন। সকল অনুষ্ঠানে ইয়াহিয়ার সঙ্গে অসামরিক পোশাকে

হামিদের উপস্থিতিও একে শক্তিশালী করেছিল। ঢাকায় বিবিসি-র প্রতিনিধি সুনির্দিষ্টভাবে ইয়াহিয়াকে প্রশ্ন করেছিলেন যে, তিনি এখনো ক্ষমতায় আছেন কিনা। এর জবাবে ইয়াহিয়া বলেছিলেন, "আমি এখনো ক্ষমতায় আছি।" এইচকিউসিএমএলএ সফরকালে ব্রিগেডিয়ার হায়দার জংকে, যিনি ব্রিগেডিয়ার এমএল অ্যাফেয়ার্স ছিলেন, আমি গল্পটি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলাম। তিনি আমাকে বলেছেন যে, লাহোরের এইচকিউএমএলএ বিষয়টি সম্পর্কে ব্যাপকভাবে তদন্ত করেছে। এতে জানা গেছে, একদিন মধ্যরাতে এপিপি-র জনাব মাহমুদকে ফোন করে জনাব মাহমুদ আলী কাসুরী বলেন, ইয়াহিয়ার কাছ থেকে হামিদ ক্ষমতা দখল করেছেন। যখন জানতে চাওয়া হয় যে, খবরটি তাঁর বস (অর্থাৎ ভুট্টো) -এর কাছ থেকে এসেছে কি না, তখন তিনি বলেন: হ্যাঁ। সুতরাং গল্পটি ছড়িয়ে পড়তে থাকে। লারকানার পুনর্মিলনীতে প্রদর্শিত হামিদ ও ভুট্টোর ঘনিষ্ঠতাও হুমকিটিকে সত্য হিসেবে সামনে এনেছিল।

দেশের সংবিধান প্রণয়ন করার জন্য ৩ মার্চ জাতীয় পরিষদের অধিবেশনের তারিখ নির্ধারিত ছিল। নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিল, সশস্ত্র বাহিনী তাদের দিক থেকে সম্মান ও নিরপেক্ষতা সহকারে দায়িত্ব পালন সম্পন্ন করেছিল। কিন্তু প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া একটি ভুল করলেন। তিনি প্রেসিডেন্টের অফিসকে কেড়ে নেয়ার সুযোগ দিলেন। পাকিস্তানের দুই প্রদেশের সমান অধিকারের নামে এর ফলে সংঘাত সূচিত হল। আমরা একটি নতুন তত্ত্ব উচ্চারিত হতে দেখলাম। তত্ত্বটির পুরোপুরি ইঙ্গিত ছিল, এক দেশের জন্য দু'জন প্রধান মন্ত্রীর ব্যবস্থা করা। একজন পূর্ব পাকিস্তানের এবং অন্যজন পশ্চিম পাকিস্তানের। একটি মার্কিনী সংবাদ সংস্থার পক্ষ থেকে প্রচারিত খবরে জানানো হল যে, এর প্রতিনিধির সঙ্গে সাক্ষাৎকারে জনাব ভুট্টো দু'জন প্রধান মন্ত্রী রাখার প্রস্তাব দিয়েছেন। আওয়ামী লীগও এ ধরনের ইঙ্গিত দিয়েছিল এবং পরবর্তীকালে আনুষ্ঠানিকভাবে দুটি গণপরিষদের দাবি জানিয়েছিল- দুটি সংবিধান এবং দুটি সরকার-একটি কনফেডারেশনের খুব কাছাকাছি। দু'প্রদেশের রাজনৈতিক নেতৃত্বই অমীমাংসনীয় মনোভাব গ্রহণ করেছিলেন। ইয়াহিয়া পড়েছিলেন উভয় সংকটের মধ্যে। তিনি যদি পশ্চিম পাকিস্তানের পক্ষ নেন তাহলে সেনাবাহিনীকে পশ্চিম পাকিস্তান হিসেবে চিহ্নিত করা হবে এবং পূর্ব পাকিস্তানে তাঁকে অভ্যুত্থান মোকাবিলা করতে হবে। আর যদি তিনি পূর্ব পাকিস্তানী নেতাদের সমর্থন দেন তাহলে সক্রিয় সেই জেনারেলরা তাঁকে উৎখাত করবেন- যাঁরা ভুট্টোর সঙ্গে ছিলেন এবং যারা পূর্ব পাকিস্তানী আধিপত্যের বিরুদ্ধে 'ক্রুসেডে' জনাব ভুট্টোকে সর্বতোভাবে সমর্থন দিচ্ছিলেন। "আমরা পূর্ব পাকিস্তানকে আমাদের ওপর শাসন চালাতে দেব না-" ছিল পশ্চিম পাকিস্তানের গৃহীত মূল সুর।

যদি দু'জন প্রধান মন্ত্রীর ব্যবস্থা না করা হয় তাহলে প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেন্ট পদে নিজের মনোনীত কাউকে দেয়ার মাধ্যমে জনাব ভুট্টো কেন্দ্রীয় সরকারে ক্ষমতার ভাগ চেয়েছিলেন

মনোনীত ব্যক্তিটি হতেন তিনি নিজে। জনাব জি ডব্লিউ চৌধুরী যেমনটি বলেছেন, "রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে তখন দুটি পি (P) পাওয়া যেত। একটি পি পাকিস্তানের জন্য এবং অন্য পি পাওয়ার বা ক্ষমতার জন্য। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের উভয় নেতৃবৃন্দই পাওয়ার বা ক্ষমতার পি-কে বেছে নিয়েছিলেন।

১০ ফেব্রুয়ারি দু'ঘণ্টাব্যাপী বৈঠককালে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়াকে এ কথা বোঝাতে আমি ব্যর্থ হয়েছিলাম যে, জাতীয় পরিষদের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতার কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের মাধ্যমে রাজনৈতিক প্রক্রিয়াকে তার আপন পথে সমাপ্তির দিকে এগোতে দেয়া উচিত। আমি বেরিয়ে এসে পীরজাদার কক্ষে গেলাম এবং প্রেসিডেন্টকে মন পরিবর্তন করতে বোঝানোর জন্য তাঁকে অনুরোধ করলাম। তিনি গেলেন এবং ফিরে এসে বললেন যে, প্রেসিডেন্ট তাঁর মন পরিবর্তন করতে চান না। পীরজাদা এরপর আমাকে প্রশ্ন করলেন, "কি করা উচিত বলে আপনি মনে করেন?" আমি উর্দুতে বললাম, "ঝাউ-পরী মিল রাহি হ্যায়, মাহাল নাহি মিল রাহা, ঝাউ-পরী লে লাই।'

তিনি ইংরেজীতে বললেন, "আপনি কি বোঝাতে চান?" আমি বললাম, "আমরা শক্তিশালী না পেলেও একটি দুর্বল কেন্দ্রীয় সরকার পেতে পারি। কাঁচা দাগা নিয়ে হলেও পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে সম্পর্ক রাখার জন্য আমাদের চেষ্টা করা উচিত। পূর্ব পাকিস্তানের যখন পরবর্তীকালে আমাদের সহযোগিতার প্রয়োজন পড়বে, তখন আমরা বন্ধনকে শক্তিশালী করতে পারব।

২১/২২ ফেব্রুয়ারি গভর্নর ও এম এল এ-দের সভাটি অনুষ্ঠিত হল। আমি যেহেতু কোনো গভর্নর বা এম এল এ ছিলাম না, তাই আমাকে এতে উপস্থিত থাকতে দেয়া হয়নি। কিন্তু সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত আমাকে উত্তেজিত করে তুলল। সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোট পাওয়ার পরও মুজিবের সঙ্গে মোকাবিলা মারাত্মক ঝামেলার সৃষ্টি করবে এবং এর ফলে পাকিস্তানের সংহতির ক্ষতি হতে পারে। প্রভাবশালী বেশ কিছু ব্যক্তির সঙ্গে আমি দেখা করলাম। তাঁরা একমত হলেন যে, পরিস্থিতি খুব সংকটপূর্ণ, কিন্তু সঠিক পদক্ষেপ নিতেও তাঁরা অনীহা প্রকাশ করলেন। মরিয়া হয়ে আমি ওমরের হালিস্ট্রিটের বাসায় গেলাম। তিনি ন্যাশনাল সিকিউরিটির প্রধান ছিলেন এবং ইয়াহিয়া ও হামিদ উভয়েরই বিশ্বাসভাজন ছিলেন। আমি প্রায় এক ঘণ্টা ধরে আমার অভিমত ব্যাখ্যা করলাম এবং দেশের ভবিষ্যত সম্পর্কে আমার উদ্বেগগুলো জানালাম। যাঁরা ক্ষমতায় ছিলেন সেই সব ব্যক্তির সঙ্গে আমার কেবল অফিসিয়াল মেলামেশা ও সম্পর্ক ছিল। তাঁদেরকে প্রভাবিত করার মতো ব্যক্তিগত পর্যায়ের কোনো বোঝাপড়া বা ইকুয়েশন আমার ছিল না। ওমর তাঁদের ঘনিষ্ঠ ছিলেন। আমি অনুরোধ জানালাম, কাকুতি-মিনতি করলাম এবং প্রকৃতপ্রস্তাবে ভিক্ষাও চাইলাম যাতে তিনি অত্যাসন্ন ট্র্যাজেডি এড়ানোর ব্যাপারে নিজের প্রভাবকে কাজে লাগান। তিনি প্রতিশ্রুতি দিলেন। প্রতিশ্রুতি অনুসারে তিনি হয়তো চেষ্টাও করেছিলেন, কিন্তু তিনিই ছিলেন সেই

তাঁদের একজন যারা সংলাপ ব্যর্থ হওয়ার পর ঢাকায় মিলিটারি অ্যাকশন নিতে ইয়াহিয়াকে চাপ দিয়েছিলেন। তিনি নিজেই আমাকে বলেছেন যে, তাঁকে ছাড়া ইয়াহিয়া মিলিটারি অ্যাকশন নিতেন না। সুতরাং আমার সকল কাকুতি-মিনতি নিষ্ফল হয়েছিল।

কানা গলিতে

গভর্নর ও এম এল এ-দের ২২ ফেব্রুয়ারির সভায় যোগদানের উদ্দেশ্যে আমরা ইস্ট পাকিস্তান হাউসে অবস্থান করছিলাম, যেখানে এখন সুপ্রিম কোর্ট অবস্থিত। গভর্নর আহসান ও এম এল এ ইয়াকুব ছিলেন গভর্নরস সুইটে, আমি ছিলাম ভি আইপি উয়িং–এ। সভার পরদিন, ২৩ ফেব্রুয়ারি খুব সকালে আহসান ও ইয়াকুব আমাকে ডেকে পাঠালেন। দু'জনকেই সম্ভবত সারা রাত জাগিয়ে রাখা হয়েছিল। তাঁরা পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করছিলেন। সভার সংক্ষিপ্ত বিবরণীসহ আমাকে জানানো হল যে, জাতীয় পরিষদের অধিবেশন মুলতবি করার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। আমার আশু প্রতিক্রিয়া ছিল, 'তার অর্থ মিলিটারি অ্যাকশন'। আমি যা অনুমান করেছিলাম, ইয়াকুব তার সঙ্গে একমত হলেন। আমাদের তিনজনই এ ব্যাপারে একমত হলাম যে, সিদ্ধান্তটি ভুল হয়েছে। আমরা আমাদের এই অভিমত লিখিতভাবে প্রেসিডেন্টকে জানানোর সিদ্ধান্ত নিলাম। আহসান ও আমার সহযোগিতা নিয়ে ইয়াকুব জেনারেল পীরজাদার কাছে একটি চিঠি লিখলেন। চিঠিতে একথা পরিষ্কারভাবে বলা হল যে, মিলিটারি অ্যাকশন নেয়া হলে ভারতের হস্তক্ষেপ ঘটবে; মিলিটারি অ্যাকশনের ফলে সৃষ্ট পরিস্থিতির সুযোগ নিতে ভারতীয়রা ভুল করবে না এবং সম্পূর্ণ সুযোগই তারা কাজে লাগাবে। যে কেউ প্রশ্ন করতে পারেন, আহসান ও ইয়াকুব কেন আগের রাতে অনুষ্ঠিত সভায় বলিষ্ঠভাবে নিজেদের অভিমত ব্যক্ত করেন নি। আমাদের যুক্ত চিঠি পাওয়ার পর ইয়াহিয়া ও পীরজাদার মনেও হয়তো একই প্রশ্ন দেখা দিয়েছিল। তাঁরা নিশ্চয়ই ভেবেছেন যে, এই প্রতিক্রিয়ার জন্য আমি দায়ী ছিলাম। আমাকে ঢাকা ফিরে যাওয়ার নির্দেশ দেয়া হল। সেদিনই আমি চলে এলাম।

আহসান ও ইয়াকুবও ২৭ফেব্রুয়ারি ঢাকা ফিরে এলেন। আমি চলে আসার পর কি ঘটেছিল জানতে চাইলে তাঁরা আমাকে বললেন, প্রেসিডেন্ট তাঁদের ডেকে নিয়ে বলেছিলেন, "আমি আপনাদের অভিমত গ্রহণ করতে রাজি আছি। কিন্তু জনাব ভুট্টোকে গিয়ে বুঝিয়ে

আসুন। তিনিই মুলতবি করার জন্য চাপ দিচ্ছেন।' এ কথার পর তাঁরা দু'জনই করাচী গেলেন এবং জনাব ভুট্টোর সঙ্গে দেখা করলেন। তাঁদের কথানুসারে জনাব ভুট্টো বলেছিলেন, 'পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিক্রিয়া নিয়ে আপনাদের উদ্বিগ্ন হওয়ার কারণ নেই। আওয়ামী লীগ একটি বুর্জোয়া দল। এটা সাধারণ মানুষের দল নয়। এই দল গেরিলা যুদ্ধ চালাতে পারবে না। পূর্ব পাকিস্তানে কোনো সহিংস সংঘাত ঘটবে না'' ইত্যাদি।

আহসান ও ইয়াকুব করাচী ফিরে প্রেসিডেন্টকে তাদের মিশনের ব্যর্থতার খবর জানালেন। তাঁদেরকে ঢাকা ফিরে যেতে এবং সেখানে গিয়ে ২৮ ফেব্রুয়ারি মুজিবকে একথা জানাতে বলা হল যে, ১ মার্চ অধিবেশন মুলতবির ঘোষণা দেয়া হবে। এর প্রতিক্রিয়ায় আমি বললাম, "প্লিজ, তাঁদের আগেই সতর্ক করবেন না। তাহলে এর মধ্যেই তারা সম্পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে ফেলবেন।" কিন্তু গভর্নর আহসানকে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। ২৮ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যায় মুজিব, তাজউদ্দিন ও কামাল হোসেন তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এলেন। আহসান তাঁদেরকে অনির্দিষ্টকালের জন্য জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত সংক্রান্ত প্রেসিডেন্টের সিদ্ধান্তের কথা জানালেন। তাজউদ্দিনের প্রতিক্রিয়া ছিল তীক্ষ্ণ ও তীব্র। তিনি বললেন, "আমরা সব সময়ই জানতাম যে, আপনারা সাংবিধানিক পন্থায় আমাদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করবে না।" যা হোক, সবার মুখেই তখন বিষাদ এবং মন-মরা ভাব, ফলে সেদিন আর দীর্ঘ আলোচনা সম্ভব ছিল না। খানিক বিরতির পর মুজিব তাঁর দুই সহকর্মীকে বাইরে যেতে বললেন। তাঁরা যাওয়ার পর তিনি বললেন, "প্লিজ, আমাকে একটি নতুন তারিখ দিন। আমি জনতাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারব।" মুজিব যদি বিচ্ছিন্নতা চাইতেন তাহলে এই মুলতবি তাঁর জন্য একটি উপযুক্ত পরিস্থিতির কারণ ঘটাত। তিনি একে নিজের স্বার্থে ব্যবহার করতে পারতেন। কিন্তু নতুন একটি তারিখের জন্য তাঁর অনুরোধ এ তথ্যই তুলে ধরে যে, তাঁর প্রথম অগ্রাধিকার ছিল পাকিস্তানের প্রধান মন্ত্রী হওয়া।

মুজিব চলে যাওয়ার পর আমরা তিনজন শলা-পরামর্শের জন্য মিলিত হলাম এবং সিদ্ধান্তটির মারাত্মক প্রতিক্রিয়া নিয়ে আলোচনা চালাতে থাকলাম। আমাদের মত ছিল "একবার একটি বুলেট চালানো মাত্রই পূর্ব পাকিস্তান চলে যাবে।" আমরা সংঘাত এড়াতে চাইলাম এবং আরো একবার প্রেসিডেন্টকে আমাদের অভিমত জানানোর সিদ্ধান্ত নিলাম। কিন্তু সবচেয়ে সংবেদনশীল ও বিস্ফোরণোন্মুখ প্রদেশের গভর্নর হয়েও এবং মরিয়া প্রচেষ্টার পরও আহসান প্রেসিডেন্টের সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলতে সক্ষম হলেন না। ফলে একটি সিগন্যাল পাঠাতে হল। অনেক অসুবিধার মধ্য দিয়ে জেনারেল হামিদকে শিয়ালকোটে পাওয়া গেল, আমরা তাঁকে জাতীয় পরিষদের অধিবেশনের একটি নতুন তারিখের জন্য আমাদের আবেদন প্রেসিডেন্টকে জানানোর অনুরোধ করলাম। কিন্তু কোনো সাড়া পাওয়ার কিছু তখন আর ছিল না; নতুন তারিখ আর ঘোষিত হওয়ার মতো অবস্থা ঐ সংকটময় দিনটিতে ছিল না।

১ মার্চের দুপুরে যখন পরিষদের অধিবেশন মুলতবি সংক্রান্ত ঘোষণাটি প্রচারিত হল, তখন প্রত্যেক বাংগালীর প্রতিক্রিয়া ছিল সহিংস এবং সকলের ভেতরেই বিশ্বাসঘাতকতার শিকার হওয়ার মারাত্মক অনুভূতির সৃষ্টি হয়েছিল। সমগ্র বাংগালী জাতিই এবার যুদ্ধের পথে নেমে গিয়েছিল। ঘোষণাটির মধ্য দিয়ে ছাঁচ তৈরি করা হয়ে গিয়েছিল। আমার মনে কোনো সন্দেহ নেই যে, অধিবেশন মুলতবি করার ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে ১ মার্চেই পাকিস্তানের ভাঙন ঘটেছিল। পরবর্তীকালের ঘটনাবলী ছিল প্রধান ঘটনার অনুসরণ মাত্র।

দুপুর একটা পাঁচ মিনিটে রেডিওতে ঘোষণা প্রচারিত হওয়ার পর কয়েক মিনিটের মধ্যে সকল স্তরের মানুষ কাজ বন্ধ করে দিয়ে হোটেল পূর্বাণীর বাইরে সমবেত হতে শুরু করেছিল যেখানে শেখ মুজিব ও তাঁর দলের এম এন এদের অধিবেশন চলছিল। জনতা বাঁশ, লাঠি, তীর, লোহার রড প্রভৃতিতে সজ্জিত ছিল। ঢাকা ক্রিকেট স্টেডিয়ামে বিসিসিপি একাদশ ও আন্তর্জাতিক একাদশের মধ্যকার খেলার দর্শকরা ঘোষণার বিরুদ্ধে তীব্রভাবে প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছিল। তারা মাঠে ঢুকে গিয়ে মুলতবির বিরুদ্ধে শ্লোগান দিতে থাকে এবং অবিলম্বে খেলা বন্ধ করার দাবি জানায়। এই দাবি দ্রুত মান্য হয় এবং খেলোয়াড়দের প্রহরা দিয়ে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেয়া হয়। প্রাদেশিক সচিবালয়ের সকল স্টাফ কাজ বন্ধ করে দিয়ে সাথে সাথে বেরিয়ে আসে। ঢাকা হাইকোর্টের আইনজীবীরা মিছিল বের করেন। শ্লোগান মুখরিত ছাত্রদের সঙ্গে সকল আন্দোলনকর্মী একযোগে হোটেল পূর্বাণীর দিকে চলে আসে, তারা শেখ মুজিবুর রহমানের কথা শুনতে চায়। বিকেল সাড়ে তিনটায় অনুষ্ঠিত সাংবাদিক সম্মেলনে মুজিব জাতীয় পরিষদের অধিবেশন মুলতবি করার সিদ্ধান্তকে সর্বাত্মকভাবে চ্যালেঞ্জ করার প্রতিজ্ঞা ঘোষণা করেন। তিনি ২ মার্চ ঢাকায় এবং ৩ মার্চ সারা প্রদেশে হরতাল আহ্বান করেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল নিজের শক্তি পরিমাপ করা এবং প্রেসিডেন্টের ঘোষণার বিরুদ্ধে জনগণের প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে প্রশাসনকে বোঝানো। পরে, সেদিন বিকেলে পল্টন ময়দানে জনতা সমবেত হয়। এখানে ছাত্রলীগের প্রাক্তন সভাপতি ও নবনির্বাচিত এম এন এ তোফায়েল আহমদ ও আওয়ামী লীগের শ্রমিক সংগঠন, জাতীয় শ্রমিক লীগের আবদুল মান্নান ভাষণ দেন। জনতার জঙ্গী মেজাজ থেকে এ কথা তখন পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল যে, তারা আর শুধু ভাষণে সন্তুষ্ট নয়, তারা চায় অ্যাকশন। কিছু দুষ্কৃতকারী জিন্নাহ এভিনিউতে অস্থানীয়দের সম্পদে অগ্নিসংযোগ করে। এর পরপর নওয়াবপুর এলাকায় লুটপাটের ঘটনা ঘটে। এর চেয়েও ভয়ংকর খবর আসে নারায়ণগঞ্জ রাইফেল ক্লাব থেকে। ছাত্রদের একটি দল সেখান থেকে সাতটি রাইফেল ও ৩০০ রাউন্ড গুলী জোর করে ছিনিয়ে নেয়। পিআইএ-র কর্মচারিরাও কাজ বন্ধ করে দেয়, যার ফলে অভ্যন্তরীণ বিমান চলাচল অচল হয়ে পড়ে। সন্ধ্যার দিকে নগরীর বিভিন্ন স্থানে জনগণকে ছোট ছোট গ্রুপে বিভক্ত হয়ে জমায়েত হতে দেখা যায়, রাত্রি হওয়ার পর অবশ্য তারা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে।

একটি অস্বস্তিকর পরিবেশে এবং অস্থানীয়দের মনে নির্যাতনের আশংকা সৃষ্টির মধ্য দিয়ে ১ মার্চ অতিক্রান্ত হয়। দিনটি পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর অ্যাডমিরাল এস এম আহসানের বহিষ্কারও প্রত্যক্ষ করেছিল; এম এল এ জেনারেল ইয়াকুবকে গভর্নর হিসেবে অতিরিক্ত দায়িত্ব পালনের নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। যে আচরণের মাধ্যমে আহসানকে সরানো হয়েছিল, তা এক তিক্ত স্মৃতির কারণ হয়ে রয়েছে। তিনি একটি নতুন তারিখের অনুরোধ জানিয়েছিলেন। জবাবের প্রতীক্ষায় আহসান, ইয়াকুব ও আমি গভর্নর হাউসে পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করছিলাম। সময় ছিল ১ মার্চের রাত প্রায় দশটা। টেলিফোন বেজে উঠলো। আহসান ওঠালেন। অপর প্রান্তে ছিলেন জেনারেল পীরজাদা, তিনি ইয়াকুবকে দিতে বললেন। আহসান ইয়াকুবকে হ্যান্ডসেটটি দিলেন, যিনি কথাশেষে ফোন নামিয়ে রেখে বললেন, "আমি এখন গভর্নর।" আহসান বললেন, "চমৎকার!" নীরবতা নেমে এলো। আহসান চিন্তা করতে করতে উচ্চ কণ্ঠে বললেন, "গোছানোর জন্য আমি কিছু সময় নেব। আমি চট্টগ্রাম যাওয়ার জন্য একটি নৌযান নেব। আমার বইপত্র বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে রয়েছে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমি এই হাউস ছেড়ে দেব।' ইয়াকুব কোনো সান্ত্বনার কথা বললেন না। আমি আশা করেছিলাম, তিনি অন্তত বলবেন, "না, আহসান, আমার গভর্নর হাউসের লিভিং রুমগুলোর দরকার নেই। যতদিন ইচ্ছা আপনি এখানে থাকুন" ইত্যাদি। সম্ভবত তিনি তাঁর নিজের ভাবনা নিয়ে বেশি ব্যস্ত ছিলেন। ইয়াকুব সেনানিবাসের উদ্দেশে চলে গেলেন। তাঁকে সেনানিবাস পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে আমি আবার আহসানের কাছে ফিরে এলাম, যিনি তখন তাঁর রুমে চলে গিয়েছিলেন। আমি দেখলাম তিনি তাঁর জিনিসপত্র এক স্থানে থেকে নিয়ে অন্য এক স্থানে জড়ো করছেন। তিনি তাঁর ভাবনার খেই হারিয়ে ফেলেছিলেন। প্রথম কথা হল, তিনি গভর্নর হতে চাননি। প্রেসিডেন্ট এভাবে কেন তাঁকে অপমানিত করলেন? এটাই কি সেই মানুষদের ভাগ্য, যারা তাদের সর্বোচ্চ সততা ও বিশ্বস্ততার সঙ্গে দেশের সেবা করে থাকেন?

তাঁর ভাবনায় ব্যাঘাত ঘটিয়ে আমি বলাম, "স্যার, আমরা আপনার পশ্চিম পাকিস্তান যাওয়ার আয়োজন না করা পর্যন্ত আপনি কোথাও যাচ্ছেন না। আপনি এখানেই থাকুন।" গভর্নর হাউস থেকে চলে যাওয়ার সময় আহসান যে রকম বিদায় সংবর্ধনা পেয়েছিলেন, তেমনটি পেতে যে কেউই পছন্দ করবেন। ৪ মার্চ হেলিকপ্টারযোগে তিনি যখন চলে যাচ্ছিলেন তখন স্টাফের সকল সদস্যই কাঁদছিল।

২ মার্চের সকাল এসেছিল জঙ্গী ছাত্র ও শ্রমিকদের তৎপরতার মধ্য দিয়ে, ঢাকা নগরীর রাজপথের বিভিন্ন স্থানে তারা প্রতিবন্ধক তৈরি করেছিল। 'হরতাল' সফল করার সকল আয়োজন করা হয়েছিল এবং তা ব্যাপকভাবে সফলও হয়েছিল। রাজপথে কোনো যানবাহন চলতে পারেনি, কেউ ব্যবসা-বাণিজ্য করতে পারেনি এবং সরকারি-বেসরকারি

কোনো অফিসে কোনো কাজ হয়নি। সে ছিল এক সর্বাত্মক 'হরতাল'। বিভিন্ন স্থান থেকে বিরাট বিরাট মিছিল বেরিয়েছে। দুপুরের দিকে একটি পথ হারানো সেনাবাহিনীর গাড়ি যখন ফার্মগেটে রাস্তা পরিষ্কার করছিল, তখন সেটা বিপরীত দিক থেকে আগত জনতার সামনে পড়ে যায়। প্রদেশে নবাগত জওয়ানরা তাদের ইটপাটকেল কবলিত হয়। এর ফলে ৩/৪টি ফাঁকা গুলী ফোটাতে হয়। ঘটনাক্রমে একই এলাকায় একজন ছাত্র তার প্রশিক্ষকের '২২ রাইফেলের গুলীতে নিহত হয়। ছাত্ররা ঘটনাটিকে পুঁজি বানায় এবং মৃত ছাত্রের রক্তরঞ্জিত সার্ট ও দেহ দেখিয়ে সেনাবাহিনীকে হত্যাকাণ্ডের জন্য অভিযুক্ত করে। এই ঘটনা ভাবাবেগকে উস্কে দেয়। ছাত্ররা জাতীয় পরিষদের অধিবেশন মুলতবি করার এবং সেনাবাহিনীর পাশবিক শক্তি প্রয়োগের বিরুদ্ধে নিন্দা জানিয়ে সভা করে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ইকবাল হলকে 'সার্জেন্ট জহুরুল হক হল' এবং জিন্নাহ হলকে 'সূর্য সেন হল' নামকরণ করা হয়। জাতীয় পতাকা ও কায়েদে আযমের ছবি পোড়ানো হয়। 'স্বাধীন বাংলা'র পতাকা উত্তোলন করা হয় এবং এর অনুসরণে সবিচালয় ও হাই কোর্টসহ অন্য অনেক সরকারি ভবন থেকে জাতীয় পতাকা নামিয়ে ফেলা হয়। দুষ্কৃতকারীরা সৃষ্ট পরিস্থিতির সুযোগ নেয় এবং বিকেলের মধ্যে তারা অনেক অবাংগালীর দোকান লুট করে এবং পুড়িয়ে দেয়। কিছু অবাংগালীর বাড়ি-ঘরও তছনছ করা হয়। সবার জন্য মুক্ত এই পরিবেশের মধ্যে ন্যাপ (মোজাফফর গ্রুপ) পল্টন ময়দানে এবং বেঙ্গল ন্যাশনাল লীগ বায়তুল মোকাররমে জনসভা করে। অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ ও মিসেস মতিয়া চৌধুরী ন্যাপের জনসভায় এবং জনাব আতাউর রহমান ও মিসেস আমেনা বেগম বি এন এল-এর জনসভায় ভাষণ দেন। এই সব জনসভায় দেয়া অগ্নিবর্ষী ভাষণ দুষ্কৃতকারীদের আরো উৎসাহিত করেছিল। জনসভা শেষে বাড়ি ফেরার পথে তারা জিন্নাহ এভিনিউ, নওয়াবপুর রোড, ঠাটারী বাজার, কাকরাইল, শান্তিনগর প্রভৃতি এলাকায় অস্থানীয়দের দোকান লুট ও সেগুলোতে অগ্নিসংযোগ করতে শুরু করে। বায়তুল মোকাররমের একটি অস্ত্রের দোকান লুট হয়ে যায়। এসব এলাকায় অস্থানীয়দের মধ্যে আতংক বিরাজ করতে থাকে। অন্ধকার হওয়ার পর পরিস্থিতি পুলিশের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। ফলে শেষ অবলম্বন হিসেবে এবং পুলিশের আইজি, স্বরাষ্ট্র সচিব ও চিফ সেক্রেটারির নির্দেশে ২ মার্চ রাত ৯টা থেকে ৩ মার্চ সকাল ৭টা পর্যন্ত নগরীতে কার্ফিউ জারি করা হয়। কিন্তু অসংখ্য সড়ক প্রতিবন্ধকের কারণে ট্রুপস রাত সাড়ে দশটার আগে নির্দিষ্ট স্থানগুলোতে পৌঁছাতে পারেনি। সেনাবাহিনীর কথিত নির্যাতন প্রতিরোধ করার জন্য নাকি শেখ মুজিব জনগণকে নির্দেশ দিয়েছিলেন এবং সে কারণে বেশ কিছু স্থানে কার্ফিউ অমান্য করা হয়েছিল। মুলতবি করার পেছনে সতোদ্দেশ্য রয়েছে- প্রেসিডেন্টের এই বার্তা তাঁর কাছে পৌঁছে দেয়ার পরও মুজিব অমন নির্দেশ দিয়েছিলেন। প্রেসিডেন্ট তাঁকে 'ঠান্ডা মাথায় ও শান্তভাবে' পদক্ষেপ নিতে বলেছিলেন এবং

এমন কিছু না করার উপদেশ দিয়েছিলেন যা 'আইন শৃংখলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটাবে" কিন্তু তিনি কর্তৃপক্ষকে উপেক্ষা করতে এবং জনগণকে আইন হাতে তুলে নিতে উত্তেজিত করতে থাকলেন। ২ মার্চ ফোর্সেসকে একাধিক স্থানে গুলী বর্ষণ করতে হলো। দিনটিতে ৯ জন নিহত ও ৫১ জন আহত হয়েছিল।

অন্য শহরগুলোতে পরিস্থিতি তুলনামূলকভাবে ভালো ছিল। কিন্তু প্রায় প্রতিটি স্থানেই প্রতিবাদ মিছিল বের করা হয়েছে এবং জাতীয় পতাকা পুড়িয়ে ফেলা হয়েছে। কুমিল্লা শহরে ইপিআর-এর দু'জন সিপাইকে ছাত্ররা কাপড় খুলে উলঙ্গ করে ফেলে। ইপিআর-এর এফএস সেকশনের টেলিফোন ছিনিয়ে নেয়া হয় এবং ডিটাচমেন্টকে নাজেহাল করা হয়। নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য তাদের অফিসকে ইপিআর উয়িং হেডকোয়ার্টার্সে সরিয়ে আনতে হয়েছিল।

৩ মার্চ সকালের মধ্যে সব কিছু অচল হয়ে যায়। ঢাকা ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যকার যোগাযোগ মাধ্যম আওয়ামী লীগ দখল করে নেয়ায় পূর্ব পাকিস্তান প্রকৃতপ্রস্তাবে বাকি বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল। সংযোগের একমাত্র অবশিষ্ট মাধ্যম ছিল সেনা ও বিমানবাহিনীর টেলিফোন। সমগ্র প্রদেশ দ্বিতীয় দিনের মতো জীবন অচল থাকে এবং ৩ মার্চের 'হরতাল'ও সম্পূর্ণ সফল হয়। সকালে কার্ফিউ তুলে নেয়ার সঙ্গে সঙ্গে দুষ্কৃতকারীরা আরো একবার অগ্নিসংযোগ, লুটপাট ও হত্যাকাণ্ড শুরু করে দেয়। পুলিশ ও ইপিআর নগরীতে টহল দিলেও কোনো ফল হয়নি। জিন্নাহ এভিনিউ ও বায়তুল মোকাররমে কিছু দোকান তছনছ ও লুট করা হয়। নওয়াবপুর, ইসলামপুর ও ঠাটারী বাজারের অবাংগালীরা নিজেদের ঘরবাড়িতে আটকে থাকতে বাধ্য হয়, স্থানীয় গুণ্ডাদের হাতে নিজেদের সম্পদের লুণ্ঠন তাদেরকে দেখতে হয় নীরবে ও অসহায়ভাবে। সে ছিল এক আইনহীনতার রাজত্ব। মানুষের মেজাজ ছিল ভীষণভাবে সহিংস। বিকেল তিনটার মধ্যে পল্টন ময়দান 'জয় বাংলা' স্লোগানে মুখরিত জনতার সাগরে পরিণত হয়ে যায়। তারা তাদের নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের মুখ থেকে 'যাও' শব্দটি শোনার জন্য সাগ্রহে অপেক্ষা করছিল। বাঁশের লাঠি নিয়ে সজ্জিত হয়ে তারা এসেছিল বঙ্গবন্ধুর কাছ থেকে 'বাংলাদেশ'-এর স্বাধীনতার ঘোষণা শুনতে। পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র লীগ জনসভায় ৯টি মৃতদেহ বহন করে নিয়ে আসে এবং হাজার হাজার মানুষ হত্যার দায়ে সেনাবাহিনীকে অভিযুক্ত করে। সকল প্রবেশমুখেই 'স্বাধীন বাংলা'-র দাবি লিখিত ছিল। শেখ মুজিব অবশ্য সংযমের সঙ্গে আচরণ করেন এবং অগ্নিসংযোগ, লুণ্ঠন ও হত্যার নিন্দা জানান। তিনি শ্রোতাদের শান্ত থাকতে এবং স্থানীয় ও অস্থানীয়দের মধ্যে সম্প্রীতি বজায় রাখতে বলেন। শেখ মুজিব অরাজকতার ভুক্তভোগীদের প্রতি 'সহানুভূতি' জানান এবং আতংকগ্রস্ত অবাংগালীদের মনে আস্থা ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করেন। তিনি কার্ফিউ তুলে নেয়ারও দাবি জানান এবং ট্রুপসকে ব্যারাকে ফিরিয়ে নেয়া হলে

আইন-শৃংখলা রক্ষারও নিশ্চয়তা দেন। 'বাংলাদেশ'-এর জনগণের দাবি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত 'হরতাল' ও অসহযোগ আন্দোলন অব্যাহত রাখার জন্যও তিনি আহ্বান জানান। তিনি সরকারি কর্মচারিদের প্রতিও অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেয়ার এবং জনগণকে খাজনা না দেয়ার আহ্বান জানান। আল্টিমেটামের সুরে তিনি ৭ মার্চের মধ্যে সংকট সমাধানের জন্য ক্ষমতাসীনদের চূড়ান্ত সময় বেঁধে দিয়ে বলেন যে, পরবর্তী কর্মসূচী তিনি ৭ মার্চ ঘোষণা করবেন। তিনি কোনো মিছিলের নেতৃত্ব দেননি, যা তাঁর বিদ্রোহী অনুসারীরা আগে পরিকল্পনা করেছিল। নিরাশ হলেও জনতা তাদের নেতার নির্দেশ পালন করে এবং ছত্রভঙ্গ হয়ে চলে যায়।

শেখ মুজিবের মনে চরমপন্থী ও প্রদেশের নকশালী কমিউনিস্টদের উদ্দেশ্যের ব্যাপারে উদ্বেগ ছিল, যারা গোলযোগের জন্য অপেক্ষা করছিল। পরিস্থিতি নৈরাশ্যের দিকে মোড় নেয়ার অপেক্ষায় গোপনে অবস্থানরত ধ্বংসাত্মক গোষ্ঠীগুলোর জন্য এটা ছিল এক বিরাট হতাশার কারণ। শেখ মুজিব মওলানা ভাসানীর নির্দেশনায় পরিচালিত চরমপন্থীদের ওপর দোষ চাপানোর চেষ্টা করেন, তাঁর মতে যাদের উদ্দেশ্য ছিল তাকে দুর্নামকবলিত করার এবং সামরিক আইন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সংঘাতে জড়িয়ে ফেলার লক্ষ্যে অরাজকতা সৃষ্টি করা। জনগণের মেজাজ দেখে তিনি এ কারণেও উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিলেন যে, আগে স্বাধীনতা ঘোষণার মাধ্যমে মওলানা ভাসানী তাঁর কর্তৃত্ব কেড়ে নিতে পারেন এবং এর ফলে জনগণ ও দলীয় লোকদের কাছে তাঁর অবস্থান দুর্বল হতে পারে। এই পর্যায়ে দলের ক্ষমতা পিপাসুদের দিক থেকেও শেখ মুজিব যথেষ্ট চাপের মধ্যে পড়েন, যারা চাচ্ছিল তিনি একতরফাভাবে স্বাধীন বাংলাদেশের ঘোষণা দিন। কমিউনিস্টদের হুমকি অবশ্য তাঁকে অনেক বেশি উদ্বিগ্ন করছিল। সে কারণে জনগণের ওপর নিজের নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখার উদ্দেশ্যে চরমপন্থীদের সঙ্গে সরাসরি সংঘাতে না গিয়ে তিনি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব প্রেসিডেন্সিয়াল অর্ডারের মাধ্যমে একটি প্রাদেশিক সরকার গঠনের জন্য ওকালতি করেছিলেন।

প্রদেশের অন্য কয়েকটি অংশে ৩ ও ৪ মার্চ আইন-শৃংখলা পরিস্থিতি আরো খারাপ হয়ে পড়েছিল। সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত চট্টগ্রামের চেহারা হয়েছিল ১৯৪৭ সালের স্বাধীনতা-পূর্ব দাঙ্গাকালীন দিনগুলোর ভারতীয় শহরের মতো। স্থানীয় দুর্বৃত্তরা অনিয়ন্ত্রিত হয়ে উঠেছিল; তারা সমগ্র অস্থানীয় জনগোষ্ঠীকে নিশ্চিহ্ন করে ফেলতে চেয়েছিল। অস্থানীয় যুবতী মেয়েদের অপহরণ ও ধর্ষণ করার এবং শিশুদেরকে জ্বলন্ত বাড়িতে নিক্ষেপ করার ঘটনার কথা পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর কখনো শোনা যায়নি। কিন্তু বাস্তবে অমনটিই তখন ঘটছিল।

পাহাড়তলীসহ অস্থানীয়দের বিভিন্ন কলোনীতে সংখ্যাহীন জীবনের অবসান ঘটেছিল। তাদের সম্পত্তি পুড়িয়ে ফেলা হয়েছে এবং নারী ও শিশুদের প্রতি যে আচরণ করা হয়েছে তা

ছিল রীতিমতো ভয়ংকর। এটা ছিল সুবিধাবাদীদের উস্কে দেয়া অবাংগালীবিরোধী ক্রোধান্ধ ঘৃণার বিস্ফোরণ। খুলনা, রংপুর ও রাজশাহীতেও বাংগালী ও অবাংগালীদের মধ্যে সংঘাতের ঘটনা ঘটেছে। চট্টগ্রামের হতাহতের সঠিক সংখ্যা কখনো জানা যাবে না, তবে স্থানীয় সংবাদপত্রের হিসেবে দু'দিনে ১০০-র বেশি নিহত এবং ৩০০-র বেশি আহত হয়েছিল। কেবল চট্টগ্রামেই ১৫০০ বাড়িঘর পোড়ানো হয় এবং ১০,০০০ জন গৃহহীন হয়ে পড়ে। নিহতদের মধ্যে একজন ছিলেন আইএসআই-এর জন্য কর্মরত পাকিস্তান নৌবাহিনীর এক চিফ পেটি অফিসার। খুলনায় নিহতের সংখ্যা ছিল ৪১। সব মিলিয়ে এমন এক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল, যখন নিজেদের এবং নারী ও শিশুদের জীবন বাঁচানোর উদ্দেশ্যে অস্থানীয় জনগোষ্ঠী ঢাকা বিমান বন্দরের দিকে যাত্রা শুরু করেছিল। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তানে যাওয়ার জন্য প্রতীক্ষারত পলায়নপর ভারতীয় মুসলমানদের ত্রাণ শিবিরের দৃশ্য উপস্থিত করেছিল ঢাকা বিমান বন্দর। সে দৃশ্য ছিল মর্মান্তিক। এক দিক থেকে এর মধ্য দিয়ে স্থানীয় উন্মত্তদের মেজাজেরও প্রতিফলন ঘটেছিল, সেই সাথে এই তথ্যটিও প্রকাশিত হয়েছিল যে, অস্থানীয় লোকজনের জীবন ও সম্পত্তি রক্ষার অঙ্গীকারসহ শেখ মুজিবের আশ্বাস অস্থানীয়দের মনে আস্থা সৃষ্টি করতে ব্যর্থ হয়েছিল এবং সেটা মৌখিক আশ্বাসের বেশি কিছু ছিল না।

প্রদেশে রাজনৈতিক পরিস্থিতির দ্রুত পরিবর্তন ঘটছিল। এমন অনেক উপলক্ষের সৃষ্টি হচ্ছিল যখন আশু রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিচ্ছিল- যেগুলো একমাত্র প্রেসিডেন্টই দিতে পারতেন। ঢাকায় তাঁর উপস্থিতি ছিল সময়ের চাহিদা। ৯ মার্চ প্রেসিডেন্ট আহূত গোল টেবিল বৈঠকে যোগ দিতে অস্বীকার করেছিলেন শেখ মুজিব। ৭ মার্চ শেখ মুজিবের ভাষণ দেয়ার কথা ছিল। পরিস্থিতি নাগালের বাইরে যাওয়ার এবং তিনি ভাষণ দেয়ার আগেই কিছু একটা করার দরকার ছিল। প্রেসিডেন্ট আসেন নি, তবে তিনি জাতীয় পরিষদের উদ্বোধনী অধিবেশনের নতুন তারিখ হিসেবে ২৫ মার্চের কথা ঘোষণা করেছিলেন। তাঁর ৬ মার্চের বেতার ভাষণের সুর পূর্ব পাকিস্তানীদের ক্ষিপ্ত করেছিল এবং সংকটের সকল দায় শেখ মুজিবের ওপর চাপানোয় তিনিও ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। ঘটনাপ্রবাহ এত বিচিত্র গতিতে এগিয়ে চলছিল যে, মাসের প্রথম সপ্তাহের শেষেই প্রদেশের এম এল এ-কে বিদায় নিতে হয়েছিল। তিনি প্রেসিডেন্টকে ঢাকায় আসার অনুরোধ করেছিলেন, কিন্তু প্রেসিডেন্ট সেটা গ্রহণ করতে অসম্মতি জানিয়েছেন।

৪ মার্চ সন্ধ্যার ঘটনা। প্রাক্তন গভর্নর আহসানকে বিদায় জানানো হল। ঢাকার পরিস্থিতি উত্তেজনাপূর্ণ থাকা সত্ত্বেও আহসানের বিরাট সংখ্যক শুভাকাঙ্ক্ষী এয়ারপোর্টে এসেছিলেন। পূর্ব পাকিস্তানে আহসান অত্যন্ত জনপ্রিয় ব্যক্তি ছিলেন। ওপরের ও নিম্ন পর্যায়ের সকলেই তাঁকে পরম আদরে জড়িয়ে ধরলেন। সেখানে খুব কম সংখ্যকই ছিলেন,

যাদের চোখে অশ্রু দেখা যায়নি। বন্ধুত্বপূর্ণ, সুন্দর ও সমঝোতামূলক মনোভাব দিয়ে তিনি তাদের হৃদয় জয় করেছিলেন। আহসানকে বিদায় জানানোর পর আমরা ইয়াকুবের বাসায় গেলাম। সেখানে আমি ও জেনারেল খাদিম আমাদের স্ত্রীদের নিয়ে ইয়াকুবের সঙ্গে ডিনার খেলাম। রাত দশটার দিকে টেলিফোন বেজে উঠলো। ইয়াকুব ধরলেন, আমরা শুধু শুনলাম, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ, সেক্ষেত্রে আমার পদত্যাগ গ্রহণ করুন।" আমি ও খাদিম উভয়েই উচ্চ স্বরে বলে উঠলাম, "আমাদের পদত্যাগের কথাও জানিয়ে দিন।" ইয়াকুব সে কথা বললেন না, আমাদের কাছে ফিরে এসে বললেন, "পীর (জেনারেল পীরজাদা) কথা বলছিলেন। তিনি বললেন যে, প্রেসিডেন্ট ঢাকা আসাছেন না। যেহেতু প্রতি মূহূর্তে পরিবর্তনশীল পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে সাড়া দেয়া এখন প্রয়োজন, আমি তাই আমার পদত্যাগ পেশ করেছি।" আমরা তাঁর সঙ্গে একমত হয়ে জানতে চাইলাম, তিনি কেন আমাদের পদত্যাগের কথাও জানিয়ে দিলেন না। তিনি বললেন, এটাকে তাহলে বিদ্রোহ হিসেবে নেয়া হবে এবং আমাদের প্রত্যেকেরই কোর্ট মার্শাল করা হবে।

আমরা তখনো সর্বশেষ পরিস্থিতি নিয়ে কথা বলছিলাম। এমন সময় আবার টেলিফোন বেজে উঠলো। এবারও পীরজাদাই ফোন করেছেন। তিনি আমাকে রাওয়ালপিন্ডি যেতে এবং সেখানে গিয়ে প্রেসিডেন্টকে পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত করতে বললেন। ইয়াকুব পদত্যাগ করেছেন, খাদিম তখন ট্রুপস কমান্ড করছিলেন। সুতরাং পূর্ব পাকিস্তান থেকে একমাত্র আমিই যাওয়ার মতো অবস্থায় ছিলাম। পিআইএ-র একটি বিমান সে সময় রাত ১১টার দিকে ছাড়ত। আমি বাসায় গিয়ে স্ত্রীকে একটি স্যুটকেসে আমার কিছু জিনিসপত্র গুছিয়ে দিতে বললাম। ইয়াকুবকে অনুরোধ করলাম আমাকে যেতে দিতে। যাওয়ার আগে শেখ মুজিবের সঙ্গে দেখা করারও অনুমতি চাইলাম যাতে প্রেসিডেন্টকে দেয়া আমার ব্রিফিং যতটা সম্ভব পূর্ণাঙ্গ হতে পারে। খাদিমকে বললাম, তিনি যেন পিআইএ-র বিমানকে আমার জন্য অপেক্ষা করতে বলেন। তারপর আমি শেখ মুজিবকে ফোন করে জানতে চাইলাম, আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসতে পারি কি না। যদিও অনেক রাত হয়ে যাচ্ছিল, তবু তিনি রাজি হলেন।

ঢাকার সর্বত্র তখন গোলাগুলী চলছিল। আমি তাই অন্য কারো জীবনের ঝুঁকি নিতে চাইলাম না। আমি নিজেই আমার ছোট গাড়িটি চালিয়ে মুজিবের ধানমন্ডির বাসায় গেলাম। সেখানে আওয়ামী লীগের নিরাপত্তা প্রহরীদের বেষ্টনী ছিল। তারা আমাকে চিনত এবং আমাকে ভেতরে যেতে দেয়া হল। মুজিব একাই অপেক্ষা করছিলেন। আমি যেহেতু তাড়াহুড়োর মধ্যে ছিলাম তাই কোন শুভেচ্ছা না জানিয়ে এবং কোন ভূমিকা না দিয়ে সরাসরি আলোচনা শুরু করলাম। আমি তাঁকে প্রশ্ন করলাম, "প্লিজ, বলুন, পাকিস্তানকে কি রক্ষা করা সম্ভব?" আমার প্রশ্নের মধ্য দিয়ে পরিস্থিতির ভয়াবহতা এবং পূর্ব পাকিস্তানে

আমরা যে যন্ত্রণার মধ্যে ছিলাম তার প্রকাশ ঘটেছিল। মুজিব বললেন, "হ্যাঁ, পাকিস্তানকে রক্ষা করা যায় যদি কেউ আমাদের কথা শোনে। আর্মি অসংখ্য মানুষকে হত্যা করেছে। তারা শোনে ভুট্টোর কথা। তারা আমার কথা শোনে না। এমন কি এখনো, এত সবের পরও আমরা আলোচনা করতে আগ্রহী আছি।"

তিনি বিস্তারিতভাবে বলার আগে আমি দেয়ালে একটি ছায়া দেখতে পেলাম। আমি তাঁকে বললাম, কেউ আমাদের কথা শুনছে (আড়ি পেতেছে)। তিনি উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "এখানে কেউ আসতেই পারে না।" যা হোক, ব্যক্তিটিকে দেখার পর মুজিবকে বলতে শুনলাম, "ভাই তাজউদ্দিন, প্লিজ ভেতরে আসুন।" তাজউদ্দিন, গোঁড়া ভারতপন্থী আওয়ামী লীগার, ভেতরে এলেন এবং বসলেন। তিনি পশ্চিম পাকিস্তানকে এবং সম্ভবত পাকিস্তানকেও ঘৃণা করতেন। তিনি আট বছর বয়স পর্যন্ত হিন্দু ছিলেন বলে একটি প্রচারণা ছিল। আমি গল্পটিকে সত্য মনে করি না। কিন্তু তাঁর মানসিক গঠনে এর যথেষ্ট প্রকাশ ঘটত। মুজিব তাজউদ্দিনকে বললেন, জেনারেল ফরমান জানতে চাচ্ছেন পাকিস্তানকে রক্ষা করা সম্ভব কিনা। তাজউদ্দিন বললেন, 'হ্যাঁ, তা করা যায়, কিন্তু একটি নতুন ফর্মুলায়। এত সব নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ডের পর আমরা আর একই ছাদের নিচে ভুট্টোর সঙ্গে বসতে পারি না। তিনিই এইসব কিছুর জন্য দায়ী। পরিষদকে দুটি অংশে বিভক্ত করতে হবে, একটি পূর্ব পাকিস্তানের জন্য এবং অন্যটি পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য। প্রতিটি পরিষদ তার নিজের প্রদেশের জন্য সংবিধান রচনা করবে। তারপর উভয় পরিষদ পাকিস্তানের জন্য একটি সংবিধান রচনার উদ্দেশ্যে বসবে।" আমি বললাম, "শেষ পর্যন্ত জনাব ভুট্টোর সঙ্গে আপনাদের বসতেই হবে।" তাঁরা বললেন, "কিন্তু সেটা হবে সমান সমান।" তাঁরা যা বলছিলেন তা ছিল একটি কনফেডারেশন গঠনের ফর্মুলা। আমি তাঁদের বললাম যে, এটা পাকিস্তানকে রক্ষা করার কোনো সমাধান নয়। সাক্ষাৎকালে প্রেসিডেন্টকে তাঁদের চিন্তা-ভাবনা পৌঁছে দেব বলে আমি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম, আমি সে কথা রেখেছি।

শেখ মুজিব তাঁর দাবির প্রতি পূর্ব পাকিস্তানের প্রায় সকল বিখ্যাত নেতার সমর্থন পেয়েছিলেন। মওলানা ভাসানী সে সময় মুজিবের সঙ্গে এগিয়ে যাওয়াকেই শ্রেয় মনে করেছিলেন। তথাপি শেখ মুজিব যদি স্বাধীন বাংলাদেশের চাইতে কম কিছুতে সম্মত হতেন, তাহলে ন্যাপ (ভাসানী), ন্যাপ (মোজাফফর) এবং আতাউর রহমানের বেঙ্গল ন্যাশনাল লীগ কমিউনিস্টদের সঙ্গে একযোগে গোলযোগ সৃষ্টি করতে পারত বলে আশংকা ছিল। এসব যখন চলছিল, তখন প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ৬ মার্চ শেখ মুজিবের কাছে একটি বিশেষ বার্তা পাঠিয়েছিলেন। বার্তায় তিনি মুজিবকে সংযম অবলম্বন করতে এবং অপূরণীয় কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ থেকে বিরত থাকতে বলেন এবং জানান যে, খুব শীগগিরই তিনি ঢাকা আসবেন এবং মুজিবকে ৬ দফার চাইতেও বেশি কিছুর প্রস্তাব দেবেন।

ব্রিগেডিয়ার (পরবর্তীকালে লেঃ জেনারেল) জিলানী বার্তাটি পৌঁছে দিয়েছিলেন। বাংলাদেশ সৃষ্টি হওয়া পর্যন্ত এই বার্তাটি শেখ মুজিব সব সময় নিজের সঙ্গে রাখতেন এবং তার সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য আগত সবাইকে তিনি সেটা দেখাতেন।

৪ মার্চ রাতে আমি রাওয়ালপিন্ডির উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছিলাম, ছ' ঘণ্টা ভ্রমণের পর শ্রীলংকা হয়ে বিমানটি করাচী পৌঁছেছিল। সরাসরি ইসলামাবাদ যাওয়ার মতো কোনো বিমান সে সময় না থাকায় আমি লাহোরগামী একটি বিমানে উঠি এবং লাহোর গিয়ে পরিবর্তন করে একটি ফকারে চড়ে ইসলামাবাদ পৌঁছাই। লাহোরে আমি যখন বিমানে উঠছিলাম তখন আমার সামনে জেনারেল টিক্কা খানকে দেখতে পেলাম। আমি তৎক্ষণাৎ সিদ্ধান্তে পৌঁছলাম যে, তিনি ইয়াকুবের স্থলে আসছেন। আমাদের আসন কাছাকাছি ছিল। আমি প্রশ্ন করলাম, "স্যার, আপনি কখন ঢাকা আসছেন?" তিনি বললেন, প্রেসিডেন্ট তাঁকে ডেকে পাঠিয়েছেন এবং তিনিই তাঁকে সব নির্দেশ দেবেন। আমি তাঁকে জানালাম যে, আমিও প্রেসিডেন্টের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি। আমি এরপর তাঁকে ব্যাপকভিত্তিতে পূর্ব পাকিস্তান পরিস্থিতির একটি সংক্ষিপ্তসার জানালাম। আমরা যেমনটি জানতাম, টিক্কা খান ছিলেন একজন ঋজু, সৎ ও অনুগত সৈনিক এবং দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ও কঠিন ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন মানুষ। তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করলেন এবং বললেন যে, তিনি পরিস্থিতি সামাল দিতে পারবেন। সময়ের দাবি মতো তিনি অবশ্য কোনো রাজনীতিক ছিলেন না এবং গভর্নর নিযুক্ত হওয়ার পর নিজে চাইলেও তিনি কখনো নমনীয়তা দেখাতে পারেন নি। এর প্রথম কারণ ছিল তাঁর উর্ধ্বতনদের আদেশ মানার অভ্যাস এবং পরবর্তীকালের কারণটি ছিল জেনারেল নিয়াজীর অসহযোগিতামূলক মনোভাব। আমরা দু'জনই বিমান বন্দর থেকে সরাসরি সিএমএল এ এইচ কিউ-তে গিয়েছিলাম।

প্রেসিডেন্টের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য আমাকেই প্রথম ডাকা হয়েছিল। তখন ৫ মার্চের সকাল প্রায় ১১ টা। আমি ভেবেছিলাম প্রেসিডেন্ট তাঁর অফিসে থাকবেন। পরিবর্তে দেখলাম তিনি তাঁর বাসভবনের পেছন দিকের বারান্দায় বসে আছেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন জেনারেল হামিদ ও জনাব ভুট্টো। তাঁরা তিনজনই মদ পান করছিলেন। ইয়াহিয়া খালি পায়ে ছিলেন, তিনি তাঁর পা দুটিকে সামনের টেবিলে তুলে দিয়েছিলেন। আমার তখন নীরোর কথা মনে পড়ল, রোম যখন পুড়ছিল নীরো তখন বাঁশী বাজাচ্ছিলেন। আমি স্যালুট করলাম। প্রেসিডেন্ট আমাকে চেয়ার নিতে বললেন, আমি বসলাম। তারপর তিনি পরিস্থিতি সম্পর্কে প্রশ্ন করলেন। আমি বললাম, "স্যার, আমি যা বলতে যাচ্ছি তা জনাব ভুট্টোর জন্য অস্বস্তির কারণ হতে পারে। আমি কি অনুরোধ...' আমার কথা শেষ হওয়ার আগেই জনাব ভুট্টো তাঁর গ্লাস তুলে নিলেন এবং সংলগ্ন ঘরটিতে চলে গেলেন। আমি প্রেসিডেন্টকে পরিস্থিতি সম্পর্কে বিস্তারিত রিপোর্ট দিয়ে জানালাম পরিস্থিতি কতটা ভয়াবহ এবং কত

জরুরি ভিত্তিতে কোনো অ্যাকশনের এখন প্রয়োজন। আমি তাঁকে মুজিবের সঙ্গে আমার সাক্ষাতের সম্পর্কেও জানালাম। আমি যখন তাঁকে বললাম যে, পরিস্থিতি ছয় দফারও বাইরে চলে গেছে, তখন তিনি বললেন,"সন্ধ্যায় ডিনারের জন্য আসুন। পরিস্থিতি মোকাবিলার উদ্দেশ্যে আমি একটি ভাষণ রেকর্ড করছি। আমরা সন্ধ্যায় আরো আলোচনা করব।"

সন্ধ্যায় সেখানে পৌঁছে দেখলাম জেনারেল হামিদ ও জেনারেল টিক্কাও রয়েছেন। আমাকে বলা হল, প্রেসিডেন্ট তাঁর ভাষণ রেকর্ড করছেন। কিছুক্ষণ পরই তিনি বেরিয়ে এলেন; তাঁকে রক্তিমাভ ও বিরক্ত মনে হল। তিনি বললেন,"আগামী কাল আমার ভাষণ শুনবেন। এতে পূর্ব পাকিস্তানে আপনার সমস্যার ব্যাপারে উত্তর রয়েছে।" তারপর হঠাৎ তিনি জেনারেল হামিদের দিকে ঘুরে বললেন, "ইয়াকুবের ব্যাপারে আপনি কি করেছেন? কখন তাঁকে কোর্ট মার্শাল করা হবে?" হামিদ বললেন, "স্যার, আমি একটি তদন্তের আদেশ দিয়েছি। এর রিপোর্ট পাওয়া মাত্র আমরা পরবর্তী পদক্ষেপ নেব।" ইয়াহিয়া আমার দিকে তাকালেন এবং বললেন, "আমি আপনাদের সকলেরই কোর্ট মার্শাল করব। ইয়াকুব বেশি হতাশ হয়ে পড়েছে। সক্রিয় কর্তব্যে থাকাকালে সে তার পদটি ত্যাগ করেছে।" অভিযোগ গুরুতর জেনে আমি বললাম,"কিন্তু স্যার, তিনি তাঁর পদ তো ত্যাগ করেন নি। তিনি এখনো কোর কম্যান্ডার রয়েছেন। তিনি এখনো তাঁর দায়িত্ব বুঝিয়ে দেননি। তিনি কেবল তাঁর পদত্যাগের প্রস্তাব দিয়েছেন।" শুনে প্রেসিডেন্ট হাসলেন,"বন্ধুকে বাঁচানোর চেষ্টা করছেন? তিনি আমারও বন্ধু।" পরবর্তী প্রথম সুযোগেই আমি ইয়াকুবকে ফোন করলাম এবং দায়িত্ব বুঝিয়ে দিতে নিষেধ করলাম। এর ফল শুভ হয়েছিল। কারণ পরবর্তীকালে জেনারেল খাদিম আমাকে বলেছেন, আমার বার্তা না গেলে ইয়াকুব দায়িত্ব হস্তান্তরিত করে ফেলতেন এবং বিশ্রাম করার জন্য সিলেট চলে যেতেন।

ডিনারের আগে প্রেসিডেন্ট অবিলম্বে ঢাকা যাওয়ার জন্য টিক্কাকে নির্দেশ দিলেন। আইন-শৃংখলার ব্যাপারে তাঁকে কিছু করতে হবে না। তাঁর কাজ হবে সেনাবাহিনীকে ব্যারাকে রাখা। প্রেসিডেন্টের ধারণা, বাংগালীরা নিজেরা নিজেরা মারামারি করবে এবং শেষ পর্যন্ত পরিস্থিতি এমন হবে যে, তারাই সেনাবাহিনীর সাহায্য চাইবে। এটা একটা স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে সেনাবাহিনীর যথাযথ মনোভাব হতে পারে। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানে সমগ্র ঘটনাই পরিচালনা করছিল সেনাবাহিনী, মার্শাল ল চলছিল। জনগণের জীবন, সম্পত্তি ও সম্মান বাঁচানোর দায়িত্বটা আমাদের, আমরা দায়িত্ব এড়িয়ে চলছিলাম। আমি আমার অভিমত ব্যক্ত করলাম। কিন্তু টিক্কা প্রেসিডেন্টের নির্দেশানুসারে চলতে রাজি হলেন।

আমরা যখন ঢাকার উদ্দেশে করাচীর দিকে যাচ্ছিলাম, তখন বিমানের ইন্টারকমিউনিকেশন সিস্টেমে প্রেসিডেন্টের ভাষণ প্রচারিত হলো। জনাব বেজেঞ্জোও একই

বিমানে যাচ্ছিলেন। দরজা খুলে দেয়ার পর তিনি বললেন, "তিনি যা চেয়েছিলেন তা পেয়ে গেলেন।" এক্ষেত্রে 'তিনি' ছিলেন জনাব ভুট্টো। সাধারণ ধারণা ছিল এই যে, প্রেসিডেন্টের ভাষণটি জনাব ভুট্টো লিখে দিয়েছিলেন।

আমরা যখন ৭ মার্চ ঢাকায় নামছিলাম, মুজিব তখন প্রায় সাত লাখ মানুষের বিশাল সমাবেশে ভাষণ দিচ্ছিলেন। বিমানটি নিচু দিয়ে উড়ে যাওয়ার সময় আমরা সবাই এক জনসমুদ্র দেখলাম। আমি জেনারেল টিক্কার দিকে ঘুরে বললাম, "ঢাকায় এ রকমটিই ঘটে থাকে।" আমি বুঝিয়েছিলাম, পরিস্থিতি পশ্চিম পাকিস্তানের মতো সহজ নয়।

আমরা মার্শাল ল হেডকোয়ার্টারে পৌছানোর আগেই ভাষণ শেষ হয়ে গিয়েছিল। তুচ্ছ ও হীন অবস্থায় ইয়াকুব সেখানে ছিলেন। একটি সম্মেলন অনুষ্ঠান করা তখন প্রয়োজন হয়ে পড়ে। কারণ টিক্কাকে প্রথমেই রেডিও কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে একটি আলটিমেটামের সম্মুখীন হতে হয়। তারা শেখ মুজিবের রেকর্ডকৃত ভাষণ পুনঃপ্রচারের অনুমতি চেয়ে জানিয়েছিল, অনুমতি না দেয়া হলে তারা বয়কট করবে। একজন কিভাবে অমন একটি মারাত্মক রাষ্ট্রবিরোধী বিষময় ভাষণ সরকার নিয়ন্ত্রিত বেতারে প্রচার করার অনুমতি দিতে পারে? কিন্তু জনগণ ছিল মুজিবের সঙ্গে। টিক্কা সমস্যাটি কেন্দ্রকে জানালেন। এইচকিউ সি এম এলএ-র ভীতি ছিল, হয়তো একতরফা স্বাধীনতার ঘোষণা দেয়া হবে। তার চেয়ে কম যে কোনো কিছু গ্রহণযোগ্য ছিল। মুজিব খুব চতুরতার সঙ্গে একতরফা স্বাধীনতার ঘোষণা দেননি। ১৪ ডিভিশনের জিওসি জেনারেল খাদিম হোসেন রাজা মাত্র একদিন আগে মুজিবকে একটি হুমকির বার্তা পৌছে দিয়ে এসেছিলেন এবং সে কারণেই মুজিব তাঁর পরিকল্পনা পরিবর্তন করেছিলেন। রেডিওকে ভাষণ প্রচারের অনুমতি দেয়া হলো। দেয়া না হলেও অবশ্য তারা ওটা প্রচার করতই। কারণ ৭ মার্চ থেকে সরকারের সকল সংস্থাই মুজিবের নির্দেশে পরিচালিত হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের অসহায়ত্ব সম্পূর্ণরূপে পরিষ্কার হয়ে পড়েছিল; তথাপি পতনোণ্মুখ পরিস্থিতির জন্য যথোপযুক্ত কোনো রাজনৈতিক পদক্ষেপ রাওয়ালপিন্ডি থেকে নেয়া হয়নি।

ছায়া সরকার

শেখ মুজিব তাঁর ৭ মার্চের ভাষণে আরো ব্যাপক ভিত্তিতে 'অহিংস' ও অসহযোগ আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানিয়েছিলেন। জনগণের মনোভাব বুঝতে পেরে তিনি প্রেসিডেন্ট আহূত ২৫ মার্চের জাতীয় পরিষদ অধিবেশনে আওয়ামী লীগের অংশ গ্রহণের পূর্বশর্ত হিসেবে নিচের দাবিগুলো উপস্থিত করেছিলেন :

ক. অবিলম্বে মার্শাল ল প্রত্যাহার;

খ. জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর;

গ. সেনাবাহিনীকে ব্যারাকে ফিরিয়ে নেয়া এবং

ঘ. সেনাবাহিনীর গুলী বর্ষণ ও মানুষ হত্যার ঘটনাসমূহের তদন্ত অনুষ্ঠান।

এগুলো ছাড়া শেখ মুজিব জনগণকে খাজনা দিতে নিষেধ করেছিলেন। তাঁর অন্য নির্দেশগুলোতে বলা হয়ঃ সকল সরকারি/আধা-সরকারি কর্মচারি 'হরতাল' পালন অব্যাহত রাখবে; রেল ও সমুদ্র বন্দরসমূহ সামরিক পরিবহনের কাজে অস্বীকৃতি জানাবে; রেডিও, টিভি ও সংবাদপত্র কেবল বাংলাদেশমুখী সংবাদ ও অনুষ্ঠানমালা প্রচার ও প্রকাশ করবে; টেলিকমিউনিকেশন ব্যবস্থা শুধু 'বাংলাদেশ'-এর অভ্যন্তরে কাজ করবে; ব্যাংকগুলো পশ্চিম পাকিস্তানে কোনো অর্থ পাঠাবে না; বাংগালী ইপিআর-এর সহযোগিতা নিয়ে পুলিশ আইন-শৃংখলা রক্ষা করবে এবং সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকবে। 'বাংগালী ইপিআর'-এর উল্লেখ করার মধ্য দিয়ে তিনি পশ্চিম পাকিস্তানী অফিসারদের প্রতি ট্রুপসের আনুগত্যকে খর্বিত করার প্রচেষ্টা নিয়েছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন তারা পূর্ব পাকিস্তানী অফিসারদের মান্য করুক। এর মাধ্যমে তিনি বাংগালী ট্রুপসকে বিদ্রোহ করার ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। এগুলোর অনুসরণে পরদিন সরকার পরিচালনায় আওয়ামী লীগের নির্দেশাবলী জারি করা হয়েছিল। সংক্ষেপে বলতে গেলে বলা যায়, তিনি সরকারের নিয়ন্ত্রণ দখল করেছিলেন। বাস্তবে একটি সমান্তরাল সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

চার দফা দাবি পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিটি মহল থেকে স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন পেয়েছিল, পশ্চিম পাকিস্তানেরও কিছু রাজনীতিক তা সমর্থন করেছিলেন। সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে ক্রোধান্ধ ভাষণের ফলাফল মারাত্মক আকার ধারণ করল, যখন গালমন্দের পাশাপাশি সেনানিবাসের সীমাবদ্ধ অবস্থানের মধ্যেও সেনাবাহিনীকে অনাহারকবলিত করার গুরুতর প্রচেষ্টা নেয়া হল। সকল তথ্য মাধ্যম, বুদ্ধিজীবী, লেখক, কবি ও গায়ক সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে কাদা ছোঁড়ার অভিযানে নেমে পড়েছিল। তাঁরা রেডিওটিভিসহ সকল ফোরামে এই প্রচারণা চালিয়েছিলেন। তাঁদের মিথ্যাচারের কোনো সীমা ছিল না। আইন-শৃংখলা পরিস্থিতির আরো অবনতি ঘটল যখন ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, কুমিল্লা, বরিশাল ও বগুড়ার কারাগারের দরজা ভেঙে বিচারাধীন ও সাজাপ্রাপ্ত বিরাট সংখ্যক বন্দী পালিয়ে গেল। স্পষ্টতই এটা কারাগার কর্তৃপক্ষের সহায়তায় সম্ভব হয়েছিল- এই কর্তৃপক্ষও তখন আওয়ামী লীগের সুরে তাল মিলিয়ে নৃত্য করছিলেন। একমাত্র ঢাকা থেকেই ৩৪১ জন বন্দী পালিয়েছিল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসসহ বিভিন্ন স্থানে অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদের গণসংগ্রহের সংবাদও ইতিমধ্যে ভয়াবহ হয়ে ওঠা পরিস্থিতিকে আরো গুরুতর করে তুলেছিল। পুলিশ প্রধান সবার আগে তাঁর বাহিনীসহ পাকিস্তানের পক্ষ ত্যাগ করে আওয়ামী লীগ কম্যান্ডের হাতে ক্রীড়নকে পরিণত হয়েছিলেন এবং সম্পূর্ণ সহযোগিতা দিয়েছিলেন।

প্রেসিডেন্ট কর্তৃক জাতীয় পরিষদ অধিবেশনের নতুন তারিখ ঘোষণা সত্ত্বেও এবং পাঁচ ছ'দিনের মধ্যে তাঁর প্রত্যাশিত ঢাকা আগমনের সংবাদের মধ্যেও অসহযোগ আন্দোলন গতিবেগ অর্জন করতে থাকল। অচিরেই সরকারি, আধা-সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানসমূহের অফিসার ও স্টাফের সদস্যরা এই আন্দোলনে যোগ দিলেন। ঘটনাপ্রবাহ চরম পর্যায়ে পৌঁছাল ১২ মার্চ, যেদিন সকল সিএসপি ও ইপিসিএস অফিসার শেখ মুজিবের প্রতি আনুষ্ঠানিক সমর্থন ঘোষণা করলেন এবং আওয়ামী লীগ হাই কম্যান্ডের কাছ থেকে নির্দেশ গ্রহণের ইচ্ছার কথা জানালেন। এ কথা পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল যে, সামরিক আইন প্রশাসন কোনো পদক্ষেপের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে এই অফিসাররা তাতে কোনো পক্ষ হতে আর রাজি নন।

৭ মার্চ প্রদেশের সিনিয়র অফিসাররা যখন নতুন এম এল এ জেনারেল টিক্কা খানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন, তখন তাঁদের মনোভাব ছিল উদাসীনের মতো। এটা সুস্পষ্ট ছিল যে, একই উদ্দেশ্যের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে তাঁদের হৃদয়ও চলমান আন্দোলনের সঙ্গে একাত্ম হয়ে গিয়েছিল। এ সবের ফলে ইডেন বিল্ডিং-এর পরিবর্তে প্রাদেশিক সচিবালয়ের কাজ কর্ম চলছিল শেখ মুজিবের ধানমন্ডির বাসভবনে। রেডিও, টেলিভিশন, টেলিফোন, টেলিগ্রাফ ও রেলওয়েসহ সকল সরকারি বিভাগই আওয়ামী লীগ হাই কম্যান্ডের নির্দেশাবলী পালন করছিল। গোয়েন্দা সংস্থাসমূহও ফ্লোর অতিক্রম করেছিল এবং যোগ দিয়েছিল

আওয়ামী লীগ শিবিরে। পুলিশকে পুরোভাগে নিয়ে একটি 'ছায়া' সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিল। এম এল কর্তৃপক্ষকে অমান্য করার চূড়ান্ত পর্যায়টি ঘটিয়েছিলেন প্রদেশের প্রধান বিচারপতি, তিনি নবনিযুক্ত গভর্নরকে শপথ বাক্য পাঠ করাতে অস্বীকার করেছিলেন। স্পষ্টতই তিনি চলছিলেন আওয়ামী লীগ হাই কম্যান্ডের নির্দেশে। শেখ মুজিব কেবল এ ব্যাপারে সহযোগিতা করতেই অস্বীকার করেন নি, বরং গভর্নরের সঙ্গে গভর্নর হাউসে গিয়ে সাক্ষাত করার এক আমন্ত্রণকেও তিনি নাকচ করে দিয়েছিলেন। সেই সাথে জেনারেলকেই তিনি উল্টো তাঁর ধানমন্ডির বাসভবনে যেতে বলেছিলেন। অসামরিক প্রশাসনের সহযোগিতা ব্যতীত মার্শাল ল কর্তৃপক্ষের পক্ষে কাজ কর্ম চালানো প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ছিল, বিশেষ করে এমন একটি পরিস্থিতিতে যখন প্রদেশের সমগ্র জনগণের মনোভাবই ছিল অমান্য করার। এই পর্যায়েই অসহযোগিতার আচরণ নিয়ে চলমান বিদ্রোহ নির্মূল করার জন্য কঠোর অ্যাকশনের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়েছিল। রাজনৈতিক সমাধানের জন্য প্রেসিডেন্টের শেষ মুহূর্তের প্রচেষ্টার পরিপ্রেক্ষিতে সেনাবাহিনী ও এম এল কর্তৃপক্ষ উভয়কেই সংযম প্রদর্শনের মারাত্মক পরীক্ষা দিতে হয়েছিল।

শেখ মুজিবের মতে ছয় দফার তত্ত্ব তখন পুরনো ও অচল হয়ে গিয়েছিল। রাজনৈতিক সমাধান হিসেবে এবার তিনি যে প্রস্তাব দিলেন তা ছিল পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের কনফেডারেশন গঠন করার। তিনি বললেন:

ক. পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের প্রধান মন্ত্রীদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে;

খ. পৃথক পৃথক সংবিধান প্রণয়নের জন্য গণপরিষদদ্বয়ের অধিবেশন আহ্বান করতে হবে;

গ. প্রতিরক্ষা ও পররাষ্ট্রীয় বিষয় সমন্বয় করার জন্য কেন্দ্রে প্রেসিডেন্ট বহাল থাকবেন;

ঘ. কেন্দ্রে একজন সুপ্রিম কম্যান্ডার রেখে দু'জন সি-ইন-সির নিযুক্তি দিতে হবে;

ঙ. পরবর্তী একটি তারিখে দুই পাকিস্তান পারস্পরিক সমঝোতার ভিত্তিতে একটি পাকিস্তান সরকার গঠন করার জন্য সমস্ত ক্ষমতা সমর্পণ করবে, যার মধ্য দিয়ে আন্তর্জাতিকভাবে এক পাকিস্তান গঠিত হবে, কিন্তু জাতীয়ভাবে থাকবে দুটি পৃথক পাকিস্তান।

শেখ মুজিব আরো অগ্রসর হয়ে 'বাংলাদেশের সাড়ে ৭ কোটি মানুষে'র কথিত মানবাধিকার অস্বীকারের ব্যাপারে হস্তক্ষেপের আবেদন জানিয়ে জাতিসংঘের সেক্রেটারি জেনারেল উথান্টের কাছেও চিঠি লিখেছিলেন। যদিও পরবর্তীকালে যুক্তি দেখাতে গিয়ে তিনি বলেছেন যে, পূর্ব পাকিস্তান থেকে বিদেশীদের অভিনিক্রমণ বন্ধ করার প্রচেষ্টা হিসেবেই তিনি পদক্ষেপটি নিয়েছিলেন।

৯ মার্চ আমরা ইয়াহিয়া ও মুজিবের মধ্যে সেনাবাহিনীর কমিউনিকেশন নেটওয়ার্কের মাধ্যমে সরাসরি টেলিফোনে কথাবার্তার আয়োজন করেছিলাম। কারণ অসামরিক

কমিউনিকেশন সিস্টেম আওয়ামী লীগ দখল করে নিয়েছিল। এতটাই তখন ছিল সরকারি কর্তৃত্বের দুদর্শা।

মুজিবের কাছে ইয়াহিয়া একটি গোলটেবিল বৈঠক অনুষ্ঠানের প্রস্তাব দিয়েছিলেন, যাতে সেই সব দলের প্রতিনিধিরা অংশ নেবেন যারা জাতীয় পরিষদে আসন পেয়েছিলেন। মুজিব সম্মত হন, কিন্তু তাঁর উগ্র সহযোগীদের প্রতিরোধের মুখে পিছিয়ে গিয়ে বলেন যে, প্রস্তাবিত গোলটেবিল বৈঠক তাঁকে সংখ্যালঘিষ্ঠ দলে পরিণত করবে। জট খোলার প্রচেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে প্রেসিডেন্ট ঢাকা আসার সিদ্ধান্ত নেন। প্রেসিডেন্টের এই অভিপ্রায়ের কথা জানানোর পর প্রদত্ত এক বিবৃতিতে শেখ মুজিব বলেন যে, ইয়াহিয়াকে তাঁরা একজন অতিথি হিসেবে গ্রহণ করবেন, প্রেসিডেন্ট হিসেবে নয়। আওয়ামী লীগ প্রেসিডেন্ট হাউস দখল করে নিয়েছিল। তাঁরা এটার হস্তান্তর করতে এবং ছিন্ন করা বিদ্যুৎ ও পানির সংযোগ পুনরায় স্থাপন করতে সম্মত হয়েছিলেন।

প্রেসিডেন্ট ১৫ মার্চ ঢাকায় আসেন। ১৬ তারিখ সন্ধ্যায় এক সভা অনুষ্ঠিত হয় যাতে প্রায় সকল পশ্চিম পাকিস্তানী সিনিয়র অফিসার যোগ দেন। পরিস্থিতি পর্যালোচনার পর প্রেসিডেন্ট অত্যন্ত বিস্ময়কর ও তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য করেছিলেন। তিনি বলেন, ''জাতির পিতাও দুই পাকিস্তানের ধারণার বিরোধী ছিলেন না। তেমন একটি ধারণার বিরোধিতা করার আমি কে?'' ১৯৪৭ সালে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ স্বাধীন বৃহত্তর বাংলার ধারণাটি উপস্থাপিত করেছিলেন সোহরাওয়ার্দী। সাম্প্রতিকালে জনাব ভুট্টোও পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য দু'জন প্রধান মন্ত্রীর কথা বলছিলেন।

আমি ও গ্রুপ ক্যাপ্টেন মাসুদই কেবল পরিস্থিতির ব্যাপারে আমাদের মারাত্মক উদ্বেগের এবং মিলিটারি অ্যাকশনের বিপদের কথা ব্যক্ত করেছিলাম। প্রেসিডেন্ট আলোচনা ভেঙে যাওয়ার আশংকা নাকচ করে দেন এবং এর মধ্যে দিয়ে মনে হয়েছিল যে, তিনি এমন কি কনফেডারেশন গ্রহণ করার মতোও উদার মনোভাব দেখাবেন। আমরা নিশ্চিত ছিলাম যে, পূর্ব পাকিস্তানকে অধিকতর ক্ষমতা দিয়ে একটি ফেডারেশনের ধারণার মধ্যে সমস্যার সমাধান সম্ভব হতে পারে।

প্রেসিডেন্ট ও শেখ মুজিবের মধ্যে পর্যায়ক্রমিক আলোচনা শুরু হয়েছিল। দু'জনের উপদেষ্টাদের মধ্যেও কয়েক দফা আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। ইয়াহিয়াকে সাহায্য করেন জেনারেল পীরজাদা, বিচারপতি কর্নেলিয়াস, এম এম আহমদ ও কর্নেল হাসান। মুজিবের দলে ছিলেন কামাল হোসেন, তাজউদ্দিন আহমদ ও খন্দকার মোশতাক আহমদ। এ সকল আলোচনার বিষয়বস্তু অত্যন্ত গোপন রাখা হয় এবং কেউই এর ওপর কোনো মন্তব্য করেন নি। শেখ মুজিব একদিকে বলতে থাকেন যে, আলোচনার 'কিছুটা অগ্রগতি' হচ্ছে, অন্যদিকে তিনি 'বাংলাদেশ'-এর প্রচারণাও অব্যাহত রাখেন। সমগ্র এই সময়ব্যাপী ছাত্র,

শ্রমিক ও অন্যান্য সংগঠনের সভা ও মিছিল চলতে থাকে। প্রায় প্রতিদিন শেখ মুজিব তাঁর বাসভবনের সামনে আগত মিছিল-সমাবেশে বক্তৃতা করতেন এবং জনগণের প্রতি অসহযোগ আন্দোলনকে এগিয়ে নেয়ার আহ্বান জানাতেন। তাঁর কিছু জঙ্গী সহযোগী প্রেসিডেন্টের সঙ্গে আলোচনা চালানোয় সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট ছিলেন না, তাঁদেরকে 'বাংলাদেশ'-এর জন্য বিদ্রোহ করায় প্রস্তুত বলে মনে হচ্ছিল। এঁদের মধ্যে ছিলেন তাজউদ্দিন, সৈয়দ নজরুল ইসলাম, কর্নেল ওসমানী, ক্যাপ্টেন (অবঃ) মনসুর আলী, আবদুল মান্নান এবং ছাত্র লীগের সকল সদস্য। যখন আলোচনা চলছিল আওয়ামী লীগ কর্মীরা তখনও অস্ত্র ও গোলা-বারুদ সংগ্রহ করতে থাকে এবং সশস্ত্র বাহিনীর সঙ্গে সম্মুখ যুদ্ধের প্রস্তুতি এগিয়ে নেয়।

আমরা যারা প্রেসিডেন্ট হাউস থেকে পাঁচ মাইল দূরে সেনানিবাসে মার্শাল ল হেডকোয়ার্টারে বসেছিলাম, তাদেরকে আলোচনা কোন্ পথে অগ্রসর হচ্ছে সে ব্যাপারে অন্ধকারে রাখা হয়েছিল। আমাদের তথ্যের একমাত্র উৎস ছিল বিভিন্ন টেলেক্স ও সিগন্যাল, যেগুলো প্রেসিডেন্ট হাউস থেকে জনাব ভুট্টো ও পশ্চিম পাকিস্তানের অন্যদের পাঠানো হচ্ছিল। এমন কি জেনারেল টিক্কা খানকেও আলোচকদের দলে রাখা হয়নি এবং তিনিও প্রেসিডেন্ট হাউসে কি ঘটছে সে ব্যাপারে আমাদের মতোই অজ্ঞ ছিলেন।

হতাশা থেকে ১৯ মার্চ আমি কিছু খবর জানার জন্য শেখ মুজিবকে টেলিফোন করলাম। তিনি আমাকে জানালেন, একটি সমঝোতায় উপনীত হওয়া গেছে এবং প্রেসিডেন্ট একটি ঘোষণা জারি করবেন, যাতে ক্ষমতা হস্তান্তর ব্যবস্থার রূপরেখা থাকবে। তিনি আরো জানালেন যে, তিনি প্রধান মন্ত্রী হবেন এবং পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান থেকে পাঁচ জন করে মন্ত্রী নেয়া হবে। আমি জানতে চাইলাম, এই আয়োজনে তিনি সন্তুষ্ট কি না। তিনি সন্তুষ্ট বলে জানালেন এবং তাঁর সাফল্যের জন্য দোয়া করতে বললেন।

সমঝোতাটির ব্যাপারে জনাব ভুট্টোর অনুমোদন অত্যাবশ্যক ছিল। শেখ মুজিব এমন কি ভুট্টোর সঙ্গে কথা বলতেও অস্বীকার করেছিলেন। প্রেসিডেন্ট পরোক্ষ আলোচনার প্রস্তাব দেন, মুজিব এতে সম্মত হন। জনাব ভুট্টোকে আমন্ত্রণ জানানো হয়, তিনি ২১ মার্চ ঢাকায় আসেন। আওয়ামী লীগ যদিও তাঁকে গ্রহণ করার এবং তাঁর নিরাপত্তা বিধান করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, আমরা তথাপি তাঁর নিরাপত্তার ব্যাপারে উদ্বিগ্ন ছিলাম। ব্রিগেডিয়ার আরবাব তাঁকে প্রহরা দিয়ে রাখেন। জনগণের ক্রোধ ও বৈরী মনোভাব থেকে একথা স্পষ্ট হয়েছিল যে, জনাব ভুট্টোকে সেনাবাহিনীর প্রহরায় রাখার সিদ্ধান্তটি সঠিক ছিল। ভুট্টোর সঙ্গে সরাসরি কথা বলতে বা আলোচনায় বসতে মুজিব অস্বীকার করেছিলেন। ইয়াহিয়া, মুজিব, ভুট্টো এই তিনজন যদিও একই ছাদের নিচে মিলিত হচ্ছিলেন, তথাপি মুজিব ও ভুট্টোর মধ্যে কথাবার্তা চলছিল ইয়াহিয়ার মাধ্যমে। এতটাই ভুট্টোর প্রতি পূর্ব পাকিস্তানীদের বৈরিতা; জাতীয় পরিষদের অধিবেশন মুলতবি হওয়ার এবং তার পরিণতিতে সংঘটিত দাঙ্গা

ও হত্যাকাণ্ডের জন্য ভুট্টোকে পূর্ব পাকিস্তানীরা এক নম্বর ঘাতক হিসেবে চিহ্নিত করেছিল। ভুট্টো সমঝোতার ব্যাপারে আপত্তি জানিয়েছিলেন। তিনি একে 'পশ্চিম পাকিস্তানের প্রতি মারাত্মক বিশ্বাসঘাতকতা' বলে বর্ণনা করেন। তাঁর প্রস্তাব ছিল এই সমঝোতা অনুমোদন করার জন্য জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহ্বান করা হোক অথবা তাঁকে শেখ মুজিবের সঙ্গে আরো আলোচনা করতে দেয়া হোক। আওয়ামী লীগ নেতারা আরো আলোচনা ও যোগাযোগের দীর্ঘসূত্রতার প্রশ্নে আপত্তিতে অনড় হয়ে ওঠেন। স্বাধীনতা ঘোষণার জন্য শেখ মুজিবের ওপর চাপও চলতে থাকে।

আলোচনা চলাকালে আইন-শৃংখলা পরিস্থিতির আরো অবনতি ঘটেছিল। সশস্ত্র বাহিনীকে মৌখিক ও শারীরিক আক্রমণের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করা হয়েছিল। তাদেরকে সীমানার ভেতরে আবদ্ধ রাখার প্রচেষ্টা নেয়া হয়। তাজা সব্জি, ফল, মুরগি এবং অন্যান্য সামগ্রীর সরবরাহ বন্ধ করে দেওয়া হয়। ক্ষুদে বিক্রেতাদের জোর করে সেনানিবাসে প্রবেশ করা থেকে বিরত রাখা হয়। সেনাবাহিনীর ঠিকাদার ও সেনানিবাস এলাকার দোকানদারদের নাজেহাল করা হয় এবং সেনা পার্সোনেলদের কাছে কিছু বিক্রি করতে তাদের নিষেধ করা হয়। স্থানীয় ঠিকাদার ও দোকানদারা সশস্ত্র বাহিনীকে নতুন রেশন সরবরাহ করতে অস্বীকার করার ফলে আলু ও পেঁয়াজের মতো খাদ্যসামগ্রীগুলোকে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে বিমানযোগে আনাতে হয়েছিল। নিষ্ঠুর উপহাসটি ছিল এই যে, খাদ্যসামগ্রী বহনকারী সি-১৩০ বিমানকে স্থানীয় ও বিদেশী সংবাদ মাধ্যম সেনাবহনকারী বিমান হিসেবে চিত্রিত করে বলেছিল যে, শক্তি বাড়ানোর জন্য পশ্চিম পাকিস্তান থেকে বিমানটিতে করে সৈন্য আনা হচ্ছে। ঢাকা, খুলনা, চট্টগ্রাম, দিনাজপুর, সৈয়দপুর, রংপুর প্রভৃতি স্থানের অস্থানীয় লোকজনকেও একইভাবে নাজেহাল করা হতে থাকে এবং তাদের প্রতিও অমানবিক আচরণ করা হয়। এই হতভাগ্য মানুষগুলো আতংকের মধ্যে পড়ে যায়। ঢাকা ও চট্টগ্রামে আওয়ামী লীগের গুণ্ডারা উন্মত্ত হয়ে উঠেছিল। তারা অস্থানীয়দের বাসাবাড়িতে ঢুকে পড়ত এবং এগুলোর বাসিন্দা ও সম্পদের ব্যাপারে নিজেদের অশুভ ইচ্ছের বাস্তবায়ন ঘটাত। অস্থানীয়দের মধ্যে যারা আকাশ বা সমুদ্র পথে পশ্চিম পাকিস্তানে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছে, তাদের মূল্যবান জিনিসপত্র কেড়ে নেয়া হয়েছে। অরাজকতা সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছায় ১৯ মার্চ, যখন ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের একটি ব্যাটেলিয়ন পরিদর্শনের পর ব্রিগেড কম্যান্ডার আরবাব জয়দেবপুর থেকে ঢাকা ফিরে আসছিলেন। সড়ক প্রতিবন্ধক দিয়ে উন্মত্ত জনতা তাঁর পথ রোধ করেছিল। তাঁর প্রহরীরা রাস্তা পরিষ্কার করার চেষ্টা করলে তাদের ওপর গুলী চালানো হয়। রংপুরে একই ধরনের ঘটনায় একজন অফিসারসহ পাঁচজন সৈনিককে বহনকারী একটি ডজ গাড়ির ওপর জনতা হামলা চালায়। অফিসার চলে যাওয়ার ব্যাপারে আলাপ করতে চাইলে জনতা তাঁকে আটক ও প্রহার করার পর তাঁকে ছুরিকাঘাত

করে। আহত অফিসারটি পরে হাসপাতালে মারা যান। জনতা চারটি স্টেনগানও ছিনিয়ে নেয়। এসব কিছুই ঘটছিল যখন প্রেসিডেন্ট পূর্ব পাকিস্তানেই ছিলেন এবং সমস্যার রাজনৈতিক সমাধানের জন্য আলোচনা চালাচ্ছিলেন।

বিভিন্ন স্থান থেকে বিপুল পরিমাণ ভারতীয় অস্ত্রশস্ত্রের অনুপ্রবেশ এবং সেনাবাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত সদস্যদের দ্বারা আওয়ামী লীগের স্বেচ্ছাসেবক ও অসামরিক প্রশাসনের অন্যান্য সহযোগীর প্রশিক্ষণের রিপোর্ট আসছিল। নিয়মিত বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য কর্নেল ওসমানী একটি প্যারা মিলিটারি বাহিনী গঠন করতে ব্যস্ত ছিলেন। সেনাবাহিনীবিরোধী প্ররোচনামূলক তৎপরতার মাধ্যমে এই লোকগুলো সেনাবাহিনীর স্বাভাবিক কাজকর্মে সমস্যা সৃষ্টি করে চলছিল। মনে হচ্ছিল তারা যেন সেনাবাহিনীর সঙ্গে শক্তি পরীক্ষায় নামতে উৎসুক হয়ে পড়েছিল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস এ ধরনের কর্মকাণ্ডের ঘাঁটিতে পরিণত হয়েছিল এবং সেখানে বিপুল পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র, গোলা-বারুদ ও যানবাহন জড়ো করা হয়েছিল। ক্যাম্পাসকে প্রশিক্ষণ এলাকা হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছিল।

২৩ মার্চ ছিল শেখ মুজিবের আন্দোলনের সর্বোচ্চ পর্যায়। এটা ছিল একটি ঐতিহাসিক দিন। পাকিস্তান দিনটিকে প্রজাতন্ত্র দিবস হিসেবে উদ্‌যাপন করত। শেখ মুজিব দিনটিকে লাহোর প্রস্তাব দিবস হিসেবে উদ্‌যাপন করেছিলেন। সে ছিল এক চূড়ান্ত দিন, যেদিন শেখ মুজিব তাঁর বাসভবনে বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে বাস্তবে স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছিলেন। পূর্ব পাকিস্তানের প্রদেশে কেবল সেনানিবাসগুলোর ভেতরে সেদিন পাকিস্তানের পতাকা দেখা গিয়েছিল। শেখ মুজিব তাঁর বাসভবনের ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে হাজার হাজার অনুসারীর সামনে বাংলাদেশের পতাকাকে সম্মান দেখিয়েছিলেন, তাঁর অনুসারীরা সে সময় বাংলাদেশের সমর্থনে শ্লোগান দিচ্ছিল।

২৩ মার্চ নিজের গাড়ির ওপর বাংলাদেশের পতাকা উড়িয়ে শেখ মুজিব প্রেসিডেন্ট হাউসে এসেছিলেন। আওয়ামী লীগ প্রতিনিধি দল সেদিন চূড়ান্ত প্রস্তাব উপস্থাপন করেছিলেন। আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব তাজউদ্দিন দাবি মেনে নেয়ার জন্য ৪৮ ঘণ্টার সময় দিয়ে একে চূড়ান্ত হিসেবে আখ্যায়িত করে বলেছিলেন যে, তাঁরা আর কোনো আলোচনায় যাবেন না।

তাঁদের দাবিগুলো কি ছিল তা জানা যায়নি, কেবল এটুকুই জানা গেছে যে, সেগুলো পশ্চিম পাকিস্তানের ইয়াহিয়া ও ভুট্টোর নেতৃত্বের কাছে গ্রহণযোগ্য ছিল না। বিপর্যয় ও রক্তপাতের আশংকায় পশ্চিম পাকিস্তানের অন্য নেতারা ঢাকা ত্যাগ করতে শুরু করেছিলেন। রাজনৈতিক মীমাংসার সকল আশা অপসৃত হয়ে গিয়েছিল।

তখন এমন একটি পরিস্থিতি চলছিল যখন আওয়ামী লীগের দাবি মেনে নেয়া কিংবা মিলিটারি অ্যাকশনে যাওয়ার মধ্যে যে কোনো একটির পথ খোলা ছিল। এই পর্যায়ে

আপোস অসম্ভব হয়ে পড়েছিল। সেটা আগে সম্ভব ছিল। আওয়ামী লীগ নির্বাচনে অংশ নিয়েছিল। তাঁরা নিরংকুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেছিলেন, তাঁরা বিদ্যমান ব্যবস্থার মাধ্যমে ছয় দফা কর্মসূচী বাস্তবায়ন করতে চেয়েছিলেন। এক লোক এক ভোট ব্যবস্থা গৃহীত হওয়ার পর ঐক্যবদ্ধ পাকিস্তানে পূর্ব পাকিস্তানীদের স্বার্থ বৃদ্ধি পেয়েছিল। সবশেষে তারা পাকিস্তানকে শাসন করার সম্ভাবনা দেখেছিল। মুজিব পাকিস্তানের প্রধান মন্ত্রী হতে চেয়েছিলেন। তাঁদের কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ চরমপন্থী নেতা বাংলাদেশের স্বাধীনতার দাবি জানাচ্ছিলেন। জাতীয় পরিষদের অধিবেশন মুলতবির পূর্ব পর্যন্ত তাঁদেরকে নিয়ন্ত্রণে রাখা হয়েছিল। এই সময় থেকে তাজউদ্দিনের নেতৃত্বাধীন চরমপন্থীরা দলের রাজনীতি পরিচালনা করতেন। তাঁরা মুজিবকেও একথা বোঝাতে সক্ষম হয়েছিলেন যে, পশ্চিম পাকিস্তান কখনো সাংবিধানিক পন্থায় তাঁর কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরিত করবে না। তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন যে, সেনাবাহিনী ও পিপিপি-র সম্মিলিত শক্তি তাঁকে পাকিস্তানের প্রধান মন্ত্রী হওয়ার আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে দেবে না। সুতরাং তিনি একটি নতুন জাতির 'পিতা' হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন।

পাঞ্জাব ও সিন্ধুতে সাফল্য অর্জনকারী পাকিস্তান পিপলস পার্টি সমগ্র পশ্চিম পাকিস্তানের মতামত প্রতিনিধিত্ব করার দাবি জানাচ্ছিল। পশ্চিম পাকিস্তানের স্বার্থ রক্ষার নামে খাইবার থেকে করাচী পর্যন্ত আন্দোলনের সম্ভাবনা নিয়ে জনাব ভুট্টো এম এল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে মোকাবিলায় নেমেছিলেন। তিনি যেহেতু একজন জনপ্রিয় নেতা ছিলেন এবং তাঁর চমকপ্রদ ব্যক্তিত্ব যেহেতু পাকিস্তান সেনাবাহিনীর একদল সিনিয়র অফিসারকে প্রভাবিত করেছিল, সে কারণে প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়া জনাব ভুট্টোর সম্মতি ব্যতীত সংখ্যাগরিষ্ঠ দল তথা শেখ মুজিবের কাছে ক্ষমতার হস্তান্তর করতে পারেন নি।

প্রেসিডেন্ট দুটি চূড়ান্ত অবস্থানের মাঝখানে আটকে পড়েছিলেন। যেহেতু পাকিস্তানের সশস্ত্র বাহিনীর সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আগত, তাই নিজের অবস্থান রক্ষার উদ্দেশ্যে তিনি পশ্চিম পাকিস্তানের নেতৃবৃন্দকে সমর্থনের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। তিনি সরকারের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করার জন্য পাকিস্তান সশস্ত্র বাহিনীকে আদেশ দিয়েছিলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে তিনি নিজেও একজন জেনারেল ছিলেন, এমন কি কোনো অসামরিক ব্যক্তিত্ব যদি রাষ্ট্রপ্রধান থাকতেন, তাহলে তিনিও এ ধরনের পরিস্থিতিতে একই কাজ করতেন। পূর্ব পাঞ্জাবে মিসেস গান্ধী হুবহু একই রকম করেছিলেন। পিকিং-এ চীনারাও তাই করেছেন। কোনো রাজনীতিবিদ হলে হয়তো দুই রাজনৈতিক নেতাকে একটি সমঝোতায় নিয়ে আসার জন্য আরো ভালোভাবে এবং আরো কুশলী পন্থায় প্রচেষ্টা চালাতেন। কিন্তু যখন দুই সর্বোচ্চ নেতা ব্যক্তিগত ক্ষমতার জন্য বেঁকে বসলেন, তখন প্রেসিডেন্টের জন্য কূটকৌশলের অবকাশ সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছিল।

নীতিগতভাবে উভয় নেতার প্রতিই সমান ও সমতাপূর্ণ আচরণ করা উচিত ছিল। পাকিস্তানের সেনাবাহিনী কেবল পশ্চিম পাকিস্তানের সেনাবাহিনী ছিল না; এর কোনো পক্ষ নেয়া উচিত হয়নি। মুজিব ও ভুট্টো উভয়কেই বোঝানো উচিত ছিল যে, তাঁদেরকে পরস্পরের সঙ্গে একটি সমঝোতায় আসতে হবে। যারা ঢাকায় যাবে তাদের পা কেটে ফেলা হবে- এই হুমকি প্রদান করা থেকে যদি ভুট্টোকে বিরত করা যেত তাহলে পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিক্রিয়া অন্যরকম হত। জাতীয় পরিষদের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হতে দেয়া উচিত ছিল এবং আওয়ামী লীগ যদি সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোর খাটিয়ে কোনো অগ্রহণযোগ্য সংবিধান পাস করাতে চাইত, তাহলে সমগ্র পাকিস্তানের স্বার্থরক্ষক হিসেবে প্রেসিডেন্ট ভূমিকা রাখতে পারতেন। তিনি পিপিপি-র দিকে বেশি বেশি ঝুঁকে পড়ায় পূর্ব পাকিস্তানীদের সংশয় বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জন করেছিল। তারা শুধু পশ্চিম পাকিস্তানের নেতৃত্বের ওপর নয়, পাকিস্তানের নেতৃত্বের ওপরও আস্থা হারিয়েছিল।

মিলিটারি অ্যাকশন

১৯৭১ সালের ২২ মার্চ পর্যন্ত সেনাবাহিনী জানত না প্রেসিডেন্ট হাউসে কি ঘটছে। মেজর জেনারেল খাদিম হোসেন রাজা ছিলেন পূর্ব পাকিস্তানের একমাত্র ডিভিশন অর্থাৎ ১৪ ডিভিশনের জিওসি। আমি ছিলাম অসামরিক প্রশাসনের মেজর জেনারেল; কিন্তু যেহেতু তখন কোনো গভর্নর ছিলেন না এবং প্রশাসন চালাচ্ছিল আওয়ামী লীগ, তাই আমার কোনো কাজ ছিল না। ব্রিগেডিয়ার জিলানী, যিনি পরবর্তীকালে পাঞ্জাবের গভর্নর হয়েছিলেন, ব্রিগেডিয়ার মার্শাল ল ছিলেন। মার্শাল ল'-ও তাঁর ইচ্ছার প্রয়োগে ব্যর্থ হয়েছিল। ফলে জিলানীও বেকার হয়ে পড়েছিলেন, আমরা তিনজন এবং জিএইচকিউ থেকে আমাদের কাছে আগতরা বেশির ভাগ সময় কাটাতাম নিজেদের মধ্যে পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করে। পশ্চিম পাকিস্তানের বাজ পাখিরা আমাদেরকে পায়রা হিসেবে আখ্যা দিয়েছিল। আমাদের মত ছিল নির্বাচনের ফলাফল অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে; মুজিব জাতীয় পরিষদে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেছেন, সুতরাং তাঁকে সরকার গঠন করতে দেয়া উচিত। আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতাম যে, পাকিস্তানের সেনাবাহিনীকে পশ্চিম পাকিস্তানের সেনাবাহিনীর পরিচিতি দেয়া এবং কেবল পশ্চিম পাকিস্তানী নেতাদের ও স্বার্থের সমর্থকে পরিণত করা উচিত নয়। আমরা মনে করতাম, সমস্যাটি রাজনৈতিক সমস্যা ছিল এবং তার সমাধানও রাজনৈতিক পন্থায় হওয়া উচিত।

আমরা অবশ্য একথা লক্ষ্য করে হতাশ হয়েছি যে, মুজিব এবং ভুট্টো দু'জনই নিজেদের ক্ষমতার জন্য বেশি আগ্রহী ছিলেন। এটা ছিল এক ক্ষমতার সংঘাত এবং তাঁদের কাছে দেশের স্বার্থের কোনো মূল্য ছিল না।

আমরা আশাবাদী ছিলাম যে, শুভবুদ্ধির উদয় হবে এবং সে কারণে আলোচনার ব্যর্থতার পরিণতি মোকাবিলার উদ্দেশ্যে সেনাবাহিনী কোনো মারাত্মক প্রস্তুতি নেয়নি। ২১ মার্চ জনাব ভুট্টো ঢাকায় আসার আগে ২০ মার্চ পর্যন্ত এই আশাবাদ বজায় ছিল। এরপর

আকস্মিকভাবে পরিবেশ পরিবর্তিত হয়ে নৈরাশ্যের সৃষ্টি হয়। গুজব রটতে থাকে যে, আলোচনা ব্যর্থতার দিকে এগোচ্ছে। পশ্চিম পাকিস্তানী নেতাদের তৎপরতা থেকে এটা পরিষ্কার হয়ে যায়ঃ তারা পূর্ব পাকিস্তান থেকে চলে যেতে থাকেন। আমরা উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ি এবং প্রেসিডেন্ট হাউস থেকে সঠিক তথ্য জানার অনুরোধ নিয়ে ২২ মার্চ আমি ও খাদিম যৌথভাবে জেনারেল টিক্কা খানের সঙ্গে সাক্ষাত করি। জেনারেল টিক্কা খুবই নির্লিপ্তভাবে বলেন, "আমাদের জানার দরকার হলে তাঁরাই আমাদের জানাবেন।" যা হোক, দিনের মধ্যে কোনো সংবাদ না পাওয়ায় সন্ধ্যায় আবার আমরা তাঁর সঙ্গে দেখা করি এবং অনুরোধটি পুনর্ব্যক্ত করি। তিনি প্রেসিডেন্ট হাউসে গিয়ে পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত হতে রাজি হন।

২৩ মার্চ খুব সকালে তিনি আমাদের জানাতে গিয়ে বলেন, "ওহ, কুস হো রাহা হ্যায়, তৈয়ারি মৈয়ারি করো।" 'কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে, নিজেদের প্রস্তুত করো-' এটাই ছিল ১৪ ডিভিশনের জিওসিকে দেয়া কোর কম্যান্ডারের একমাত্র নির্দেশ। খাদিম আমাকে তাঁর ডিভিশনাল হেডকোয়ার্টারে যেতে বললেন, যেখানে পূর্ব পাকিস্তানে অবস্থানরত সশস্ত্র বাহিনীসমূহের বিভিন্ন শাখার জন্য 'অপারেশনাল ইন্সট্রাকশন্স' লেখার জন্য আমরা বসে গেলাম। আমাদের সামনে ছিল ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস এবং সেই সঙ্গে ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের বিদ্রোহের আশংকা। তাদের আনুগত্যের ইঙ্গিত পাওয়া গিয়েছিল জয়দেবপুরের ঘটনার মধ্য দিয়ে, যেখানে ২ বেঙ্গল রাইফেলস পরিদর্শন করতে গিয়ে ব্রিগেড কম্যান্ডার আরবাব সড়ক প্রতিবন্ধকের সম্মুখীন হয়েছিলেন। পশ্চিম পাকিস্তানের সৈন্যদের নিয়ে গঠিত তার ব্যক্তিগত এসকর্ট সেদিন তাঁকে শারীরিক ক্ষতি ও অপমানের কবল থেকে রক্ষা করেছিল। অপারেশনাল প্ল্যান প্রণয়নকালে আমাদেরকে নিচের সমস্যাগুলোর উত্তর নিয়ে ভাবতে হয়েছিল:

ক. বিদ্রোহের ঘটনা ঘটলে আমাদের সম্পদ-সঙ্গতি থাকবে কেবল দশটি ভাণ্ডারহীন ব্যাটেলিয়ন এবং সেই সাথে আর্টিলারি, ইঞ্জিনিয়ার্স ও সিগন্যাল ইউনিট-যাদের সব মিলিয়ে সংখ্যা হবে ১০,০০০ পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্য। এদেরকে ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের চারটি নিয়মিত আর্মি ব্যাটেলিয়ন ও বর্ডারসিকিউরিটি ফোর্সের সমর্থনপুষ্ট সমগ্র রেজিমেন্টাল সেন্টারের আনুমানিক ১২,০০০ ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলসের সৈনিক ও ১০০,০০০ মুজাহিদের বাধার সম্মুখীন হতে হবে। প্রশাসনের ওপর আওয়ামী লীগের নিয়ন্ত্রণ থাকাকালে পুলিশের তত্ত্বাবধানে রক্ষিত রাইফেল মুজাহিদদের হাতে তুলে দেয়া হয়েছিল। আমরা আনুপাতিকভাবে প্রতিকূল যুদ্ধ শক্তির মুখে পড়তে যাচ্ছিলাম, সেই সাথে ছিল পূর্ব পাকিস্তানের বিরাট এলাকা জুড়ে আমাদের ট্রুপসের ছড়িয়ে পড়ার অবশ্যম্ভাবিতা।

খ. ৭ থেকে ২৪ মার্চ পর্যন্ত রাষ্ট্রের সকল অঙ্গের নিয়ন্ত্রণে ছিল আওয়ামী লীগ। পূর্ব পাকিস্তানী উৎসের আর্মি অফিসার ও প্রাক্তন অফিসারদের নিয়মিত সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

পশ্চিম পাকিস্তানী এলিমেন্টদের আত্মসমর্পণে বাধ্য করার উদ্দেশ্যে তেজগাঁও বিমানবন্দর ও সেনানিবাস এলাকা দখল করার প্রস্তুতি নেয়া হয়েছিল। পিএএফ-এ পূর্ব পাকিস্তানীদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল এবং তারা সহজেই বিমান বন্দর দখল করে নিতে পারত। ২ ইবি আর অবস্থিত ছিল জয়দেবপুরে, সেনানিবাস থেকে যার দূরত্ব ছিল খুব বেশি হলে ১০ মাইল। অপারেশন করার ক্ষেত্রে সেনানিবাসের তিনটি ইউনিটকেই সিটি অপারেশনে অংশ নিতে হবে, যার ফলে সেনানিবাস উন্মুক্ত হয়ে পড়বে ২ ইবিআর কিংবা জনতার আক্রমণের জন্য। আমরা আগেই আওয়ামী লীগের একটি রহস্যময় পরিকল্পনার কথা উদ্‌ঘাটন করেছিলাম। পরিকল্পনা অনুসারে একটি সম্পূর্ণ ট্রেনভর্তি সশস্ত্র দাঙ্গাকারীদের আনার এবং সেনানিবাসের ভেতর দিয়ে যাওয়া রেল লাইনের মাঝখানে ট্রেনটি থামিয়ে দেয়ার কথা ছিল। এর ফলে সকল আবাসিক বাসাবাড়িই দাঙ্গাকারীদের জন্য উণ্মুক্ত হয়ে পড়ত, যার পরিণতি হত ভয়াবহ।

গ. বিভিন্ন সেক্টরের কম্যান্ডারদের যথোচিতভাবে ব্রিফিং দেয়ার মতো যথেষ্ট সময় তখন ছিল না। সুতরাং সিনিয়র অফিসারদেরকে হেলিকপ্টারযোগে ব্রিগেড হেডকোয়ার্টারগুলোতে গিয়ে ব্যক্তিগতভাবে ট্রুপসকে তাদের করণীয় ও মিশন ইত্যাদি সম্পর্কে বুঝিয়ে আসতে হচ্ছিল। আমাদের সবচেয়ে বড় উদ্বেগটি ছিল ইপিআর-এ বিদ্যমান জেসিও ও এনসিও-দের নিয়ে, যারা খুবই কম সংখ্যায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ছিল। ডিভিশনাল এইচকিউ তাদের ঢাকায় নিয়ে আসার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু বিভিন্ন স্থানের দূরত্ব ছিল খুব বেশি; ঘটনাকালে তাদের বেশির ভাগই নিহত হয়েছিল।

ঘ. আমরা সঠিকভাবে মূল্যায়ন করেছিলাম যে, রক্তপাত এড়াতে হলে প্রয়োজনে কূটচাল খাটিয়ে হলেও সকল রাজনৈতিক নেতাকে গ্রেফতার করা বুদ্ধিমানের কাজ হবে। সকল নেতার একটি সভা আহ্বান করে সেখানে তাঁদেরকে গ্রেফতার করার জন্য পেশকৃত আমাদের সুপারিশ প্রেসিডেন্ট হাউস থেকে গ্রহণ করা হয়নি। এর প্রেক্ষিতে ঢাকা ও অন্যান্য স্থানের সকল উল্লেখযোগ্য নেতার একটি তালিকা তৈরি করে সে সব স্থানে যাওয়ার এবং তাঁদেরকে গ্রেফতার করার জন্য বিভিন্ন দলকে দায়িত্ব দিয়েছিলাম। যা হোক, প্রেসিডেন্ট চলে যাওয়ার ফলে পরিকল্পনাটি ফাঁস হয়ে যায় এবং নেতারাও অদৃশ্য হয়ে যান। পুলিশের সহযোগিতা ব্যতীত পশ্চিম পাকিস্তানী আর্মির পক্ষে তাদের চিহ্নিত করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। একমাত্র শেখ মুজিব ছাড়া উল্লেখযোগ্য অন্য কোনো নেতাকেই গ্রেফতার করা সম্ভব হয়নি। কামাল হোসেন নিজেই মেজর জেনারেল মিঠার সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য এসে উপস্থিত হয়েছিলেন।

ঙ. আমরা বিগত অনেক বছরব্যাপী আন্দোলন তৎপরতার পর্যায়ক্রমিক তীব্রতার বৃদ্ধি দেখেছি এবং আমরা জানতাম কিভাবে প্রতিটি নতুন পর্যায় আরো বেশি সহিংস ও

ভালোভাবে সংগঠিত হয়ে থাকে। আমরা তাই সশস্ত্র বাহিনীর অ্যাকশনের বিরুদ্ধে আরো কঠোর এবং সম্ভবত সশস্ত্র প্রতিরোধের আশংকা করছিলাম, বিশেষ করে যেহেতু এটা প্রকৃতপক্ষে আওয়ামী লীগের শাসনোত্তরকালে ঘটতে যাচ্ছিল। আর্মি ব্যাপক রক্তপাত এড়াতে চেয়েছিল। যে কৌশল পরিকল্পিত ও শেষ পর্যন্ত গৃহীত হয়েছিল, তা ছিল শক্তি এবং প্রকৃত নিয়োজিতদের চাইতে বেশি গোলা বর্ষণ ক্ষমতা দেখানো। সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছিল যে, জিপের ওপর লাইট মেশিন গানের স্তূপ করে সেগুলোর ব্যারেল আকাশের দিকে উঁচিয়ে ট্রেসারমিশ্রিত বুলেট ফায়ার করা হবে যাতে মানুষকে রাস্তা থেকে দূরে রাখা যায়। সড়ক প্রতিবন্ধক হিসেবে নির্মিত দেয়াল ভেঙে ফেলার জন্য রকেট লান্সারের সঙ্গেও বন্দুক যুক্ত করা হয়েছিল। মানুষের জীবনহানি না ঘটিয়ে তাদেরকে বাড়ির মধ্যে আবদ্ধ রাখার উদ্দেশ্যে ভীতি ছড়িয়ে দেয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য এসব করা হয়েছিল। দুর্ভাগ্যক্রমে বিদেশী সংবাদ মাধ্যম এই প্রদর্শনীর ভুল ও বিকৃত তথ্য পরিবেশন করেছিল এবং জীবনহানি না ঘটানোর কৌশলকে গণহত্যা হিসেবে চিত্রিত করেছিল। ঢাকার রাজপথে খুব সামান্যই হতাহত হয়েছিল। এগুলো ঘটেছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও পুলিশ লাইনের যুদ্ধের সময়। আর্মিকে প্রতিরোধ করার উদ্দেশ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক সশস্ত্র ব্যক্তির সমাবেশ ঘটে, যারা ছিল সম্পূর্ণ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত। পুলিশ রাত প্রায় ১০টার দিকে বিদ্রোহ করে এবং পুলিশ লাইনের পাশের রাস্তা দিয়ে গমনরত আর্মির ওপর প্রথম গুলী বর্ষণ শুরু করে।

চ. সময় কম থাকায় বাইরের জেলাগুলোতে নিয়োজিত পশ্চিম পাকিস্তানের অসামরিক প্রশাসকদের অবহিত করা যায়নি এবং তাদের মধ্যে অনেকে প্রাণ হারিয়েছে। খুলনা সফরকালে আমি দু'জন তরুণ অফিসার উঠিয়ে নিই এবং তাদেরকে ঢাকায় নিয়ে আসি।

ছ. কতিপয় স্থানীয় কম্যান্ডার পরিমিত আচরণের সীমা অতিক্রম করেছিল, বিশেষ করে পিপলস ডেইলী (দৈনিক দ্য 'পিপলস') -এর বিরুদ্ধে অ্যাকশনের সময়। এই পত্রিকাটি আর্মির সমালোচনায় সকল নিয়ম-নীতির সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছিল।

অতএব, মিলিটারি অ্যাকশনের প্রস্তুতি যতটা হওয়া উচিত ছিল ততটা ব্যাপক ছিল না। ২৩ মার্চ রাজনৈতিক আলোচনা ভেঙে যায়। যেমনটি পরিকল্পিত ছিল তেমন জটিল অপারেশনের জন্য খুব বেশি সময় তখন ছিল না এবং পূর্ব পাকিস্তানের সর্বত্র ছড়িয়ে থাকা পশ্চিম পাকিস্তানী পার্সোনেলদের অবহিত করা যায়নি। এর কারণ একদিকে ছিল সময়ের স্বল্পতা এবং অন্যদিকে ছিল গোপনীয়তা রক্ষা করা।

জিওসি খাদিম একটি পরিকল্পনার রূপরেখা প্রণয়ন করেছিলেন। পরিকল্পনাটি বাস্তবায়নের সাধারণ ধারণা আমি লিখেছিলাম। আমরা বিকেলে ১৪ ডিভিশনের অফিসার্স মেসে সেটা আর্মির সিওএস জেনারেল হামিদের কাছে উপস্থাপন করি। জেনারেল টিক্কাও

উপস্থিত ছিলেন। নিচের দুটি অপরিহার্য বিষয় ছাড়া বাকি পরিকল্পনাটিকে তাঁরা অনুমোদন করেন:

ক. ইপিআর ও ইবিআরকে নিরস্ত্র করার জন্য আমাদের সুপারিশ অনুমোদিত হয়নি। চার্চিলীয় ধারায় জেনারেল হামিদ বলেছিলেন,"আমি পাকিস্তান আর্মির ভাঙনের ওপর সভাপতিত্ব করতে পারি না।" তিনি যদি আমাদের সুপারিশ গ্রহণ করতেন তাহলে ইপিআর ও ইবিআর-এর বিদ্রোহজনিত সামরিক বিরোধিতা ঘটত না এবং রক্তক্ষয়ের অনেকটাই এড়ানো সম্ভব হত। যা হোক, ঢাকায় ইপিআর কম্যান্ডারের পরোক্ষ সমর্থনে পিলখানায় ট্রুপসদের নিরস্ত্র করানো হয়েছিল এবং এর ফলে ঢাকায় শান্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা অনেক সহজ হয়েছিল।

খ. আমরা সুপারিশ করেছিলাম যে, প্রেসিডেন্টের ঢাকায় অবস্থান করা উচিত। আমাদেরকে বলা হয়েছে যে, বিদেশী রাষ্ট্রদূতদের অবহিত করার এবং দেশের স্বার্থে সাধারণভাবে বহির্বিশ্বের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার উদ্দেশ্যে তাঁকে পশ্চিম পাকিস্তানে ফিরে যেতে হবে। তিনি যে কেবল ঢাকায় অবস্থান করবেন না তা-ই নয়, তার বিমান করাচীর ৪০ মাইলের মধ্যে না পৌঁছানো পর্যন্ত আমাদেরকে অ্যাকশনে যাওয়া থেকেও বিরত রাখা হয়েছিল।

জিওসি খাদিম ও আমি নিজে প্রচণ্ড অশান্তির মধ্যে ছিলাম। আমরা মিলিটারি অ্যাকশনের বিরোধী ছিলাম এবং বহুবার আমাদের অভিমত জানিয়েছিলাম। অন্যদিকে ছিল কর্তব্যের ডাক এবং আর্মির শৃংখলার প্রশ্ন। আমরা প্রশিক্ষিত হয়েছিলাম খোলামেলাভাবে মতামত জানাতে, কিন্তু আদেশ একবার জারি হয়ে গেলে তা পালন করতেও। জেনারেল ইয়াকুব খানের পদত্যাগের পর পশ্চিম পাকিস্তানের আর্মি ও জনগণের মধ্যে যে প্রতিক্রিয়া হয়েছিল, সেটাও আমরা দেখেছিলাম। সকলেই তাঁকে 'হলুদ' হিসেবে চিত্রিত করেছিল। এখন যাঁরা অন্যরকম বলেন, তাঁরা সত্য বলছেন না। তাঁর পদক্ষেপের যদি সঠিক মূল্যায়ন করা হত তাহলে আমরাও পদত্যাগ করতাম। যা-ই হোক, মহাদুর্যোগটির পর যাঁরা আমাদের সমালোচনা করেছেন, তাঁদের জানা উচিত যে, সংকটের সময় যে কারো কাছেই দেশের প্রতি কর্তব্য প্রথমে চলে আসে।

মিলিটারি অ্যাকশনের ব্যাপারে আমাদের আপত্তি জানার পর পশ্চিম পাকিস্তান থেকে দু'জন জেনারেল ইফতিখার জানজুয়া ও মিঠাকে ঢাকায় আনা হয়েছিল এজন্য যে, আমরা কোনো রকম দোদুল্যমানতা বা দুর্বলতা দেখালে তাঁরা আমাদের কাছ থেকে দায়িত্ব কেড়ে নেবেন। মেজর জেনারেল মিঠার ওপর হাই কম্যান্ডের বেশি আস্থা থাকায় তাঁকে পরে জেনারেল টিক্কার ডেপুটি বানানো হয়েছিল। মেজর জেনারেল ওমর ও মেজর জেনারেল খুদা দাদও সে সময় ঢাকায় উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা সবাই তখন আগুনের মতো জ্বলন্ত

ছিলেন এবং আওয়ামী লীগের প্রতি কোমল মনোভাবের জন্য আমাকে ও খাদিমকে উপহাস করছিলেন। আমরা তাঁদেরকে বলেছি যে, আমরা নিজেদের জীবনের জন্য ভীত নই, আমাদের উদ্বেগ ছিল পাকিস্তানের জন্য। আমাদেরকে মিলিটারি অ্যাকশনের ব্যাপারে সম্মত করার চেষ্টায় এত দূর পর্যন্ত নির্বুদ্ধিতা দেখানো হয়েছিল যে, আমাদের দু'জনের স্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাতের অনুরোধ নিয়ে স্বয়ং জেনারেল হামিদ আমাদের বাসায় এসে উপস্থিত হয়েছিলেন। টিক্কা খান গভর্নর হিসেবে শপথ গ্রহণ করতে ব্যর্থ হওয়ার পর আমি গভর্নর হাউস থেকে চলে এসেছিলাম এবং খাদিমের বাসায় আমরা দু' পরিবার বসবাস করছিলাম। আলাপকালে জেনারেল হামিদ মিলিটারি অ্যাকশনের প্রতি আমাদের সমর্থন যুগিয়ে দেয়ার জন্য দু'জনের স্ত্রীকে অনুরোধ করেছিলেন, যাতে তাঁরা আমাদের বোঝান। আলাপের সময় আমরাও উপস্থিত ছিলাম। তাঁকে আমরা বলেছিলাম যে, আমরা অবশ্যই নির্দেশ প্রতিপালন এবং বাস্তবায়ন করব, কিন্তু তখনও আমরা মনে করি যে, মিলিটারির অ্যাকশন পাকিস্তানের জন্য ভয়াবহ হবে। ভালো সৈনিক হিসেবে আমাদেরকে প্রেসিডেন্ট ও আর্মির কম্যান্ডার-ইন-চিফ-এর সিদ্ধান্ত মান্য করতে হবে এবং সে কথা আমরা হামিদকে বলেছিলাম। আমাদেরকে সিদ্ধান্তের ভিত্তি ছিল সুশৃংখল আর্মির ঐতিহ্য। ১৯৮৪ সালের জুন মাসে ভারতীয় সৈন্যরা যখন অমৃতসরের স্বর্ণমন্দিরে আক্রমণ চালায় তখন সিনিয়র কম্যান্ডারদের বেশির ভাগ ছিলেন শিখ। তাঁদের ধর্মীয় আপত্তি সত্ত্বেও তাঁরা সরকারের আদেশ বাস্তবায়িত করেছিলেন।

মিলিটারি অপারেশনের জন্য কোনো তারিখ নির্ধারণ করা হয়নি। আমাদের অবশ্য বলা হয়েছিল যে, সময় খুব কম এবং সিনিয়র আর্মি অফিসাররা ব্যক্তিগতভাবে এসে নির্দেশ পৌঁছে দেবেন। চট্টগ্রাম ছিল সবচেয়ে সংকটপূর্ণ ও বিপজ্জনক এলাকা, সেখানে সমগ্র আর্মি পার্সোনেলই গঠিত ছিল বাংগালী ট্রুপসের সমন্বয়ে; রেজিমেন্টাল সেন্টারেরও কম্যান্ডার ছিলেন একজন বাংগালী ব্রিগেডিয়ার মজুমদার। জেনারেল খাদিম নিজে সেখানে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। যশোর ব্রিগেডের কম্যান্ডারকে ব্রিফ করার জন্য আমাকে খুলনা পাঠানো হল। সিওসি কোর-এর ব্রিগেডিয়ার আলী আল-এদরুস ও জিএস কোর-এর কর্নেল সাদউল্লাহ বেরিয়ে গেলেন সিলেট ও রংপুর/বগুড়ার ট্রুপদের ব্রিফ করতে। তারিখ নির্ধারণের জন্য একটি সাংকেতিক শব্দ জানিয়ে দেয়া হল।

আমার সার্বিক তত্ত্বাবধানে ঢাকায় ব্রিগেড কম্যান্ড করার দায়িত্বে ছিলেন ব্রিগেডিয়ার আরবাব। তিনি শহর বিস্তারিতভাবেই চিনতেন, তথাপি অবস্থা জানার ও তথ্যানুসন্ধানের জন্য এবং চিহ্নিত নেতাদের বাড়ি চেনার উদ্দেশ্যে ব্যাটালিয়ন কম্যান্ডারদেরকে অসামরিক পোশাকে বেরোতে হয়েছিল।

আসন্ন অপারেশনটি সাধারণ আর্মি অপারেশনের মতো ছিল না যেমনটি কার্ফিউ জারি করে মারাত্মক দাঙ্গা নির্মূল করার পর পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার মাধ্যমে অসামরিক

সরকারকে সহযোগিতা দানের উদ্দেশ্যে করা হয়ে থাকে। এখানে পরিস্থিতি ছিল সম্পূর্ণ অন্য রকম: ৭ মার্চের পর থেকে আওয়ামী লীগ সরকার চালাচ্ছিল। বাংগালীদের ভাবাবেগকে চরম পর্যায়ে উস্কে দেয়া হয়েছিল। শতকরা নব্বই ভাগ মানুষ মুজিবের জাদুদণ্ডে সম্মোহিত হয়ে পড়েছিল, তারা বাংলাদেশের জন্য জীবন দিতেও প্রস্তুত ছিল। তারা ছিল সশস্ত্রও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত। শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে সরকারের কর্তৃত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার প্রয়োজন ছিল। একটি বিদ্রোহ সংঘটিত হয়েছিল যাকে দমন করা অত্যাবশ্যক ছিল।

আমরা নির্দেশের অপেক্ষায় ছিলাম। ২৫ মার্চ আমি ও খাদিম জানতে পারি যে, প্রেসিডেন্ট কোর কম্যান্ডারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসবেন। তিনি এলেন। আমরা দু'জন ছাড়া সকল সিনিয়র অফিসার হামিদ, মিঠা, ইফতিখার, খুদা দাদ ও ওমর জেনারেল টিক্কার বাসভবনে উপস্থিত ছিলেন। আমরা দু'জনই সন্দেহের পাত্র ছিলাম। সন্ধ্যা ৬টার দিকে আমাদের জানানো হল যে, আজ রাতেই অপারেশন শুরু করতে হবে, কিন্তু রাত ১টার আগে নয়। কারণ প্রেসিডেন্ট আজই চলে যাচ্ছেন এবং তিনি করাচীর অভ্যর্থনা অঞ্চলে পৌঁছানোর আগে কোনো অ্যাকশন নেয়া যাবে না।

সাংকেতিক শব্দ ও সময় জানিয়ে নির্দেশ পাঠানো হয়েছিল। সূর্যাস্তের পর ট্রুপসের চলাচল শুরু হয়েছিল, কিন্তু তাদেরকে শহরে ঢুকতে দেয়া হয়নি। প্রেসিডেন্টের কার্যক্রম গোপন রাখা হয়েছিল। চমক বজায় রাখার জন্য একটি ছোট গাড়িতে করে কোনো রকম প্রহরা ছাড়া তিনি বিমানবন্দরে আসেন। কিন্তু তাঁরা জানতেন না যে, পিএএফ-এর উইং কম্যান্ডার খন্দকার (এ কে খন্দকার) টারমাকে তাঁকে বিদায় জানানোর জন্য দাঁড়িয়েছিলেন। তিনিই তার পরপর শেখ মুজিবকে জানিয়ে দিয়েছিলেন।

প্রেসিডেন্টের বিমান যখন করাচীর উদ্দেশে যাত্রা করছিল, শেখ মুজিব তখন তার সিনিয়র সহযোগীদের সঙ্গে বৈঠক করছিলেন। আমরা সেখানে গিয়ে সকল সিনিয়র নেতাকে আটক করার অনুমতি চেয়েছিলাম, এই পদক্ষেপটি নেয়া গেলে আন্দোলন পূর্ণ শক্তি অর্জন করার আগেই তাকে ধ্বংস করা যেত। তাহলে কোনো রক্তপাতও ঘটত না। কিন্তু প্রেসিডেন্টের নিরাপত্তার কারণে আমাদেরকে সে অনুমতি দেয়া হয়নি।

ঢাকা নগরীতে সেদিন অতি উত্তেজিত তৎপরতা পরিলক্ষিত হয়েছিল। অসংখ্য সড়ক প্রতিবন্ধক ও ব্যারিকেড তৈরি করা হয়েছিল। রাস্তা বন্ধ করার জন্য বিরাট বিরাট গাছ কেটে ফেলা হয়, রাস্তাগুলোকে পুড়ে আলকাতরা ও কয়লা দিয়ে আগুন ধরানোর আয়োজন করা হয় যাতে যানবাহন চলাচল করতে না পারে। তারা আর্মিকে সেনানিবাস থেকে বেরোতে না দেয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিল। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যেতে পারত। কারণ এই মর্মে রিপোর্ট আসছিল যে, বিমান বন্দর দখল করে নেয়ার উদ্দেশ্যে আওয়ামী লীগ নিজেই একটি অপারেশন চালাতে পারে। সুতরাং ইতিমধ্যে প্রদত্ত নির্দেশাবলী বাস্তবায়নের

জন্য আদেশ দেয়া হয়েছিল। স্পেশাল সার্ভিসেস গ্রুপের একটি প্লাটুন রাত ১টা ৩০ মিনিটে শেখ মুজিবুর রহমানকে তাঁর বাসভবন থেকে গ্রেফতার করে। তাদেরকে বেশ কিছু সড়ক প্রতিবন্ধকের মুখে পড়তে হয়। রাত দুটোয় টেলিফোন এক্সচেঞ্জগুলোকে বন্ধ করে দেয়া হয়। পিলখানায় রাত ২টা ৩০ মিনিটে ইপিআরকে (২৫০০) নিরস্ত্র করা হয়, তারা কিছুটা প্রতিরোধ করার প্রচেষ্টা নিয়েছিল। রিজার্ভ পুলিশ (২০০০), যারা কঠোর প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল, তাদেরকে নিরস্ত্র করা হয় রাত তিনটার মধ্যে। তাদের অনেক হতাহত হয়েছিল। ভোর রাত পাঁচটার মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস এলাকা দখল করা হয়। ইকবাল, লিয়াকত ও জগন্নাথ হলের ছাত্ররা কঠোর প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল। এদের মধ্যে সবচেয়ে মারাত্মক ছিল জগন্নাথ হলের প্রতিরোধ। আওয়ামী লীগের বিখ্যাত নেতাদের সকলের বাসভবনই ঘেরাও করা হয়েছিল, কিন্তু কাউকেই পাওয়া যায়নি। প্রাক্তন লেঃ কম্যান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন (আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা খ্যাত) অবশ্য গুলী বর্ষণ ও প্রতিরোধ করার চেষ্টা চালাতে গিয়ে নিহত হয়েছিলেন। ২৬ মার্চ সকালের মধ্যে প্রতিরোধের প্রধান পকেটগুলোর পতন ঘটায় বাড়তি কোনো অসুবিধে ছাড়াই ঢাকা নিয়ন্ত্রণে চলে এসেছিল। নারায়ণগঞ্জ অবশ্য প্রাক্তন সার্ভিসম্যানদের শক্তিশালী ঘাঁটি হিসেবে প্রমাণিত হয়েছিল। তারা সম্ভবত ঢাকা থেকে পালিয়ে গিয়েছিল। স্থানীয় অসামরিক জনগণকে সঙ্গে নিয়ে তারা এমন শক্তিশালী প্রতিরোধ সংগঠিত করেছিল যে, ট্যাংক বহরের সমর্থন নিয়ে একটি ব্যাটেলিয়ন ২৬ মার্চ সন্ধ্যায় নারায়ণগঞ্জ প্রবেশের চেষ্টা করলে তাদেরকে সাফল্যের সাথে প্রতিহত করা হয়।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পবিত্রতার অজুহাতে বিশ্ববিদ্যালয় অঙ্গন ধরা-ছোঁয়ার বাইরে ছিল, এমন কি পুলিশও সেখানে যেতে পারত না। ধ্বংসাত্মক তৎপরতার জন্য এটি একটি নিরাপদ স্বর্গ ছিল। ৭ মার্চের পর ছাত্রদের হলগুলো গেরিলা প্রশিক্ষণ শিবিরে রূপান্তরিত হয়েছিল। সেখানে প্রতিবন্ধক কোর্স, কাঁটাতার জড়ানো এবং অন্যান্য প্রশিক্ষণ পদ্ধতির বিকাশ ঘটানো হয় এবং ছাত্র ও স্বেচ্ছাসেবক নির্বিশেষে সকলকে প্রশিক্ষণ দেয়া হতো। জগন্নাথ হল, যেখানে হিন্দু ছাত্ররা বসবাস করত, ছিল পাকিস্তানবিরোধী তৎপরতার জন্য সবচেয়ে কুখ্যাত। এই হলটি সবচেয়ে মারাত্মক প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল। কোনো কোনো লোক বলে, আর্মি ছাত্রদের হত্যা করেছিল। একথাও একজনের জিজ্ঞেস করা উচিত, "একজন ছাত্র কখন আর ছাত্র থাকে না" তখনই একজন ছাত্র আর ছাত্র থাকে না, যখন সে অস্ত্র বহন করে- এই উত্তরটিই আর্মিকে অভিযোগ থেকে দায়মুক্ত করার জন্য যথেষ্ট। যারা নিহত হয়েছিল তাদের সকলেই অস্ত্র বহন করছিল, তারা গুলী বর্ষণ বন্ধ করতে এবং আত্মসমর্পণের আহ্বান গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছিল।

প্রদেশের অন্যান্য অংশের পরিস্থিতিও সুখকর ছিল না। সকলেই সাফল্যের ও স্বাভাবিক অবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠার অতিরঞ্জিত দাবি করেছিল। আমি যা দেখেছি তার ভিত্তিতে

পরিস্থিতির সঠিক চিত্র বর্ণনা করে এইচ কিউ সি এম এল-এতে আমি একটি সাংকেতিক বার্তা পাঠিয়েছিলাম। ২৮ মার্চের তারিখে প্রেরিত এই বার্তায় বলা হয়, 'আর্মি ঢাকা বিমান বন্দর এবং কুমিল্লা, সিলেট, রংপুর, সৈয়দপুর, খুলনা ও যশোর সেনানিবাসসমূহের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। তারা সকলেই বিচ্ছিন্ন। তাদের মধ্যে কোনো সড়ক যোগাযোগ বিদ্যমান নেই। চট্টগ্রাম বিদ্রোহীদের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে।'

প্রতিটি বাংগালী ইউনিটই বিদ্রোহ করেছিল। মেজর জিয়াউর রহমান তাঁর কম্যান্ডিং অফিসার কর্নেল জানজুয়াকে হত্যা করেছিলেন এবং নিজেকে প্রেসিডেন্ট হিসেবে ঘোষণা করে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছিলেন। তাঁরা চট্টগ্রাম শহর দখল করে নিয়েছিলেন। দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ও প্রচণ্ড সাহসিকতার সঙ্গে পশ্চিম পাকিস্তানীরা বিমান বন্দর এবং নৌ বাহিনীর এইচ কিউ এলাকা রক্ষা করেছিল। ৪ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট তাদের সিও-কে গ্রেফতার করে এবং আশুগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, আখাউড়া তথা কুমিল্লা ও সিলেটের মধ্যবর্তী এলাকাসমূহ দখল করে নেয়।

পশ্চিম পাকিস্তানী সৈনিক ও তাদের পরিবার সদস্যদের হত্যা করার পর ২ ইস্ট বেঙ্গল জয়দেবপুর থেকে বেরিয়ে যায়। সৌভাগ্যক্রমে তারা ঢাকা সেনানিবাসের বিরুদ্ধে এগিয়ে যায়নি, সেখানে কোনো নিয়মিত ট্রুপস ছিল না। তারা টাঙ্গাইল ও ময়মনসিংহ অঞ্চল দখল করে নেয়। বগুড়া ও তার দক্ষিণাঞ্চল বিদ্রোহী অসামরিক লোকজন দখল করে নিয়েছিল। পাবনায়ও একই ঘটনা ঘটেছিল। শুধু রাজশাহীর ক্যাম্প এলাকা পশ্চিম পাকিস্তানী ট্রুপসের দখলে ছিল। এক্স-খুলনার সমগ্র ব্যাটেলিয়নকে খুলনা, কুষ্টিয়া ও পাবনার মধ্যে ধ্বংস করে দেয়া হয়, এদের প্রচুর হতাহত হয়েছিল। বিদ্রোহীদের হাতে বন্দী সৈনিকদের ওপর মারাত্মক নৃশংসতা চালানো হয়। বল্লমের মুখে সৈনিকদের মস্তকসহ বিদ্রোহীদের অনেক ছবি বিদেশী সংবাদপত্রেও প্রকাশিত হয়েছিল। যশোর সেনানিবাস ছাড়া সম্পূর্ণ এলাকাই ১ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের সমর্থিত বিদ্রোহীদের দখলে চলে গিয়েছিল। খুলনা আর্মির নিয়ন্ত্রণে থাকলেও যশোর ও খুলনার মধ্যে কোনো সড়ক যোগাযোগ বিদ্যমান ছিল না। পটুয়াখালী, নোয়াখালী ও ফরিদপুর ছিল সম্পূর্ণরূপে বিদ্রোহীদের নিয়ন্ত্রণে।

২৮ মার্চের পরিস্থিতি ছিল অত্যন্ত মারাত্মক। আমরা অনুভব করছিলাম যে, পশ্চিম পাকিস্তান থেকে যদি রিইনফোর্সমেন্ট না আসে তাহলে বিচ্ছিন্ন ডিট্যাচমেন্টগুলো বিপর্যয়ের সম্মুখীন হতে পারে। ভারতীয়রা নীরব দর্শক ছিল না। তারা যশোর থেকে রাজশাহী সীমান্ত এলাকায় বিদ্রোহীদের সক্রিয়ভাবে সমর্থন দিচ্ছিল। রাজশাহীতে, যেখানে মাত্র ৪০০ সৈনিক ছিল, পরিস্থিতি অত্যন্ত অনিশ্চয়তাপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। উদ্ধারকারী কলাম পৌঁছানোর ঠিক প্রাক্কালে তাদের চারদিকে মাত্র ৮০০ গজ জায়গা বাকি ছিল। মর্টারসহ অস্ত্রসজ্জিত বিদ্রোহীরা আমাদের ট্রুপসের জীবনকে অসহনীয় করে তুলেছিল। সিলেটের ব্যাটেলিয়নকে

শহর ত্যাগ করতে হয়েছিল, ঢাকার সঙ্গে কিছুটা যোগাযোগ রক্ষার উদ্দেশ্যে বিমান বন্দরের চারদিকে তারা অবস্থান নিয়েছিল।

চট্টগ্রামকে সবচেয়ে সংকটময় এলাকা হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছিল। ব্রিগেডিয়ার ইকবাল শফির অধীনে কুমিল্লা থেকে একটি ব্যাটেলিয়নকে ২৫/২৬ মার্চ রাতে চট্টগ্রামের উদ্দেশে যাত্রা করার নির্দেশ দেয়া হয়। এই কলামটিকে সর্বত্রই মারাত্মক প্রতিরোধের সম্মুখীন হতে হয়, কম্যান্ডিং অফিসারসহ এদের যথেষ্ট সংখ্যক হতাহত হয়েছিল। চট্টগ্রামের ট্রুপসের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার আগে পর্যন্ত তারা শহরে পৌঁছাতে পারেনি। ২৬ মার্চ সকালে অর্থাৎ মিলিটারি অ্যাকশন শুরু হওয়ার পর পশ্চিম পাকিস্তান থেকে একটি ব্যাটেলিয়ন ঢাকায় এসে পৌঁছায়। এদেরকে অনতিবিলম্বে চট্টগ্রামে পাঠানো হয় এবং তারাই চট্টগ্রামে পরিত্রাতার ভূমিকা পালন করে।

৩১ মার্চ থেকে ৭ এপ্রিল পর্যন্ত পিআইএ এক বীরত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছিল, যা ছিল বার্লিনের এয়ার লিফট-এর সমমানের। শ্রীলংকার ওপর দিয়ে পিআইএ দুটি ইনফ্যান্ট্রি ডিভিশনকে নিয়ে আসে এবং এদেরকে অবিলম্বে বিভিন্ন সেক্টরে পাঠিয়ে দেয়া হয়।

১০ মে-র মধ্যে সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানকে আর্মির নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসা হয়, কিন্তু অপারেশন অপূরণীয় ক্ষতচিহ্ন রেখে যায়। উভয় পক্ষই নৃশংসতা চালিয়েছিল। সিভিল ওয়ার-এর বৈশিষ্ট্যই হল, এটা যে কোনো সংগঠিত যুদ্ধের চাইতে বেশি নিষ্ঠুর হয়ে থাকে। প্রচলিত যুদ্ধ নিয়ন্ত্রিত হয় জেনেভা কনভেনশনের আচরণ বিধি ও নৈতিক রীতিনীতি দ্বারা। কিন্তু সিভিল ওয়ারে কোনো নিয়ম ও নীতি থাকে না এবং মানুষ বন্য পশুর মতো আচরণ করে থাকে। এক্ষেত্রেও উভয় পক্ষই তেমন কাজ করেছে এবং প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছে। আমি বাংগালীদের নিষ্ঠুরতার একটি দৃষ্টান্ত দিতে পারি, যেখানে বিহারীদের একটি সম্পূর্ণ গ্রামকেই নিশ্চিহ্ন করে দেয়া হয়েছিল। ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় তিন শ' মহিলার মৃতদেহ পাওয়া গিয়েছিল, যেখানে একটি শিশুর মস্তক দেয়ালে গেঁথে রাখা হয়েছিল। সেখানকার পুরুষদেরকে আগেই জবাই করা হয়। ময়মনসিংহে শিশুদেরকে তাদের নিজেদের পিতাদের জন্য কবর খুঁড়তে বাধ্য করা হয়েছিল। চট্টগ্রামে ইস্ট পাকিস্তান রেলওয়ের সকল সিনিয়র সদস্যদের বিশেষভাবে নির্মিত একটি কসাইখানায় জবাই করা হয়েছিল। দিনাজপুরে বাংগালী মেয়েকে বিবাহকারী একজন পশ্চিম পাকিস্তানী ক্যাপ্টেনকে তার নিজের শ্বশুর হত্যা করেছিল, যার পর একটি মিছিলের আয়োজন করা হয়েছিল। বগুড়ায় ৬-৭ জনের একটি ক্ষুদ্র দলকে পরাভূত করার পর দায়িত্বে নিয়োজিত মেজরকে হত্যা করা হয়েছিল। ইন্টেলিজেন্স ব্যুরোর ডিরেক্টর জেনারেলকে টাঙ্গাইলের অ্যাসিস্টেন্ট কমিশনার হিসেবে নিযুক্তি দেয়া হয়েছিল। তাকে হত্যা করা হয় এবং তার দেহ শহরের রাস্তা দিয়ে টেনে হিঁচড়ে নেয়া হয়। ইপিআর-এ কর্মরত প্রায় ৭০০ জন এনসিও-র সকলকেই হত্যা করা হয়, আর্মি পার্সোনেলদের

বিচ্ছিন্ন পরিবারগুলোও একইভাবে নিহত হয়। একইভাবে পাকিস্তান আর্মিও একটি জাতীয় সেনাবাহিনী হিসেবে আচরণ করতে ব্যর্থ হয়েছিল। নিজেদের সঙ্গীদের ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন দেহ দেখে ভাবাবেগের কাছে তারা পরাভূত হয়ে পড়ে। এর সদস্যদের কেউ কেউ তাদের কর্তৃত্বের সীমা অতিক্রম করে এবং যথাযথ বিচার ছাড়াই অসংখ্য অসামরিক ও পুলিশ অফিসিয়ালকে হত্যা করে। বেশি ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাগুলোকে মুক্ত করার পর বিহারীরা যখন প্রতিশোধ নিতে শুরু করেছিল, আর্মি তখন তাদের নিয়ন্ত্রণ করতে সমর্থ হয়নি।

ভারত নীরব দর্শক হয়ে থাকেনি। আমরা ভারতের হস্তক্ষেপের আশংকা করেছিলাম এবং সেটাই প্রধান কারণ ছিল, যার জন্য ইয়াকুব, আহসান ও আমি মিলিটারি অপশনের বিরোধিতা করেছি। একথা বেরিয়ে এসেছে যে, ঢাকায় ভারতীয় হাই কমিশন আওয়ামী লীগ নেতাদের কাছে প্রত্যক্ষ সামরিক সমর্থন দেয়ার অঙ্গীকার করেছিল। পাকিস্তানের ভেতরে বেনাপোলে আমাদের ট্রুপস ভারতীয় বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্সের সদস্যদের সম্মুখীন হয়েছে, সিলেট এলাকায় দেখা গেছে কিছু গুর্খাকে। কিন্তু ভারতীয়দের প্রধান গুরুত্ব আরোপিত হয়েছিল মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধের ওপর। তারা পাকিস্তান আর্মির সহিংসতা সম্পর্কে অতিরঞ্জিত বিবরণী দিয়ে পূর্ব পাকিস্তানীদের উত্তেজিত করার উদ্দেশ্যে সর্বাত্মক বেতার প্রচারাভিযান শুরু করেছিল। হিন্দুদেরকে ভারতে চলে আসার জন্য তারা প্রকাশ্যে আমন্ত্রণ জানিয়েছে। তাদের আর্মি পার্সোনেল পাকিস্তানের আর্মি পার্সোনেলের সাজ নিয়ে, বিশেষ করে রাতের বেলায় নির্বিচার গোলাগুলীর মাধ্যমে সীমান্ত এলাকাগুলোতে আতংক সৃষ্টি করেছে। ভারতীয়দের প্রস্তুতি ছিল সর্বব্যাপী। মিলিটারি অ্যাকশনের আগেই তারা শরণার্থীদের জন্য শিবির তৈরি করেছিল। পশ্চিম বঙ্গ সরকারের জমি বরাদ্দ দেয়ার প্রস্তাবের সুযোগ গ্রহণের উদ্দেশ্যে হিন্দুরা অনেক আগেই দেশত্যাগ করতে শুরু করেছিল। হিন্দুদের কষ্ট দূর করার জন্য পাকিস্তান সরকার হিন্দু সম্পত্তি বিক্রির ওপর পঞ্চাশের দশকের প্রথম দিকে দেশত্যাগকে নিরুৎসাহিত করার লক্ষ্যে আরোপিত নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে নিয়েছিল। সরকারি রেকর্ডপত্রে দেখা যাবে, ১৯৬৮-৬৯ সালের সময় পর্বে ৮০ কোটি বা তারও বেশি টাকার সম্পত্তি হিন্দুরা বিক্রি করেছে। হিন্দুরা এই সম্পূর্ণ টাকাই ভারতে পাঠিয়ে দিয়েছে এবং পরে তারা নিজেরা গেছে সে টাকার ফলভোগ করতে। অপারেশনটি তার প্রকৃতির কারণেই হিন্দুদের দেশত্যাগকে সহজ করে দিয়েছিল। অপারেশন ঢাকার বাইরে বেশি হয়েছিল; ঢাকার কেন্দ্রীয় অবস্থান থেকে এর উত্তেজনা বাড়ানো হত। ঢাকাকে কেন্দ্র করা হয়েছিল, কারণ এখানেই ছিল একমাত্র বিমান বন্দর, যেখানে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আগত ট্রুপস অবতরণ করতে পারত। পাকিস্তান আর্মির অগ্রাভিযানের আগেই বিরাট সংখ্যক মানুষ ভারতে পালিয়ে গিয়েছিল। এদের অনেকে গেছে শোনা গল্প-কাহিনীর সৃষ্ট ভীতিতে, অনেকে

গেছে বিহারী ও পশ্চিম পাকিস্তানীদের ওপর চালিত নিজেদের নৃশংসতার শাস্তি পাওয়ার ভয়ে। ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস বিদ্রোহ করেছিল। সুতরাং সীমান্ত বন্ধ করা যায়নি।

বিদ্রোহীদের প্রতিরোধ ছিল অপ্রত্যাশিত রকম কঠোর। ২৫ মার্চ থেকে ১০ এপ্রিল পর্যন্ত সময় পর্বে বিদ্রোহীরা প্রদেশের বেশির ভাগ এলাকা নিয়ন্ত্রণ করছিল। তারা জেলা পর্যায়ে প্রশাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করেছিল এবং বিহারী ও পাকিস্তানপন্থী বাংগালীদের ওপর নিষ্ঠুর নৃশংসতা চালিয়েছিল। পাকিস্তান আর্মির নিয়ন্ত্রণ সীমাবদ্ধ ছিল সেনানিবাস এলাকায়। রেলওয়ের সম্পূর্ণ লাইনই বিদ্রোহীদের নিয়ন্ত্রণে ছিল, যাদের সঙ্গে এবার যুক্ত হয়েছিল নিয়মিত আর্মির বাংগালী ইউনিটগুলো। তখন এমন সময়ও গেছে যখন এমন কি আমাদের অজ্ঞাতসারে ভারতীয় ট্রুপসও রেলপথে পূর্ব পাকিস্তানের ভেতর দিয়ে কোলকাতা থেকে আগরতলায় যাতায়াত করেছে।

মিলিটারি অ্যাকশনের পর পশ্চিম পাকিস্তান থেকে দুটি ডিভিশন ঢাকায় আনা হয়েছিল। তাদের যেহেতু আকাশ পথে আনা হয়েছিল, সে কারণে তারা নিজেদের ভারি অস্ত্রশস্ত্র রেখে এসেছিল। সুতরাং তারা কেবল পুলিশের কর্তব্য পালন করতে পেরেছে। এদেরকে যদি অ্যাকশনের আগে নিয়োজিত করা হতো তাহলে বাস্তব অর্থেই বিদ্রোহকে নিয়ন্ত্রণ করা যেতো। হৃদয় কেবল রাজনৈতিক পন্থায়ই জয় করা সম্ভব হতো।

ভারতীয় ষড়যন্ত্র

বিদ্রোহীরা যে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল তা ছিল অপ্রত্যাশিত রকম কঠিন। অবশ্য ২৬ মার্চের পর আগত রিইনফোর্সমেন্টের ফলে ১৯৭১ সালের ১০ মে-র মধ্যে পাকিস্তান আর্মি সমগ্র পূর্বে পাকিস্তানই পরিষ্কার করতে পেরেছিল। প্রধান অসুবিধার সৃষ্টি হয়েছিল ভারতের কারণে এবং ভারত থেকে। ভারত পাকিস্তানকে ধ্বংস করার মতো একটি অজুহাত খুঁজছিল। এর রণকৌশল প্রণেতারা এবার পাকিস্তানকে খণ্ডিত করার জন্য শতাব্দীর এক সুযোগ পেয়ে গেলেন। ভারতীয়রা নিজেদেরকে সুবিধাজনক অবস্থানে দেখতে পেয়েছিল। কারণ পাকিস্তানীরা এমন এক অভ্যন্তরীণ যুদ্ধে জড়িয়ে গিয়েছিল, যেখানে মুসলমানরা মুসলমানদের হত্যা করছিল। এটা ছিল মুসলিম ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি। প্রকৃতপক্ষে সকল মুসলিম দেশ ও সরকারই অভ্যন্তরীণ সংঘাত ও অনৈক্যের কারণে শত্রু শক্তির শাসনাধীন হয়েছে। যে সব হিন্দু দেশত্যাগ করেছিল, ভারত সরকার তাদের স্বাগত জানিয়েছে। পূর্ব পাকিস্তানী সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদেরকে তাদের মূল ইউনিটগুলোতে রাখা হয়েছে। পূর্ব পাকিস্তানের চারদিকে সর্বত্র প্রশিক্ষণ শিবির খোলা হয়েছিল, যেখানে স্বেচ্ছাসেবকদের গেরিলা যুদ্ধের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। এদের বেশির ভাগই হিন্দু ছিল, যদিও তাদের মধ্যে কিছু মুসলমান ছাত্রও ছিল। এরাই পর্যায়ক্রমে মুক্তি বাহিনী গঠন করেছিল। কর্নেল ওসমানীকে জেনারেলের র‍্যাংকে পদোন্নতি দিয়ে এই বর্বর বাহিনীর অধিনায়কত্ব দেয়া হয়েছিল। বাংগালী ক্যাডারদের জন্য ভারতের প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলো উন্মুক্ত করে দেয়া হয়েছিল। সংক্ষেপে, ভারত প্রতিবেশীসুলভ আচরণের সকল নিয়মনীতি লংঘন করেছিল।

ভারতের এলাকায় স্বেচ্ছাসেবকদের পুনর্গঠিত করার ও প্রশিক্ষণ দেয়ার পর মুক্তি বাহিনীর গেরিলাদেরকে পূর্ব পাকিস্তানের অভ্যন্তরে প্রবেশ করানো হয়েছে। জনগণ পাকিস্তান আর্মির প্রতি শত্রুভাবাপন্ন হয়ে পড়ায় গেরিলাদের সাধারণ মানুষ সাদরে গ্রহণ করেছে। তাদেরকে নিরাপত্তা, খাদ্য ও আশ্রয় দেয়া হয়েছে। জনগণের শত্রুতার কারণ

অংশত ছিল মিলিটারি অ্যাকশন, কিন্তু প্রধান কারণ ছিল আর্মি বিরোধী বিদ্বেষপূর্ণ মারাত্মক প্রচারাভিযান। যে কোনো মিলিটারি অ্যাকশনেই প্রাণহানি ঘটে থাকে, যার ফল হয় প্রতিকূল প্রতিক্রিয়া। এই অবস্থাকে সমগ্র প্রদেশব্যাপী বাংগালী জাতীয়তাবাদের পক্ষে কাজে লাগানো হয়েছিল। এটা ভারতের জন্যও সুযোগের সৃষ্টি করেছিল, যাকে শরণার্থীদের প্রচন্ড চাপ আখ্যা দিয়ে ভারতীয় হস্তক্ষেপ ঘটানো হয়েছিল। আওয়ামী লীগের প্রায় সকল নেতাও ভারতে পালিয়ে গিয়েছিলেন, তাঁরাই সেখানে প্রবাসী সরকার গঠন করেছিলেন।

উভয় পক্ষের দোষের কারণে রাজনৈতিক সমঝোতা প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যাওয়ায় ২৩ মার্চ মিলিটারি অ্যাকশন অনিবার্য হয়ে উঠেছিল। মিলিটারি অ্যাকশনের অবশ্য নিজের ভেতরে কোনো শেষ নেই, এটা একটি সমাপ্তির পন্থা মাত্র। সমঝোতা প্রচেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার পর একজন যুদ্ধের পথে যায় শুধু আলাপ-আলোচনার টেবিলে ফিরে আসার উদ্দেশ্যে। কখনো কখনো বিরোধী পক্ষকে এ কথাটি বোঝানোর জন্যও মিলিটারি অ্যাকশন অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে যে, তারা সবকিছুই নিজেদের ইচ্ছানুসারে পেতে পারে না। কিন্তু তাই বলে বল প্রয়োগে বিরোধী পক্ষকে নিয়ন্ত্রণ বা উচ্ছেদ করার মধ্য দিয়ে অ্যাকশনটির সমাপ্তি ঘটানো উচিত নয়। বিরোধিতার কারণটি নির্মূল করা দরকার; তা না করা গেলে আগুন ধিকি ধিকি করে জ্বলতেই থাকবে। পূর্ব পাকিস্তানের ক্ষেত্রে আমাদের উচিত ছিল আওয়ামী লীগের দাবির একটি উত্তর খুঁজে বের করা। কারণ আওয়ামী লীগ সেই নির্বাচনটিতে সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনে জয় লাভ করেছিল, দুর্ভাগ্যক্রমে যা অনুষ্ঠিত হয়েছিল আর্মির তত্ত্বাবধানে। এ ব্যাপারে সন্দেহের সামান্যও অবকাশ নেই যে, আওয়ামী লীগ আন্দোলনের সাধারণ সীমা অতিক্রম করেছিল। তারা সরকার দখল করে নিয়েছিল, তারা বিদ্রোহ করেছিল। কিন্তু তাদের সমর্থন ছিল জনগণের মধ্যে। মিলিটারি অ্যাকশনের পাশাপাশি জনগণের ভীতি দূর করার জন্য রাজনৈতিক পদক্ষেপও নেয়া প্রয়োজন ছিল। সেজন্য প্রেসিডেন্টের ভাষণে অন্তর্ভুক্ত করার লক্ষ্যে আমি একটি লিখিত প্রস্তাব দিয়েছিলাম। আমার পরামর্শে আমি বলেছিলাম, প্রেসিডেন্টের বলা উচিত যে, শেখ মুজিবকে গ্রেফতার করা হয়নি, চরমপন্থীদের দখল থেকে বাঁচানোর জন্য তাঁকে কেবল নিরাপত্তামূলক হেফাজতে নেয়া হয়েছে। পূর্ব পাকিস্তানের জন্য প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের প্রসঙ্গসহ ভবিষ্যত রাজনৈতিক ও সাংবিধানিক আয়োজন সম্পর্কেও প্রেসিডেন্টের স্পষ্টভাবে বক্তব্য রাখা উচিত। আমি নিশ্চিত ছিলাম যে, শেখ মুজিবকে একবার কারাগারে নেয়া গেলে তিনি অর্থবহ আলোচনার ব্যাপারে অনেক বেশি আগ্রহী হয়ে উঠবেন, বৃহত্তর স্বায়ত্তশাসনের অঙ্গীকার করা হলে তা আন্দোলনকারীদের প্রশমিত করার কারণ সৃষ্টি করবে। দুর্ভাগ্যক্রমে এর পরিবর্তে একটি হত্যামুখী মিলিটারি অপারেশন শুরু করা হয়েছিল।

এমন কি আর্মি কম্যান্ডাররা-ও কেবল শক্তিতে বিশ্বাস করেছিলেন। মিলিটারি অ্যাকশনের কিছুদিন পর আমরা জানতে পেরেছিলাম যে, ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের সকলেই

বিদ্রোহ করলেও তারা তখনো পাকিস্তানের ভূখন্ডের ভেতরেই রয়ে গেছে এবং ভারতে চলে যায়নি, যেমনটি আশংকা করা হয়েছিল। আমরা যদি কোনোভাবে তাদেরকে পাকিস্তানে রেখে দিতে এবং ফিরিয়ে আনতে পারতাম, তাহলে আমাদের জন্যই ভালো হত। জেনারেল টিক্কা খানের স্থানে কোর কম্যান্ডার হিসেবে আগত লেঃ জেনারেল নিয়াজীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক অপারেশনাল মিটিং-এ আমি পরামর্শ দিয়েছিলাম যে, যারা পাকিস্তান কম্যান্ডের অধীনে ফিরে আসতে ইচ্ছুক, তাদের প্রতি সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করা হোক। জেনারেলদের মধ্যে একজন উচ্চ শব্দে হেসে উঠে বলেছিলেন, "আহ, আমরা আপনার রাজনৈতিক অভিমত সম্পর্কে শুনেছি।" তাঁদের মন ছিল বদ্ধ। জাতীয়ভিত্তিক মনোভঙ্গীর পরিবর্তে নিয়াজী ঐ একই সভায় যা বলেছিলেন, সে কথা শুনে আমি আহত হয়েছিলাম। তিনি বলেছেন, "আমাকে কেন রেশনের ঘাটতির কথা শুনতে হয়? আমরা যুদ্ধের মধ্যে রয়েছি। আমরা আছি শত্রুর ভূখণ্ডে। বার্মায় আমরা ভূমির ওপর বাস করেছি। আমাদের যা কিছু প্রয়োজন পড়েছে, আমরা সে সব মানুষের কাছ থেকে এনেছি। আপনারাও মানুষের কাছ থেকে নিয়ে নিন।" পাকিস্তানীদেরকে শত্রু হিসেবে ডাকতে শোনাটা ছিল সত্যিই ভীতিপ্রদ ব্যাপার!

যে সিদ্ধান্তগুলোর কারণে মিলিটারি অ্যাকশনে যাওয়া হয়েছিল, আমি সেগুলোর বিরোধিতা করেছিলাম। নির্দেশ পাওয়ার পর আমি অবশ্য আমার সাধ্যানুসারে কর্তব্য পালন করেছি। দুদিনের সামরিক কর্তব্যের পর আমি আবার সিভিল অ্যাফেয়ার্সের দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলাম। ঢাকার সকল রাজনৈতিক নেতার সঙ্গে আমি যোগাযোগ করি- জনাব নূরুল আমিন, খাজা খয়ের উদ্দিন, মওলভী ফরিদ আহমদ, জনাব শফিকুল ইসলাম, অধ্যাপক গোলাম আযম এবং অন্য সকলকে আমি এইচ কিউ এম এল এ-তে আসার জন্য অনুরোধ জানাই। তাঁরা জেনারেল টিক্কার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং সংবাদপত্রে একটি বিবৃতি দিতে ও শান্তি কমিটি গঠন করতে সম্মত হন। তাঁরা সত্যিকার অর্থেই অনুগত পাকিস্তানী ছিলেন।

১৯৭১ সালের ভারতীয় প্রচারাভিযান খুবই ফলপ্রসূ হয়েছিল। নিপীড়িত জনগণের কাছে তারা পাকিস্তানকে দুষ্কৃতকারী এবং নিজেদেরকে তাদের স্বার্থের সমর্থক হিসেবে চিত্রিত করতে সমর্থ হয়েছিল। বৈদেশিক বিষয়ে আমাদের জনগণের মধ্যে ঐক্য ও একাত্মতা না থাকায় এবং সরকারের প্রতিটি কার্যক্রমের সমালোচনা করার দুর্ভাগ্যজনক মনোভাবের কারণে পাকিস্তান প্রচার মাধ্যমে খারাপ প্রচারণা পেয়েছিল। দ্বিতীয়ত, বিদেশী পত্র-পত্রিকা পাকিস্তানবিরোধী ছিল। কারণ পাকিস্তান ছিল ইসরাইলবিরোধী। ইহুদীরা বিশ্ব সংবাদ মাধ্যমে প্রাধান্য বিস্তার করেছিল। তাদেরকে সমর্থন যুগিয়েছিলেন হিন্দু সাংবাদিকরা, যাঁরা ইউকে-র বেশির ভাগ ইংরেজী সংবাদপত্রে গুরুত্বপূর্ণ পদগুলো দখল করে রেখেছিলেন।

এসব প্রচারণার প্রভাব মোকাবিলা করার উদ্দেশ্যে মুসলিম লীগ, পিডিপি, জামায়াতে ইসলামী ও অন্যান্য ইসলামী দলের পাকিস্তানপন্থী নেতৃবৃন্দ খাজা খয়ের উদ্দিনকে চেয়ারম্যান করে সারা দেশব্যাপী একটি শান্তি কমিটি গঠন করেছিলেন।

প্রাথমিক পর্যায়ে শান্তি কমিটিগুলো চমৎকার ভূমিকা পালন করেছিল। ৭ এপ্রিল বা ৭ এপ্রিলের দিকে তারা পাকিস্তানের সমর্থনে ঢাকায় একটি বিশাল মিছিল বের করেছিলেন। পাকিস্তানপন্থী মানুষদের পুনরায় সক্রিয় করে তোলার উদ্দেশ্যে সমগ্র প্রদেশব্যাপী একই ধরনের কার্যক্রম গৃহীত হয়েছিল। আমাদের লক্ষ্য ছিল জনগণের হৃদয় জয় করার। এমন কি কিছু সংখ্যক আর্মি অফিসারও বাংগালীদের সঙ্গে ভাইয়ের মতো ব্যবহার করে পাকিস্তানের পক্ষে সমর্থন সংগঠিত করার জন্য সাধ্যানুসারে চেষ্টা করেছিল। সবচেয়ে বিশিষ্ট যাঁর নামটি আমার মনে পড়ছে, তিনি ছিলেন ব্রিগেডিয়ার (পরবর্তীতে মেজর জেনারেল) আবদুল্লাহ। রংপুরে তিনি পরিপূর্ণ ঐক্য সৃষ্টি করেছিলেন। ঢাকায়ও এই ধারাপথটি আর্মির অবলম্বন করা উচিত ছিল। কিন্তু এখানে দায়িত্বপ্রাপ্ত হিসেবে আমরা পেয়েছিলাম নিয়াজীকে; তিনি পূর্ব পাকিস্তানের জাতিগত কাঠামো পরিবর্তন করতে চেয়েছিলেন। প্রেসিডেন্ট ও জেনারেল হামিদের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎকালে আমি কোর কম্যান্ডারের অশোভন আচরণ সম্পর্কে তাঁদের অবহিত করেছিলাম, কিন্তু তাঁকে সংশোধন করার জন্য কিছুই করা হয়নি।

দুর্ভাগ্যক্রমে এক অপ্রত্যাশিত মহলের কারণে বিরোধ মিটিয়ে ফেলার ও মিলন ঘটানোর লক্ষ্যে আমাদের প্রচেষ্টা মারাত্মকভাবে ব্যাহত হয়েছিল। কারণটি ঘটিয়েছিল রিইনফোর্সমেন্ট ট্রুপসের আচরণ, যাদেরকে পূর্ব পাকিস্তানে আনা হয়েছিল। রিইনফোর্সমেন্টের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল সিভিল আর্মড ফোর্সেস। এরা সাহসী যোদ্ধা ছিল, কিন্তু অশিক্ষিত থাকায় তারা মনস্তাত্ত্বিক ও ধর্মীয় প্রচারণায় বেশি উন্মুখ ছিল। ঢাকা আসার আগে তাদেরকে নিশ্চয়ই কেউ বলেছিল যে, বাংগালীরা ইসলামী রাষ্ট্র পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে; কারো কারো কাছে বাংগালীদের নিশ্চয়ই কাফের হিসেবে চিত্রিত করা হয়েছিল। সিএ এফ-এর পার্সোনেল ভালো আচরণ করেনি, যার ফলে প্রশাসনকে অসুবিধায় পড়তে হয়েছে এবং শান্তি কমিটির ক্ষত সারানোর প্রচেষ্টা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এজন্যে তাদেরকে শহরের বাহিরে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছিল। তারা অপারেশনে ভালো কৃতিত্ব দেখিয়েছে। জনগণের নিরাপত্তা বিধানের উদ্দেশ্যে রাজাকার নামের নতুন একটি বাহিনী তৈরি করা হয়েছিল। সামগ্রিকভাবে তারা চমৎকার ভূমিকা রেখেছিল। মুক্তিবাহিনীর কিছু লোকজন রাজাকারে অনুপ্রবেশ করেছিল, যার ফলে স্বপক্ষ ত্যাগের ঘটনা ঘটেছে। একজন অসামরিক গভর্নর নিযুক্ত হওয়ার পর নিষ্পত্তির নীতি সূচিত হয়েছিল। কিছু সংখ্যক চলে এসেছিল, সম্ভবত ভারতীয়দের নির্দেশে। সংকটপূর্ণ সময়গুলোতে তারা বিদ্রোহ করেছে

এবং বিভিন্ন থানা দখল করে নিয়েছে যার ফলে পাকিস্তান আর্মির অবস্থান দুর্বল হয়ে পড়েছে।

অসামরিক প্রশাসনকে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে আনার এবং এর সংস্কার করার জন্য আমার প্রচুর করণীয় কাজ ছিল। সর্বত্র তখন বিভ্রান্তি চলছিল। বাস্তবে কোনো সরকারের তখন অস্তিত্ব ছিল না। আগেই বলা হয়েছে যে, ২৫ মার্চ পর্যন্ত প্রাদেশিক সরকার আওয়ামী লীগের নির্দেশে পরিচালিত হচ্ছিল। সুতরাং অফিসে যোগদানের জন্য সকল সরকারি কর্মচারির উদ্দেশে নতুন নির্দেশ জারি করার প্রয়োজন ছিল। স্কুল ও কলেজসমূহ আবার খোলানোর দরকার ছিল, শিক্ষক ও অধ্যাপকদের পুনরায় আশ্বাস দেয়া হয়েছিল যে, তাঁদের অতীত কার্যকলাপের জন্য তাঁদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেয়া হবে না। পাকিস্তানবিরোধী প্রচারাভিযানে সবচেয়ে সক্রিয় ছিল রেডিও-টেলিভিশন; ব্যাপক কোনো পরীক্ষা-নিরীক্ষা ছাড়াই এ দুটির কর্মচারীদের যার যার পদে নতুনভাবে কাজ করতে দেয়া হয়েছিল। প্রধান পদগুলোতে নতুন নিযুক্তি এবং তাদেরকে নীতি নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। রাস্তা মেরামত করতে হয়েছে। ফেরিগুলোকে অন্য স্থানে সরিয়ে ফেলায় মানুষের অসুবিধা হচ্ছিল; সেগুলোকে আবার চালু করতে হয়েছে। ঢাকা নগরীতে ও প্রদেশের অভ্যন্তরের কিছু এলাকায় খাদ্য ঘাটতি দেখা দিয়েছিল। আমদানিকৃত খাদ্যসামগ্রী চট্টগ্রামে ছিল; সে সবকে পরিবহনের আয়োজন করতে হয়েছে। পুলিশের কোনো অস্তিত্ব তখন ছিল না; তাদেরকে পুনরায় সমবেত ও আশ্বস্ত করতে হয়েছে। মিলিটারি অ্যাকশনের ফলে তাদের মনোবল মারাত্মক ঝাঁকুনি খেয়েছিল। পূর্ব পাকিস্তান বিশৃংখল অবস্থায় ছিল। অসামরিক প্রশাসক, পুলিশ ও রেডিও/টিভির জন্য রিইনফোর্সমেন্ট হিসেবে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে লোকজন আনা হয়েছিল। এখানকার পরিবেশে তাদের সকলেই নতুন ছিল। তদুপরি তাদেরকে এখানে নিয়ে আসার মধ্য দিয়ে পূর্ব পাকিস্তানী সরকারি কর্মচারিদের ওপর পরিষ্কার অনাস্থার প্রকাশ ঘটেছিল, এদিকে সে সময় এ ছাড়া কোনো বিকল্প ছিল না। সে ছিল এক ভয়ানক ও নৈরাজ্যজনক পরিস্থিতি। আমি চিফ সেক্রেটারি শফিউল আযমকে চিনতাম। তিনি বাংগালীপন্থী হলেও দেশপ্রেমিক পাকিস্তানী ছিলেন। তাঁকে যখন সরিয়ে দেয়া হয় তখন আমার খারাপ লেগেছিল।

আমার হৃদয়ে রক্তক্ষরণ হচ্ছিল। গভর্নর হাউসে বসে আমি পশ্চিম পাকিস্তানী, বিহারী ও বাংগালীদের কাছ থেকে হৃদয়বিদারক কাহিনী শুনছিলাম। আমার কাছে সকলেই ছিল পাকিস্তানী। এই তিন শ্রেণীর পাকিস্তানীই কারো না কারো হাতে নির্যাতিত হয়েছিল। আমি এখানে একটি মাত্র দিনের ঘটনার দৃষ্টান্ত উল্লেখ করব। আমার অফিসে কুমিল্লার ডিসি-র স্ত্রীর সঙ্গে কথা হল। তাঁর স্বামী পশ্চিম পাকিস্তানীদের হাতে নিহত হয়েছিলেন। তাঁর ভাই তাঁর সঙ্গে ছিলেন। তিনি এক পশ্চিম পাকিস্তানী মেয়েকে বিয়ে করেছিলেন। এই মেয়ের

পুরুষ আত্মীয়রা চট্টগ্রামে বাংগালীদের হাতে নিহত হয়েছিল। সেদিনই ময়মনসিংহ থেকে বিলাপ করতে করতে একদল মহিলা এল। তারা শোনাল বিহারীদের ওপর বাংগালীদের নৃশংসতার অসহনীয় কাহিনী। আর্মি অ্যাকশনের আগেই তারা তাদের সকল পুরুষ সদস্যকে হারিয়েছিল।

টাঙ্গাইলের ডিসি এলেন। ভীতসন্ত্রস্ত, হাত ভাঁজ করা এবং ছেঁড়া কাপড় গায়ে। তিনি জনতাকে সাহায্য করেছিলেন, যারা শেষ পর্যন্ত একজন পশ্চিম পাকিস্তানী এ সি-কে হত্যা করেছিল। কারো তখন করার কিছুই ছিল না, একমাত্র এই আশা নিয়ে ভুলে যাওয়া ও ক্ষমা করা ছাড়া যে, এমন সদিচ্ছার ফলে পাকিস্তানের পক্ষে সমর্থন জয় করা যাবে। আমি তাঁকে পুনর্বহাল করলাম এবং জেলা প্রশাসনের দায়িত্ব গ্রহণ করার জন্য ফেরত পাঠালাম। তিনি আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করেছিলেন এবং সন্তোষজনকভাবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন। আমি অবশ্য অন্য অসামরিক প্রশাসকদের বেলায় তেমন সফল হইনি, যাঁরা পাকিস্তান আর্মির হাতে গ্রেফতার হয়েছিলেন। নিয়াজী একটি কঠোরতর মনোভাব নিয়েছিলেন এবং তার প্রথম বক্তৃতায় ঘোষণা করেছিলেন যে, বাঙালীদের 'শত্রু' হিসেবে গণ্য করতে হবে। এটা ছিল এক জঘন্য মনোভাব, অন্তত বলার ক্ষেত্রে। যখন ফরিদপুর ও পটুয়াখালীর দুই ডিসিকে পাকিস্তান আর্মি গ্রেফতার করল, আমি তাঁদের মুক্তি দেয়ার জন্য অনুরোধ করেছিলাম। প্রত্যাখ্যাত হওয়ার পর আমি জেনারেল টিক্কা খানকে হস্তক্ষেপ করতে ও তাদের মুক্তির আদেশ জারি করতে বলি। আমি এ কথা লক্ষ্য করে আতংকিত হয়ে গেলাম যে, নিয়াজী টিক্কার অধীনস্থতা থেকে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে কাজ করছিলেন। প্রকৃতপক্ষে পূর্ব পাকিস্তানে, এমন কি মার্শাল ল-ও ব্যর্থ হয়েছিল এবং নগ্ন মিলিটারি রুল ক্ষমতা দখল করেছিল। আমরা যারা গভর্নর হাউসে ছিলাম, চূড়ান্ত মূল্যায়নে তারা ক্ষমতাহীন ছিলাম। নিয়াজীর নিজস্ব প্রিজন হাউস ও কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্প ছিল। গভর্নর হাউস, সেক্রেটারিয়েট কিংবা স্থানীয় অসামরিক প্রশাসকদের না জানিয়েই লোকজনকে গ্রেফতার করা হত। এর ফলে অনেক দুর্নীতির ঘটনা ঘটত। কিন্তু আমরা সবাই যেহেতু সর্বশেষ শক্তি হিসেবে আর্মির ওপর নির্ভর করতাম, তাই তাদের প্রভুত্বকে মেনে নিয়েছিলাম।

জেনারেল টিক্কা একজন ভালো প্রশাসক ছিলেন। তিনি নিজেকে অব্যাহতি দিতেন না, অন্যরাও তাঁর কাছে অব্যাহতি পেত না। তিনি সব সময় কর্মব্যস্ত থাকতেন। তিনি প্রতিদিন অসামরিক প্রশাসকদের সঙ্গে বৈঠক করতেন এবং সম্পূর্ণ ভেঙে পড়া অসামরিক প্রশাসনকে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে আনার ক্ষেত্রে তিনি চমৎকার সাফল্য দেখিয়েছিলেন। অবশ্য জনগণের হৃদয় জয় করার এবং রাজনৈতিক কৌশল প্রয়োগের কাজ তাঁর সাধ্যের বাইরে ছিল। তদুপরি নিয়াজী তাঁর কোনো সাহায্যে আসেন নি, বরং নিয়াজীর আচরণ বিপরীত ফলাফল ঘটিয়েছে।

মে মাসে জেনারেল হামিদ আবার ঢাকা সফরে এসেছিলেন। আমি আমাকে পশ্চিম পাকিস্তানে ফেরৎ পাঠানোর জন্য তাঁকে অনুরোধ করেছিলাম। কারণ আমার বিশ্বাসের বিরুদ্ধে একটি পরিবেশে আমি কাজ করতে পারছিলাম না। তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, কিন্তু পরিবর্তে ডেপুটি সেক্রেটারি পদমর্যাদার মাত্র দু'জন অধীনস্থ স্টাফের সদস্যসহ আমাকে রাজনৈতিক বিষয়ের মেজর জেনারেল হিসেবে বদলি করা হয়েছিল। যে সব সিদ্ধান্তের কারণে মিলিটারি অ্যাকশন হয়েছিল, আমি সেগুলোর বিরোধিতা করায় আমাকে অবজ্ঞা করা হচ্ছিল। জেনারেল হামিদের সঙ্গে বৈঠককালে আমি আর্মির ফিল্ড ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের পরিচালিত অবৈধ গ্রেফতার ও হত্যাকাণ্ড সম্পর্কেও তাঁকে অবহিত করেছিলাম। তিনি এ ধরনের কার্যক্রম বন্ধ করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন এবং নিয়াজীর কাছে তাঁর সে আদেশ পৌঁছে দেয়ার জন্য বিগ্রেডিয়ার (বর্তমানে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের গভর্নর) জানযুয়াকে নির্দেশ দিয়েছিলেন।

রাজনৈতিক বিষয়ের মেজর জেনারেল হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের পর প্রথম যে কাজটি আমি করেছিলাম, তা ছিল সকলের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শনের জন্য জেনারেল টিক্কার কাছে সুপারিশ। মিটমাট করার ও মিলন ঘটানোর, ক্ষত সারানোর এবং শেষ পর্যন্ত একটি রাজনৈতিক সমাধানের এটাই ছিল একমাত্র পথ। টিক্কা প্রস্তাবটিতে সম্মত হলেন এবং কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার সুপারিশসহ এইচ কিউ সি এম এল এ-র কাছে পাঠানোর জন্য একটি বার্তা অনুমোদন করলেন। অনুমোদনটি পেয়ে আমরা খুব উৎফুল্ল হলাম; রেডিওতে এই ক্ষমা ঘোষণা করা হল। আমরা অবশ্য আমাদেরকে তিরস্কার করে ক্ষমার আদেশ বাতিল করার নির্দেশ পেয়ে আহত হয়েছিলাম। আমাদের বিশ্বাসযোগ্যতার ওপর মানুষ আস্থা হারিয়ে ফেলল। এক বিরাট সংখ্যক এম এন এ, যাঁরা তখনও পূর্ব পাকিস্তানের অভ্যন্তরে ছিলেন তাঁরা রাজনৈতিক সমাধানের সকল আশা হারালেন এবং বিদ্রোহী প্রবাসী সরকারের সঙ্গে হাত মেলানোর উদ্দেশ্যে ভারতে চলে গেলেন। পশ্চিম পাকিস্তানের খুব কম সংখ্যক রাজনৈতিক নেতাই মিলিটারি অ্যাকশনের পর পূর্ব পাকিস্তান সফরে এসেছিলেন। যাঁরা এসেছেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন এয়ার মার্শাল আসগর খান, মওলানা তোফায়েল আহমদ, নওয়াবজাদা নসরুল্লাহ খান ও জেনারেল ওমরাও। এয়ার মার্শালের মতামত খুব পরিষ্কার ও ইতিবাচক ছিল, কিন্তু তিনি শুধু ঢাকায় অবস্থান করেছেন। মওলানা তোফায়েল ব্যাপকভাবে প্রদেশ সফর করেছিলেন এবং এই সফরের ফলে আর্মি জেনারেল নিয়াজীর তৈরী আল-শামস ও আল-বদর মুজাহিদদের ও রাজাকারদের সমর্থন পেয়েছিল। নওয়াবজাদার প্রস্তাবনা ও বক্তব্য যথারীতি ছিল জাতীয়তাবাদী ও দেশপ্রেমমূলক। কিন্তু তাঁর চিন্তাধারার লোকের সংখ্যা তখন হ্রাস পাচ্ছিল। জেনারেল ওমরাও-এর পূর্ব পাকিস্তান সম্পর্কে বিপুল অভিজ্ঞতা ছিল এবং সেখানে তাঁর

সুখ্যাতিও ছিল। কোনো সমঝোতায় আসার লক্ষ্যে তাঁর প্রচেষ্টা ফলপ্রসূ হয়নি। কারণ তিনি ছিলেন একজন জেনারেল। ঐ সময়ে পূর্ব পাকিস্তানে জনপ্রিয়তার দিক দিয়ে জেনারেলদের জনপ্রিয়তা ছিল সবচেয়ে ভাটার অবস্থানে।

আমরা আশা করেছিলাম, ১০মে'র মধ্যে সমগ্র প্রদেশকে নিয়ন্ত্রণে আনার পর প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া ঢাকা সফরে আসবেন। যখনই তাঁর সঙ্গে দেখা করেছি, আমি তাঁকে ঢাকা সফরে আসার জন্য অনুরোধ জানিয়েছি। তিনি সব সময়ই আসার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, কিন্তু কখনোই আসেন নি।

জুন মাসে জনাব নূরুল আমীনকে প্রেসিডেন্টের সঙ্গে বৈঠকের উদ্দেশ্যে রাওয়ালপিন্ডি যাওয়ার অনুরোধ জানানোর জন্য আমাকে বলা হয়। জনাব নূরুল আমীন রাওয়ালপিন্ডি সফরে যান। যদিও কিছুটা অনিচ্ছার সঙ্গে তিনি গিয়েছিলেন, তথাপি তাঁর বেশির ভাগ পরামর্শই প্রেসিডেন্ট গ্রহণ করেছিলেন এবং তিনি সরকারের সক্রিয় সমর্থকে পরিণত হয়েছিলেন। আমি তাঁর সঙ্গে গিয়েছিলাম। তিনিও ইয়াহিয়াকে ঢাকা সফর করার পরামর্শ দিয়েছিলেন। ইয়াহিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, কিন্তু আসেন নি। পরিবর্তে তিনি ইরান গিয়েছিলেন। ইরানে কোনোভাবে কিছু একটা সমাধানের যোগাযোগ হয়তো সম্ভব হত। কোলকাতায় অবস্থানরত বাংগালীরা ইচ্ছুক ছিলেন, ভারত সমস্যাটির শান্তিপূর্ণ সমাধান চায়নি; তারা পাকিস্তানকে ভাঙার শতাব্দীর সুযোগ পেয়ে গিয়েছিল। নিজেদের মধ্যে সংঘাতের মধ্য দিয়ে মুসলমানরাই মুসলমানদেরকে পরাজিত করার একটি সুযোগ করে দিয়েছিল। এর ফলে গান্ধীর ভাষায় ১০০০ বছরের মুসলিম শাসনের প্রতিশোধ নেয়ারও সুযোগ পেয়ে গিয়েছিল ভারত। ইরানের শাহ্‌র প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যায়। প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের একটি প্রতিনিধি দলের জাতিসংঘে যাওয়ার কথা ছিল। পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে খন্দকার মোশতাকের এই প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দেয়ার কথা ছিল। কিন্তু ভারত সরকারের নির্দেশে তাঁকে বাদ দেয়া হয়। মোশতাককে পাকিস্তানপন্থী হিসেবে সন্দেহ করা হত। প্রকৃতপক্ষে বাংগালী মুসলমানদের মধ্যে যাঁরা কোলকাতা গিয়েছিলেন, তাঁদের অনেকেরই সেখানে যাওয়ার পরপর মোহ ভঙ্গ ঘটেছিল। তাঁরা দেখতে পান যে, পশ্চিম বাংলার তুলনায় পূর্ব পাকিস্তানের অনেক বেশি উন্নয়ন হয়েছে এবং পশ্চিম পাকিস্তানের বিরুদ্ধে তাদের অভিযোগ সত্যনির্ভর নয়। সেখানে বসবাসরত মুসলমানরা তাদেরকে কোলকাতায় হত্যাকাণ্ডসহ বিভিন্ন ঐতিহাসিক ঘটনার কথা স্মরণ করিয়ে দেন। পাকিস্তান সৃষ্টির মূল কারণটি তাঁদের সামনে তীক্ষ্ণভাবে উপস্থিত হয়েছিল, যখন তাঁরা সেখানকার মুসলমানদের দুরবস্থা দেখেছিলেন।

জুলাই মাসে ভবিষ্যত কর্মপন্থা নিয়ে প্রেসিডেন্ট জনাব নূরুল আমীনের সঙ্গে আলোচনা করেছিলেন। সকলেই একমত হন যে, পূর্ব পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি এমন এক

স্থিতিশীল পর্যায়ে এসেছে যখন কোনো রাজনৈতিক পদক্ষেপ নেয়া যেতে পারে। প্রেসিডেন্ট আমাদের জানালেন যে, তিনি জেনারেল টিক্কার স্থলে একজন সিভিলিয়ান গভর্নর নিযুক্তি দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তাঁর মনে ডাঃ মালিকের নাম রয়েছে। ডাঃ মালিক পূর্ব পাকিস্তানের একজন সম্মানিত রাজনীতিবিদ এবং তিনি আইউব সরকারের মন্ত্রী ছিলেন। টিক্কা একজন সফল কম্যান্ডার ছিলেন। মূলত একজন সৈনিক হিসেবে তিনি অনুগত, স্পষ্টভাষী ও সৎ ছিলেন। কেউ কেউ তাঁকে কঠোর ও নির্দয় মনে করেন, তাঁকে একজন কসাই হিসেবে আখ্যা দেয়া হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে টিক্কা ছিলেন খুবই কোমল হৃদয়ের ভদ্রলোক। তিনি একজন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ কম্যান্ডার ছিলেন। প্রতিকূলতা কখনো তাঁকে বিচলিত করতে পারেনি। আমি নিশ্চিত, তিনি যদি কম্যান্ডে থাকতেন তাহলে পূর্ব পাকিস্তানে আর্মি অনেক ভালো ফলাফল করতে পারত।

সামনের কঠিন দিনগুলোর কথা অনুমান করে আমি প্রেসিডেন্টকে অনুরোধ জানিয়েছিলাম যাতে টিক্কাকে কেবল গভর্নরের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিয়ে পূর্ব পাকিস্তানের ট্রুপসের কম্যান্ডে রাখা হয়। প্রশাসনের অসামরিকীকরণের তখন প্রয়োজন ছিল ও রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগের দায়িত্ব পালনের জন্য টিক্কাকে উপযুক্ত মনে করা হয়নি। বৃটিশ লেবার পার্টির সংসদীয় প্রতিনিধি দল প্রকাশ্যে এবং খোলামেলাভাবে রাজনৈতিক পরিস্থিতি সামাল দেয়ায় টিক্কার যোগ্যতার ব্যাপারে সমালোচনা করেছিল। একটি পরিবর্তন প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল, কিন্তু কম্যান্ডার পদে তাঁকে ধরে রাখাটা বিচক্ষণ পদক্ষেপ হত। নিয়াজী আগেই টিক্কাকে অব্যাহতি দিয়েছিলেন। স্বল্প সময়ের মধ্যে অশ্লীলভাষী ও উচ্ছৃংখল চরিত্রের লোক হিসেবে নিয়াজী কুখ্যাতি পেয়েছিলেন। তিনি কি ছিলেন তা কেবল তিনি বা তাঁর খোদাই জানেন, কিন্তু তাঁর কথাবার্তা ছিল অশ্লীল এবং ব্যবহার ছিল লজ্জাকর। আমি প্রেসিডেন্টকে সব কাহিনীই শুনিয়েছিলাম, যেগুলো ঢাকার সর্বত্র নিয়াজী সম্পর্কে ভেসে বেড়াচ্ছিল। আমি তাঁর নিরাপত্তার ব্যাপারেও উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলাম। কারণ তিনি কোনো এসকর্ট ছাড়া রাতের বেলায় কুখ্যাত রমণীদের বাড়িতে যেতেন বলে জানা যেত। একটি গেরিলা যুদ্ধের পরিবেশে শত্রুপক্ষ অফিসারদেরকে প্রলুব্ধ ও প্ররোচিত করার কাজে নারীদের ব্যবহার করে এবং সবচেয়ে সিনিয়ার কম্যান্ডার যদি তাদের ফাঁদে আটকে যান, তাহলে শত্রুদের লক্ষ্য অর্জিত হয়ে যায়। প্রেসিডেন্ট আমার অনুরোধ রক্ষা করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। আগস্টে আবার আমাদের সাক্ষাৎ হয়। তিনি আমাকে বলেন যে, ডাঃ মালিকের সঙ্গে টিক্কা সম্পর্কে তাঁর আলোচনা হয়েছে। শর্ত সাপেক্ষে ডাঃ মালিক গভর্নর হতে রাজি হয়েছেন জানিয়ে প্রেসিডেন্ট বললেন, তাঁর শর্তগুলোর মধ্যে একটি হল টিক্কাকে পশ্চিম পাকিস্তানে ফিরিয়ে নিতে হবে। ডাঃ মালিক ভেবেছিলেন, যদি প্রাক্তন গভর্নর ট্রুপসের কম্যান্ডার হিসেবে অবস্থান করেন তাহলে সেটা

তাঁর জন্য অস্বস্তিকর অবস্থার কারণ ঘটাবে। তাঁর দ্বিতীয় শর্তটি ছিল, সকলের জন্য সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করতে হবে। তাঁরা যদি ভারতে চলে গিয়ে থাকে কিংবা তখনো পূর্ব পাকিস্তানের ভেতরে থেকে থাকে অথবা কোনো অপরাধমূলক কাজও করে থাকে, তবু সকলকে ক্ষমা করতে হবে। ক্ষমার ব্যাপারেও প্রেসিডেন্ট সম্মত হয়েছিলেন এবং পরে তা ঘোষণা করা হয়েছিল।

একথা পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল যে, মুক্তিবাহিনীর বহুল প্রচারিত বর্ষাকালের আক্রমণ নিয়ন্ত্রণ করা গেলেও ধ্বংস করা যায়নি। একথাও স্পষ্ট হয়েছিল যে, শুধু আর্মি অ্যাকশন দিয়ে সমস্যার সমাধান করা সম্ভব হবে না। এজন্য প্রয়োজন রাজনৈতিক যোগাযোগ, আলাপ-আলোচনা ও সমাধান। শেখ মুজিব ও আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের সঙ্গে সংলাপ ছিল একমাত্র সঠিক সমাধান। পরিবর্তে বিকল্প একটি রাজনৈতিক উদ্যোগ নেয়া হয়েছিল।

জুলাই-আগস্টের সভাগুলোতে আলোচিত প্রধান বিষয়টি ছিল ভবিষ্যত রাজনৈতিক অ্যাকশন। সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যে, যে সকল এম এন এ/ এমপি এ কোলকাতায় চলে গিয়েছিলেন এবং অপরাধ কর্ম করেছিলেন, তাঁদেরকে অযোগ্য ঘোষণা করা হবে এবং সে সব শূন্য আসনে উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্পন্ন হওয়ার পর জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহ্বান করা হবে। জাতীয় পরিষদ সদস্যদের অযোগ্য ঘোষণা করার জন্য আমি একটি বিকল্প কোর্স অফ অ্যাকশনের পরামর্শ দিয়েছিলাম, আমার মতে যা সংবিধানসম্মত এবং বেশি সুষ্ঠু রাজনৈতিক চাল হতে পারত। আমার পরামর্শ ছিল জাতীয় পরিষদের অধিবেশন ডাকা হোক, একটি তারিখ নির্ধারণ করা হোক এবং তা ঘোষণা করা হোক। অধিবেশনে যাঁরা যোগ দেবেন না, তাঁদেরকে অযোগ্যতার জন্য নির্ধারিত মেয়াদের পর অযোগ্য ঘোষণা করা হবে। কেউই অমন একটি প্রক্রিয়ার ব্যাপারে আপত্তি জানাতে পারবেন না। আমাদেরকে অবশ্য পাশ কাটিয়ে যাওয়া হয়েছিল এবং অযোগ্য হিসেবে ঘোষণার উদ্দেশ্যে এম এন এ/এমপিএ-দের তালিকা প্রণয়ন করার জন্য গোয়েন্দা সংস্থাগুলোকে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। যখন প্রয়োজন হবে তখন নির্বাচন অনুষ্ঠান করার জন্য আমাদেরকে প্রস্তুতি নিতে বলা হয়েছিল। আমি প্রস্তাব দিয়েছিলাম যে, নির্বাচন অক্টোবর মাসে সম্পন্ন করা হোক। কারণ নভেম্বর-পরবর্তীকালে ভারতের পক্ষে পূর্ব পাকিস্তানে মিলিটারি অপারেশন চালানো সম্ভব। সকল মিলিটারি পর্যালোচনায় দেখা গেছে যে, পূর্ব পাকিস্তানে আক্রমণাত্মক অপারেশন চালানোর সবচেয়ে ভালো সময় হলো নভেম্বর। আমার মত ছিল নভেম্বরের মধ্যে একটি যুদ্ধের মোকাবিলা করার জন্য আমাদের প্রস্তুতি নেয়া উচিত এবং তার আগেই আমাদের যদি একটি রাজনৈতিক সরকার থাকে তাহলে ভারতের পক্ষে সামরিক পন্থায় বিষয়টির নিষ্পত্তি করা কঠিন হয়ে পড়বে। প্রস্তাবটি গৃহীত হয়েছিল এবং নির্বাচনের জন্য অক্টোবর মাসকে বেছে নেয়া হয়েছিল।

দুর্ভাগ্যক্রমে নির্বাচনকালে নিরাপত্তা বিধানের উদ্দেশ্যে আর্মি ও পূর্ব পাকিস্তানের এইচ কিউ এম এল অতিরিক্ত লোক নেয়ার মাধ্যমে রাজাকার বাহিনীর শক্তি বাড়াতে চেয়েছিল এবং সেজন্য তাদের সময়ের প্রয়োজন ছিল। গভর্নর ও আমাকে না জানিয়েই নির্বাচনের তারিখ পরিবর্তন করে নভেম্বরে নেয়া হয়েছিল।

ভারতীয়রা চায়নি যে, আমরা রাজনৈতিকভাবে স্থিতিশীল হই। তারা যখন জানতে পারল যে, আমরা উপনির্বাচন অনুষ্ঠান করতে যাচ্ছি, তখনই তারা গেরিলা ও নিয়মিত যুদ্ধ তৎপরতা তীব্রতর করার জন্য মুক্তি বাহিনীকে নির্দেশ দিয়েছিল। ভারতীয়রা আগেই সামরিকভাবে পূর্ব পাকিস্তান সমস্যার সমাধান করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। মিসেস ইন্দিরা গান্ধী স্পষ্ট ও সন্দেহাতীত ভাষায় তাঁর উদ্দেশ্য ব্যক্ত করেছিলেন। আগস্ট মাসে জেনারেল মানেকশ অপারেশন অর্ডার জারি করেছিলেন। ট্রুপস তাদের কনসেন্ট্রেশন এলাকায় চলে গিয়েছিল। ভারতীয় সেনাবাহিনী তার ক্ষুদ্রতর প্রতিবেশীর দুর্বলতা ও অসুবিধার সুযোগকে কাজে লাগানোর জন্য তৈরি ছিল। ভারতীয়দের সুরে তাল মিলিয়ে মুক্তিবাহিনীর নৃত্যের কথা ছিল। কিন্তু ভবিষ্যতের দিকে চিন্তা করে ভারতীয়রা মুক্তিবাহিনীকে নিজেদের চূড়ান্ত শত্রু হিসেবে বিবেচনা করেছিল। তারা পূর্ব পাকিস্তান দখল করার এবং বাংলাদেশ সৃষ্টি হওয়ার পরের পরিস্থিতি অনুমান করতে পেরেছিল। সুসংগঠিত ও সুপ্রশিক্ষিত একটি বাংলাদেশ বাহিনী ভারতীয় দখলের বিরোধিতা করবে। তারা ভারতীয় আধিপত্যকে মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানাবে। সে কারণে পাকিস্তান আর্মিকে দিয়ে মুক্তিবাহিনীকে দুর্বল ও ক্ষতিগ্রস্ত করার এবং তাদের বিকলাঙ্গ করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছিল। এটা ছিল একই ঢিলে দুই পাখিকে মারার ফন্দি- দুই পাখিই ছিল মুসলমান। সমগ্র সীমান্ত জুড়ে এবং দেশের অভ্যন্তরে মুক্তিবাহিনীকে শর্ট অফেন্সিভ অপারেশনে পাঠানো হয়েছিল। নিম্নবর্ণিত আকারে মুক্তি বাহিনীর আক্রমণ ভারতীয়দের 'কাঙ্ক্ষিত' ফলাফল অর্জন করেছিল :

ক. বিরাট সংখ্যক মুক্তিবাহিনী নিহত হয়েছিল। কারণ তাদেরকে খুবই সামান্য গোলাবারুদের সমর্থন দেয়া হয়েছিল।

খ. পাকিস্তান আর্মিকে আরো বাইরের দিকে টেনে নেয়া হয় এবং বিরামহীনভাবে পাল্টা-আক্রমণ চালাতে গিয়ে তারা ক্লান্তও হয়ে পড়ে। ভারতীয় আর্মি যখন আক্রমণ চালায়, ততদিনে বিশ্রামের অভাবে পাকিস্তান আর্মি পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছিল।

গ. ভারতীয় আর্মির কোনো ব্যয় ছাড়া পাকিস্তানের অভ্যন্তরে চূড়ান্ত আক্রমণ চালানোর আগেই ভারতীয়রা অপারেশনের ঘাঁটি পেয়ে গিয়েছিল। এই ঘাঁটিগুলো তারা মুক্তি বাহিনীকে অনুপ্রবেশ করানোর মাধ্যমে পেয়েছিল।

উপনির্বাচন নিয়ে বাড়াবাড়ি

পশ্চিম পাকিস্তানী সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতাদের সঙ্গে ব্যাপক আলাপ-আলোচনার পর পূর্ব পাকিস্তানের এম এন এ-দের অযোগ্য ঘোষণার মাধ্যমে উপনির্বাচন অনুষ্ঠান করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছিল। জনাব ভুট্টো বিরামহীনভাবে প্রেসিডেন্টের সঙ্গে ৫-৬ ঘণ্টা করে বৈঠক করতেন বলে জানা যেত। সামগ্রিকভাবে এগুলো ছিল আসলে মদ্যপানের বৈঠক, কিন্তু সেগুলোকেই সর্বোচ্চ পর্যায়ের রাশভারি বৈঠক হিসেবে প্রদর্শন করে জনগণকে বোকা বানানো হত। যা হোক, এ ধরনের বৈঠকেই এমনভাবে পূর্ব পাকিস্তানে নির্বাচন অনুষ্ঠান করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল যাতে জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে পিপিপি সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসেবে আবির্ভূত হতে পারে। পরিকল্পনাটি ছিল দুই পর্যায়ে উপনির্বাচন অনুষ্ঠান করার। প্রথম পর্যায়ে সেই সব আসনে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে, যেগুলোর এম এন এ-দেরকে আওয়ামী লীগের স্বল্পকালীন শাসনকালে নৃশংসতা ও ঘৃণ্য অপরাধের অভিযোগে প্রশাসনিক পদক্ষেপের মাধ্যমে অযোগ্য ঘোষণা করা হবে। এগুলোর সংখ্যা ছিল প্রায় ৭৮ টি। জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে যোগ দিতে অনিচ্ছুকদের ব্যর্থতাজনিত কারণে শূন্য আসনগুলোতে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে দ্বিতীয় পর্যায়ে। ইসলামাবাদে এ কথা অনুমান করা হয়েছিল যে, জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহ্বান করা হলে বিদ্যমান পরিস্থিতির কারণে এক বিরাট সংখ্যক এম এন এ এতে যোগ দেবেন না। সুতরাং প্রাথমিক পর্যায়েই পিপিপি সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়ে যাবে।

এম এন এ-দের প্রশ্নে পরিস্থিতি ছিল এই যে, তাঁদের বেশির ভাগই কোলকাতায় চলে গিয়েছিলেন। আওয়ামী লীগের মোট ১৬০ জন এম এন এ-র মধ্যে মাত্র ৭০ জনের মতো পূর্ব পাকিস্তানের ভেতরে ছিলেন। প্রেসিডেন্ট প্রদত্ত প্রক্রিয়ানুসারে যারা ভারতে চলে গিয়েছিলেন তাদের বেশির ভাগই অযোগ্য ঘোষিত হবেন। গোয়েন্দা সংস্থাসমূহ আমাদের একটি তালিকা দিয়েছিল এবং নির্বাচন কমিশনার ৭৮টি আসনকে শূন্য ঘোষণা করেছিলেন, যেগুলোতে উপ-নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে হবে।

আমি ভেতরে গেলাম। প্রেসিডেন্টকে আমি অসঙ্গতভাবে উত্তেজিত অবস্থায় পাইনি, বরং সমগ্র বাড়াবাড়ির জন্য তাঁকে অনুতপ্ত মনে হয়েছে। আমি তাঁকে তাঁর সঙ্গে আমার পূর্ববর্তী আলোচনার কথা স্মরণ করিয়ে দিলাম এবং আমার প্ল্যান অফ অ্যাকশন অনুমোদন করার জন্য অনুরোধ জানালাম। আমি তাঁকে বললাম, পূর্ব পাকিস্তানের অবশিষ্ট অনুগত পাকিস্তানীদের আমরা অসন্তুষ্ট করতে পারি না। যদি ধরেও নেয়া হয় যে, নিজেদের নৌকা নিজেরা পুড়িয়ে দেয়ায় তারা আর আমাদের বিরোধিতা করার মতো অবস্থায় নেই, তারপরও জাতীয় পরিষদে জনাব ভুট্টোর জন্য আমরা যদি সংখ্যাগরিষ্ঠতার আয়োজন করে দেই তাহলে সেটা হবে অসন্তোষজনক ও অযৌক্তিক। আর দুর্ভাগ্যক্রমে এ রকম সংখ্যাগরিষ্ঠতাই জনাব ভুট্টোর রাজনীতির একমাত্র উদ্দেশ্য এবং তার জীবনের লক্ষ্য। ইয়াহিয়া আমার সঙ্গে একমত হলেন, কিন্তু আর্মির ভেতরে তার জনপ্রিয়তার কারণে তিনি ভুট্টোকে খোশ মেজাজে এবং নিজের পক্ষে রাখতে চাচ্ছিলেন। আমরা পূর্ব পাকিস্তান থেকে পিপিকে ৬ জন সদস্য দিয়েছিলাম, জাতীয় পরিষদের ২০ ডিসেম্বর অনুষ্ঠেয় অধিবেশনে যাদের যোগদানের কথা ছিল।

প্রেসিডেন্টকে পূর্ব পাকিস্তানের পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত করার উদ্দেশ্যে আমি ৪ নভেম্বর রাওয়ালপিন্ডি গিয়েছিলাম। যাওয়ার আগে বিদ্রোহী ও ভারতীয়দের তৎপরতার ব্যাপ্তি এবং যে সকল এলাকা তাদের নিয়ন্ত্রণে চলে গেছে সেগুলো দেখিয়ে আমি একটি মানচিত্র তৈরি করেছিলাম। নিয়াজী খুবই রঙিন ও আশাব্যঞ্জক চিত্র আঁকছিলেন। এটা তিনি করেছিলেন যাতে তাঁর 'ব্যাঘ্র' হিসেবে ভাবমূর্তি আরো বৃদ্ধি পায় এবং জি এইচ কিউ থেকে কোনো প্রকার হস্তক্ষেপ না ঘটে। সীমান্তের এক বিশাল এলাকা এবং প্রদেশের অভ্যন্তরে খুবই বিপজ্জনক বিরাট অঞ্চল মুক্তিবাহিনী ও অন্যান্য বিদ্রোহীদের দখলে চলে গিয়েছিল।

ভেতরের ও বাইরের উভয় হুমকির মুখে পাকিস্তান আর্মি তখন প্রচণ্ড চাপের মধ্যে ছিল। পাশাপাশি আমি দেখেছিলাম পাকিস্তানের ওপর যুদ্ধের মেঘ ঘনিয়ে আসছিল। পূর্বাঞ্চলীয় ও পশ্চিমাঞ্চলীয় উভয় সীমান্তেই ততোদিনে ভারতীয় আর্মির সামাবেশ ঘটেছিল। আমি পূর্ব পাকিস্তানের ভাগ্য সম্পর্কে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিলাম এবং আমার মত ছিল, একটি সর্বাত্মক যুদ্ধ পাকিস্তানের জন্য মঙ্গলজনক হবে না। ১৯৬৫ সালের যুদ্ধের পর পাকিস্তান আর্মি কোনো অস্ত্রশস্ত্র পায়নি। মার্কিন সামরিক সাহায্য বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। পুরোনো ও বাতিল হয়ে যাওয়া অস্ত্রশস্ত্রের স্থলে অন্য কোনো দেশ থেকে সেই পরিমাণ নতুন অস্ত্রশস্ত্র ও সরঞ্জামাদি কেনার মতো যথেষ্ট অর্থ আমাদের ছিল না। আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি ছিল প্রতিকূল। ভারতীয় প্রচার কুশলীরা বিশ্বজনমত জয় করে নিয়েছিল। নৃশংসতা সম্পর্কে অতিরঞ্জিত কাহিনীর প্রচার চালিয়ে বাংলাদেশীরা আমাদের সবচেয়ে ভয়াবহ ক্ষতি করেছিল। যদি যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়, তাহলে পাকিস্তান আর্মি অত্যন্ত অসুবিধাজনক অবস্থায় পড়বে। আমি এই আশংকাগুলোর কথা জানিয়ে পশ্চিম থেকে যুদ্ধ শুরু না করার জন্য

প্রেসিডেন্টকে অনুরোধ করেছিলাম। তিনি বললেন, "আইউব যে ভুলটি করেছিলেন তিনি সেই একই ভুল করবেন না। আমি তখন বললাম, আক্রমণ করার জন্য অনুকূল সময় ছিল অক্টোবরের আগে, যখন ভারতীয়রা পশ্চিমে তাদের প্রতিরক্ষার আয়োজন সম্পন্ন করতে পারেনি।" এরপর আমি প্রশ্ন করলাম, "আমাদের ট্রুপসকে কেন ভারতীয়দের মতো অগ্রবর্তী অবস্থানে রাখা হয়েছে?" তিনি বললেন, এটা কেবল আত্মরক্ষামূলক উদ্দেশ্যে করা হয়েছে। আমি সন্তুষ্ট হলাম এবং এই ভেবে সুখী হলাম যে, ঝোঁকের মাথায় হঠাৎ করে কোনো সিদ্ধান্ত নেয়া হবে না। অবশ্য সমগ্র পরিস্থিতি নির্ভর করছিল ভারতীয়দের অ্যাকশনের ওপর। মিসেস গান্ধী কোনে মীমাংসা চাননি। তিনি পূর্ব পাকিস্তানের পরিস্থিতির একটি রাজনৈতিক সমাধান চাননি। তিনি ঘোষণা করেছিলেন, এমন কি সারা পৃথিবীও যদি তাঁর অ্যাকশনকে অনুমোদন না করে, তবুও তিনি পাকিস্তানের ওপর সমাধান চাপিয়ে দেবেন। দেশের ভেতরে যখন বিদ্রোহ চলছে, তেমন একটি সময়ে যুদ্ধ করার মতো অবস্থা আমাদের ছিল না। নিজ দেশে অনৈক্য ও অমিল থাকাকালে কোনো জাতির পক্ষেই সাফল্যের সাথে যুদ্ধ চালানো সম্ভব নয়।

প্রেসিডেন্টের সঙ্গে ৬ নভেম্বর আবার আমি সাক্ষাৎ করি। এবারের স্থান ছিল লাহোরের গভর্নর হাউস। উপনির্বাচনে পিপিপিকে আসন বরাদ্দ দেয়ার প্রশ্নে পিপিপি-র একটি প্রতিনিধি দলের কাছে আমার মতামত জানানো ছিল এই সাক্ষাতের উদ্দেশ্য। পিপিপি-র প্রতিনিধি হিসেবে জনাব কাসুরী এবং অন্য আর একজন সেখানে উপস্থিত ছিলেন। আমার পূর্ববর্তী অবস্থান পুনর্ব্যক্ত করে প্রতিশ্রুতি দেই যে, জাতীয় পরিষদের ২০ ডিসেম্বরের অধিবেশনের পর অনুষ্ঠেয় দ্বিতীয় পর্যায়ের নির্বাচনে পিপিপি-কে আরো বেশি আসন দেওয়ার ব্যবস্থা করবো। হ্রাসকৃত প্রতিনিধিত্বের ক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তান ,থেকে তারা ১২টি আসন পেতে পারতেন। এটা ছিল তাদের প্রাপ্যের চাইতে ১২টি বেশি। কিন্তু আর্মির মধ্যে পিপিপি-র প্রভাব এত প্রবল ছিল যে, প্রেসিডেন্ট তাদের অন্যায় ও অযৌক্তিক দাবি প্রত্যাখ্যান করতে পারেন নি।

যে সংকটপূর্ণ পরিস্থিতির মধ্যে আমরা ছিলাম, সেটাই আমার মনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্থানে ছিল। আমি সব সময় বলে এসেছি যে, একটি সুষ্ঠু রাজনৈতিক অ্যাকশনের মাধ্যমেই কেবল পূর্ব পাকিস্তানের পরিস্থিতির সমাধান করা যেতে পারে। জনাব কাসুরীর উপস্থিতিতেই আমি প্রেসিডেন্টকে বলেছিলাম, "স্যার, আমরা (অর্থাৎ আর্মি) সমস্যার সমাধান করতে পারব না। আপনাকে অবশ্যই সিভিলিয়ানদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে। তাদেরকেই সামাল দিতে দিন, আমরা আর্মিতে যারা আছি তারা খুব সোজাসুজি চলার লোকজন। রাজনীতিতে আপনাকে খুবই নমনীয় হতে হবে।" আমি আরো বলেছিলাম, "একজন রাজনীতিবিদ বিমানে ওঠার সময় যে কথা বলেন, বিমান থেকে নামার সময় ঠিক তার উল্টোটি বলেন এবং বলেই সটকে পড়েন। আমরা সেটা করতে পারব না।

সুতরাং রাজনীতিবিদদেরকেই পরিস্থিতি সামাল দিতে দিন।" প্রেসিডেন্ট বললেন, "বাচ্চু, আমার সংবিধান এখনো তৈরি হয়নি। কিভাবে আমি হস্তান্তর করতে পারি?" এ ব্যাপারে জনাব কাসুরী মাঝখানে বলে উঠলেন, "সাংবিধানিক দিকটি পূরণ করার জন্য আপনি একটি অধ্যাদেশ ঘোষণা করতে কিংবা একটি মার্শাল ল অর্ডার জারি করতে পারেন।" উত্তরে প্রেসিডেন্ট বললেন, "২০ ডিসেম্বর পর্যন্ত অপেক্ষা করুন। তখন আমরা একটি সংবিধান পেয়ে যাব।" সে দিনটি আর কখনো আসেনি।

জনাব কাসুরীর বক্তব্যের একটি বিষয় লক্ষণীয় ছিল। সংবিধান ছাড়াও অধ্যাদেশ বা মার্শাল ল অর্ডারের মাধ্যমে ক্ষমতা হস্তান্তর পথে সাংবিধানিক বাধা অতিক্রম করা সম্ভব। পদক্ষেপের এই প্রক্রিয়াটিই নয় মাস আগে জনাব ভুট্টো প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। যখন একটি মার্শাল ল অর্ডারের মাধ্যমে ইয়াহিয়া শেখ মুজিবের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে চেয়েছিলেন।

সেদিনই ঢাকা ফেরার পথে করাচীতে আমি আমার স্ত্রী ও সন্তানদের সঙ্গে দেখা করেছিলাম। আমি তাদের বলেছিলাম যে, এবারের সফরকালেই আমি প্রথমবারের মতো খুব সুখী হয়েছি। কারণ সর্বাত্মক যুদ্ধ শুরু না করার জন্য আমার প্রস্তাব প্রেসিডেন্ট গ্রহণ করেছেন, এমন কি ভারত যদি আমাদের প্ররোচিত করে তবুও যুদ্ধ শুরু করা হবে না। একটি সর্বাত্মক যুদ্ধ ভারতকে অ্যাকশনের স্বাধীনতা দিতে পারেঃ পূর্ব পাকিস্তানের গভীরে আক্রমণ করার স্বাধীনতা। আকাশ ও সমুদ্র পথের সকল যোগাযোগ ছিন্ন হয়ে যাওয়ার ফলে পূর্ব পাকিস্তান বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে। আঘাত হানার মতো সত্যিকার শক্তিশালী ক্ষমতার অভাবের কারণে পশ্চিম পাকিস্তান পূর্ব পাকিস্তানের ওপর সৃষ্ট চাপের লাঘব করতে পারবে না।

ঢাকায় প্রত্যাবর্তনের পর আমি উপনির্বাচনের ব্যবস্থাপনা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলাম। ১৩ নভেম্বর কোর এইচ কিউ-তে একটি সভায় যোগ দেয়ার জন্য আমাকে ডাকা হয়। আমন্ত্রণটি পেয়ে আমি বিস্মিত হয়েছিলাম। কারণ নিয়াজী দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকে গভর্নর হাউস উপেক্ষিত হয়ে আসছিল। জিএইচ কিউ-তে গিয়ে আর্মির সি ও এস-কে অবহিত করায় এবং তাকে পূর্বাঞ্চলীয় কম্যান্ডের জন্য রিইনফোর্সমেন্টের ব্যবস্থা করার অনুরোধ জানানোর জন্য একটি প্রতিনিধি দলের প্রস্তুতি উপলক্ষে এই সভা ডাকা হয়েছিল। নিয়াজী প্রতিনিধি দলটির নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন না, কারণ তিনি বলেছিলেন যে, চলমান অপারেশনসমূহ পরিচালনার কাজে তিনি অত্যন্ত ব্যস্ত রয়েছেন। ব্রিফিং-এর পর আমরা যখন বেরিয়ে এলাম, সি ও এস কোর-এর অফিসের একটি মানচিত্রের সামনে দাঁড়িয়ে নিয়াজী বললেন, "আমাদেরকে এই হুমকি সৃষ্টিকারী ব্যূহের ওপর অবশ্যই আঘাত হানতে হবে।" তিনি যখন এই কথাটি বলছিলেন, তখন তিনি ফেনীর উল্টো দিকে ভারতের বহির্মুখ বেলোনিয়ার ওপর অঙ্গুলি রেখেছিলেন। আমি বললাম, "এর অর্থ হবে সর্বাত্মক যুদ্ধ। তখন কোনো পি আই এ থাকবে না। আমরা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ব।" পরিস্থিতির বাস্তবতা বুঝে তিনি শান্ত হলেন।

একমত হলেন, কিন্তু এর মধ্যে দিয়ে তাঁর মনের প্রবণতার প্রকাশ ঘটেছিল। তাঁর ভেতরে খুবই অপেশাদারী মনোভাব ছিল। বাস্তবতাহীনভাবে তিনি দাম্ভিক ছিলেন এবং ভালোভাবে আত্মরক্ষা করার মতো সামর্থ্য না থাকা সত্ত্বেও তিনি ভারতের ভূখণ্ডের ভেতরে যুদ্ধ চালানোর এবং কোলকাতা যাওয়ার কথা বলতেন।

খুব একটা সাফল্য ছাড়াই প্রতিনিধি দলটি জি এইচ কিউ থেকে ফিরে এসেছিল। যে পরিমাণ শক্তিসম্পন্ন রিইনফোর্সমেন্টের জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছিল, ততটা যোগান দেয়ার মতো অবস্থা পশ্চিম পাকিস্তানের ছিল না। তারা অবশ্য ঢাকায় একটি রিজার্ভ গড়ে তোলার জন্য তিনটি ব্যাটেলিয়ান পাঠানোর প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। এটা আমার দায়িত্বের মধ্যে না পড়লেও আগেরবার সফরকালে আমি ঢাকার প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার ঘাটতির বিষয়টি সম্পর্কে প্রেসিডেন্টের কাছে অভিযোগ জানিয়েছিলাম। ইতিপূর্বে ৫৩ ব্রিগেডকে সুনির্দিষ্ট মিশনসহ ঢাকা অঞ্চলে মোতায়েন করা হয়েছিল– এটা জি এইচ কিউ-এর বরাদ্দকৃত এমন এক মিশন, যা আর্মির শব্দতালিকা অনুযায়ি নিম্নতর এইচ কিউ-এর জন্য পূরণ করা বাধ্যতামূলক হয়ে থাকে। কিন্তু নিয়াজী ৫৩ ব্রিগেডকে ফেনী পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে যে পরিমাণ রিইনফোর্সমেন্টই তার কাছে পাঠানো হয়েছিল, তাদেরকে দিয়ে ঢাকার প্রতিরক্ষার জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় রিজার্ভ তৈরি না করে তিনি বিভিন্ন ফরমেশনে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। তিনি বিদ্যমান কম্যান্ড কাঠামো ভেঙে দুটি অতিরিক্ত ডিভিশনাল এইচ কিউ এবং তিনটি বিডিই এইচ কিউ দাঁড় করিয়েছিলেন। ১৪ ডিভিশনের বিস্তৃতি ছিল সিলেট থেকে চট্টগ্রাম পর্যন্ত এবং ত্রিপুরা ও আসামে শত্রুর বিপুল সমাবেশের প্রেক্ষাপটে এটা সবচেয়ে হুমকিপ্রাপ্ত অঞ্চলে পরিণত হয়েছিল। নিয়াজী ১৪ ডিভিশনের দায়িত্বকে কুমিল্লা অঞ্চল পর্যন্ত বিভক্ত করেছিলেনঃ কুমিল্লার দক্ষিণের অঞ্চলের দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল একটি নব গঠিত অ্যাডহক ডিভিশনকে- ৩৯ ডিভিশন। মার্শাল ল এইচ কিউকে ডিভিশনাল এইচ কিউ-এ রূপান্তরিত করে এবং মেজর জেনারেল রহিমকে ডিভিশনাল কমান্ডার বানিয়ে কম্যান্ড কাঠামো তৈরি করা হয়েছিল। নিয়াজী এক জাদুদণ্ড দিয়ে ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস্ এইচ কিউ-কে ৩৬ ডিভিশনের এইচ কিউ বানিয়ে ৩৬ ডিভিশন সৃষ্টি করেছিলেন। মেজর জেনারেল জামশেদকে ডিভিশনাল কমান্ডার করে এবং কোনো রকম অতিরিক্ত ট্রুপস না দিয়েই ডিভিশনটিকে তিনি ঢাকার প্রতিরক্ষার দায়িত্ব দিয়েছিলেন। শত্রুকে প্রতারিত করার পরিবর্তে এই পদক্ষেপটি কম্যান্ডসমূহের মধ্যে বিদ্যমান যোগাযোগ ও সম্পর্ককে ভেঙে দিয়েছিল। এর ফলে বিশ্বের সংবাদ মাধ্যমগুলো বলতে পেরেছিল যে, পূর্ব পাকিস্তানে পাকিস্তান আর্মির পাঁচটি ডিভিশন রয়েছে, যখন বাস্তবে তিনটি মাত্র নিঃশেষিত ডিভিশন ছিল- তাও আর্টিলারি ও আর্মার ছাড়া।

ভেতরে পরিস্থিতির দিন দিন অবনতি ঘটছিল। নির্বাচনের আগে এবং ঠিক এর অব্যবহিত পরের দিনগুলোতেও পূর্ব পাকিস্তানের সাধারণ মানুষ পাকিস্তানবিরোধী ছিল না।

তাদের বুদ্ধিজীবী ও রাজনৈতিক নেতাদের নেতৃত্বে তারা ছয় দফার আকারে আরো বেশি স্বায়ত্তশাসন চেয়েছিল। তারা কেন্দ্রীয় ক্ষমতায়ও বেশি রাজনৈতিক ক্ষমতা চেয়েছিল। পাকিস্তানবিরোধী আন্দোলন সীমাবদ্ধ ছিল এলিটদের মধ্যে। ভারতীয় আর্মির অ্যাকশনের আট মাস আগে এলিটদের এই পাকিস্তানবিরোধী অনুভূতি একটি স্বাধীনতার আন্দোলনে রূপান্তরিত হয়েছিল। এর প্রধান কারণটি ছিল জাতীয় পরিষদের অধিবেশন মুলতবিকরণ যা শেষ পর্যন্ত আর্মি অ্যাকশনে গড়িয়েছে। আর্মির সশস্ত্র পার্সোনেল এবং সেকেন্ড লাইন ফোর্সগুলো বিদ্রোহের মাধ্যমে আর্মি অ্যাকশন প্রতিহত করেছিল। এর ফলাফল ছিল সিভিল ওয়ার, যাতে উভয় পক্ষই নৃশংস ও নিষ্ঠুর কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হয়েছে। ভারতীয় প্রচারণাও তার ভূমিকা পালন করেছে এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালী জনগণ পাকিস্তান আর্মির বিরুদ্ধে উঠে দাঁড়িয়েছে, এমন কি সরকারি কর্মচারিরাও গেরিলা ও ধ্বংসাত্মক তৎপরতায় জড়িত হয়েছে। কোনো গোপনীয়তাই রক্ষা করা যায়নি। পাকিস্তান আর্মি নিজেদের মানুষের মধ্যেই বসবাস করছিল, কিন্তু বিচ্ছিন্ন ও ঘৃণিত অবস্থায়। তাদের চলাফেরা ছিল সীমাবদ্ধ। তথ্যানুসন্ধান প্রচেষ্টা বিপদ চাপিয়ে দিয়েছে, এমন কি আর্মির যানবাহন উড়িয়ে দেয়ার জন্য শিশুরা পর্যন্ত মাইন স্থাপন করেছে। ব্যক্তির কথা বাদ দিন, প্ল্যাটুনের শক্তিসম্পন্ন ডিটাচমেন্টকেও দেশের অভ্যন্তরে অ্যামবুশ করা হয়েছে।

রিপোর্ট আসতে শুরু করেছিল যে, রাজাকাররা বিদ্রোহীদের দলে চলে যাচ্ছে– তাদের কাছে থানা হস্তান্তর করছে। পাকিস্তানপন্থী নেতাদের হত্যা করার খবরও আসছিল। পরিস্থিতি ধাপে ধাপে আরো খারাপের দিকে যেতে শুরু করছিল। ধর্ম শিক্ষক ও মাদ্রাসার ওপর আক্রমণ ঘটছিল প্রায়শই। পশ্চিম পাকিস্তানের সঙ্গে ভ্রাতৃত্বমূলক সম্পর্ক গড়ে তোলার জন্য ইসলামী শিক্ষাকে তার ভূমিকা পালন করতে দেয়ার মতো অবস্থা বাংলাদেশ আন্দোলনের ছিল না। ইতিমধ্যেই চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যাওয়া অর্থনীতির ওপর চাপ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে বৈদ্যুতিক লাইন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার ওপর আক্রমণ তীব্রতর করা হয়েছিল।

বিশ্বের সংবাদপত্রগুলো নৃশংসতার অনেক বানানো কাহিনী প্রকাশ করেছিল। সেন্সর করার জন্য সাংবাদিকদেরকে তাদের প্রেরিতব্য সকল সংবাদ আমাদের কাছে পেশ করতে হত। নিউজ উইক কিংবা টাইম-এর সংবাদদাতার একটি সংবাদ আমি দেখেছিলাম, যার মধ্যে টাঙ্গাইলের নিকটবর্তী একটি গ্রামে পরিচালিত আর্মি অ্যাকশনের ভয়াবহ কাহিনী ছিল। এতে বলা হয় যে, গ্রামটির সকল হিন্দুকে আর্মি হত্যা করেছে এবং বেয়নেট দিয়ে কুমারী মেয়েদের গুপ্তাঙ্গ বিদ্ধ করা হয়েছে। এক অবিশ্বাস্য নৃশংসতার চিত্র এতে আঁকা হয়েছিল।

সেদিনই হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে আমার একটি প্রেস ব্রিফিং ছিল। সুতরাং আর্মি সূত্র থেকে আমি ঘটনাটির যথার্থতা যাচাই করে নিয়েছিলাম। কাহিনীটি সম্পূর্ণ মিথ্যা ছিল। ঐ গ্রামে কোনো হিন্দু, এমন কি একজন হিন্দুও ছিল না। আর্মি গ্রামটির আশেপাশেও যায়নি।

প্রেস ব্রিফিং শুরু করার আগে আমি সংশ্লিষ্ট সাংবাদিককে তার সংবাদের সোর্স বা সূত্র সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। সে এলাকায় তিনি নিজে গিয়েছিলেন কিনা জানতে চাইলাম। সাংবাদিকটি বললেন, তিনি ঐ এলাকায় যাননি। তবে এর যথেষ্ট কাছাকাছি এলাকায় গিয়েছিলেন এবং একজন 'বন্ধু' তাকে তথ্যটি দিয়েছেন। আমি তাঁকে বললাম, যেহেতু কাহিনীটি মিথ্যা সে কারণে আমি সাংবাদিকটির ছাড়পত্র দিতে পারব না। কিন্তু তিনি বৈরুত চলে গেলেন এবং সেখান থেকে কাহিনীটি পাঠালেন। সে কাহিনীটি সাপ্তাহিকটিতে প্রকাশিত হল এবং সমগ্র পৃথিবী এতে প্রভাবিত হয়ে পড়ল। সংবাদ মাধ্যমে আমরা খুব খারাপ প্রচারণা পেয়েছি এবং এজন্য আমাদেরকে মূল্য দিতে হয়েছে। ব্যাপক ধ্বংস, নারী নির্যাতন ও গণহত্যা সম্পর্কে অনেক কাহিনী প্রচারিত হয়েছিল এবং বাংগালীরা সেগুলো বিশ্বাস করত। এর ফলে সাধারণ জনগণের মধ্যে আত্মরক্ষা ও জাতীয়তাবাদের অনুভূতির সৃষ্টি হয়েছিল এবং পরিণামে আর্মি ও পাকিস্তানকে মানুষ ঘৃণার চোখে দেখতে শুরু করেছিল।

কাহিনীকে সাধারণত বিশ্বাস করা হয়। মনে পড়ে, মিলিটারি অ্যাকশনের কয়েক মাস পর নোয়াখালী থেকে একটি প্রতিনিধি দল আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। তারা আমাকে বলেছিল যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে অক্ষত অবস্থায় দেখতে পেয়ে তারা বিস্মিত হয়ে গিয়েছিল। তারা বলল, তাদেরকে বলা হয়েছে যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে আর্মি মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছে। এমনটিই ছিল সাধারণ ধারণা যা বিশ্বের সংবাদ মাধ্যম ও বাংলাদেশের প্রচারবিদরা সৃষ্টি করেছিল। অন্যদিকে পাকিস্তান যে সকল কাজের জন্য নিন্দিত হয়েছে সে ধরনের কাজ করেও ভারত দিব্যি পার পেয়ে গেছে। উদাহরণ : যুদ্ধবন্দী হিসেবে ভারতে অবস্থানকালে সংবাদপত্রে আমরা পড়লাম যে, বেনারস বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা এর ভবনগুলো দখল করে নিয়েছে। এটা একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা ছিল এবং কোনো বিদ্রোহী কর্মকাণ্ডের অংশ ছিল না। কিন্তু ভারতের আর্মিকে সেখানে পাঠানো হল এবং ১৫০ জন ছাত্রকে হত্যা করে তারা আইন প্রতিষ্ঠিত করল। ভারতীয় সংবাদপত্র খুব দম্ভের সঙ্গে ত্বরিত অ্যাকশনের জন্য আর্মির প্রশংসা করল। অথচ ঢাকায় সে তুলনায় অনেক কম ছাত্র হতাহত হলেও তাকেই অনেক বড় করে দেখিয়ে ভারতীয়রা সামরিকভাবে হস্তক্ষেপ করেছিল। একইভাবে স্বর্ণ মন্দিরের ঘটনাটি যদি পাকিস্তানে ঘটত, তাহলে ভারতীয় আর্মি এতদিনে স্বআরোপিত মুক্তিদাতার ভূমিকা পালন করতে এগিয়ে আসত।

সমাজের সকল শ্রেণীর ভেতরেই পাকিস্তানবিরোধী মনোভাব প্রবেশ করেছিল। এমন কি সরকারি কর্মচারিরাও প্রভাবিত হয়ে পড়েছিল। একদিন আমরা মাত্র তিনজন চট্টগ্রাম থেকে খাদ্যসামগ্রী ঢাকায় নিয়ে আসার সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেছিলাম– আমি, জেনারেল টিক্কা ও পূর্ব পাকিস্তান সরকারের যোগাযোগ সচিব এতে উপস্থিত ছিলাম। আমরা এ জন্য চাঁদপুর পর্যন্ত রেলপথ ব্যবহারের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। ঐ রাতেই সে লাইনের ওপর দুটি সেতু উড়িয়ে দেয়া হয়েছিল। আমাদের পরিকল্পনা ফাঁস হয়ে গিয়েছিল। আমাদের মধ্যে

একজনই কেবল সেটা করতে পারেন। তিনি যোগাযোগ সচিব, যিনি এভাবেই স্বাধীনতা আন্দোলনে তাঁর অবদান রেখেছিলেন।

নৃশংসতার কাহিনী সম্পর্কে যে কথা বলছিলাম। একদিন আমার টেবিলে একজন বিদেশী সংবাদদাতার পেশ করা একটি কাহিনী পেলাম। এতে বলা হয়েছিল যে, পশ্চিম পাকিস্তানী আর্মি পার্সোনেলের ধর্ষণের শিকার অসংখ্য নারী অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় ঢাকা সেনানিবাসে রয়েছে। আর্মি সন্তান প্রসব করানোর জন্য স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞদের খুঁজছে, কিন্তু কেউই রাজি হচ্ছেন না। আমি সংশ্লিষ্ট সাংবাদিক ও মেজর সিদ্দিক সালিককে আমার অফিসে ডেকে আনলাম। আমি বললাম, "প্লিজ, সেনানিবাসে যান। যে কোনো বাড়িতে ইচ্ছা প্রবেশ করুন। সালিক আপনার সঙ্গে থাকবে। আপনি যদি একজনও মাত্র গর্ভবতী নারীকে পান তাহলে আমি আপনার সংবাদটি পাঠানোর ছাড়পত্র দেবো।" তিনি আমার প্রস্তাব গ্রহণ করলেন। যত বেশি সংখ্যক সম্ভব তত বাড়িতে ঢুকলেন। কিন্তু গর্ভবতী নারী দূরে থাক, তিনি কোনো নারীই পেলেন না। তিনি যখন ফিরে এলেন এবং জানালেন যে, তেমন কাউকে পাননি, তখন আমি বললাম, "আপনি কি এখন সংবাদটি পাঠানো স্থগিত করবেন?" তিনি বললেন, "না, কারণ আমার কাহিনী সেই সম্পর্কিত, যে বিষয়ে বাংগালীরা বলছে। এবং তার চেয়ে বড় কথা, আমাদেরকে পত্রিকা বিক্রি করতে হবে। আমার পাঠকরা এ সবই পড়তে চায়...।"

১৯৭১ সালের ১ ডিসেম্বরের ঘটনা। গভর্নর মালিক তার পশ্চিম পাকিস্তান সফরশেষে ফিরে এসেছেন। সেখানে তিনি প্রেসিডেন্টের সঙ্গে দেখা করেছিলেন। আমি তাকে প্রশ্ন করলাম, প্রেসিডেন্টের সঙ্গে তিনি যুদ্ধের ব্যাপারে কোনো কথা বলতে পেরেছেন কি না। কথা বলেছেন জানিয়ে তিনি বললেন, কিন্তু প্রেসিডেন্টের কাছ থেকে তিনি এমন কোনো সুনির্দিষ্ট আশ্বাস পাননি যে, পূর্ব পাকিস্তানে ভারতীয় আক্রমণের প্রতিক্রিয়ায় তারা সেখানে যুদ্ধকে তীব্রতর করবেন না। দুটি সার্বভৌম রাষ্ট্রের মধ্যকার সম্পর্ক সংক্রান্ত সকল আন্তর্জাতিক আইনই ভারত লংঘন করেছিল। শুধু আইনের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলেও ভারত পাকিস্তানের একটি অংশ পূর্ব পাকিস্তানকে আক্রমণ করেছিল। সুতরাং ভারত পাকস্তানকেই আক্রমণ করেছিল। এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। কিন্তু নৈতিকতার দিক থেকে যৌক্তিক হলেও সীমান্ত সংঘাতকে একটি সার্বাত্মক যুদ্ধে রূপান্তর করাটা আমাদের দেশের বৃহত্তর স্বার্থে মঙ্গলজনক ছিল না। অক্টোবরের আগে যদি কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় বড় ধরনের আক্রমণ চালিয়ে ভারতকে তার কিছু ফরমেশনকে পূর্ব থেকে পশ্চিমে সরিয়ে নিতে বাধ্য করা যেতো, তাহলে আমাদের সশস্ত্র বাহিনীর কৌশল পূরণের ক্ষেত্রে উপকার হতে পারতো। কিন্তু অনেক দেরি হয়ে গিয়েছিল। শত্রু তার সুষ্ঠু কৌশলগত উপলব্ধি থেকে অত্যন্ত পরিকল্পিতভাবে পশ্চিম পাকিস্তানের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষামূলক উদ্দেশ্যে নিজের বাহিনীকে নিয়োজিত করেছিল।

গভর্নর আমাকে জানালেন যে, প্রেসিডেন্ট আসবেন না, তবে আর্মির সি ও এস জেনারেল হামিদ ২ ডিসেম্বর ঢাকা সফরে আসবেন। ২ ডিসেম্বর আমাদের জানানো হল যে, জেনারেল হামিদ আসছেন না। আমার সিদ্ধান্ত ছিল, যুদ্ধ অত্যাসন্ন। আমি আমার চারপাশের লোকজনকে আমার অনুমানের কথা জানালাম। তাদের অনেকে সেদিনই পশ্চিম পাকিস্তানে চলে গেল। আমিও কিছুক্ষণের জন্য চলে যাওয়ার কথা ভাবলাম। প্রেসিডেন্টের কাছ থেকে যখন প্রয়োজন মনে করব তখনই রাওয়ালপিন্ডি যাওয়ার স্থায়ী অনুমতি আমার ছিল। আসন্ন যুদ্ধ থেকে পালিয়ে যাওয়ার জন্য আমি আমার সরকারি দায়িত্বের যে কোনো কাজকে অজুহাত বানাতে পারতাম। গভর্নর এতে কোনো আপত্তি করতেন না। কিন্তু আমার বিবেক আপত্তি জানাল। এ কথা সত্য পূর্ব পাকিস্তানে কেউই জানত না যে, যুদ্ধ একেবারে কাছে এসে গেছে। তারা তাই আমার যাওয়াকে যুদ্ধের সঙ্গে যুক্ত করত না। কিন্তু আমি ভাবলাম, এখন যদি চলে যাই তাহলে তার অর্থ হবে চরম সংকটের সময় সহকর্মী ও সহযোদ্ধাদের পরিত্যাগ করে পালিয়ে যাওয়া। আমি সম্প্রতি ঈদের ছুটিতে পশ্চিম পাকিস্তানে গমনকারী অসামরিক প্রশাসকদের ডেকে পাঠিয়েছিলাম। আমি ভাবলাম, আমার নিরাপদ স্থানে চলে যাওয়াটা সুপরিচিত মিলিটারি কোডস অফ অনারের জন্য ক্ষতিকর হবে। কারো কাছে আমাকে জবাবদিহি করতে হত না, কিন্তু আমার ভেতরের আমি আমাকে ঢাকা ত্যাগ করতে দিল না, যদিও আমি আমাদের সামনে আসন্ন বিপদের ভয়াবহতা সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন ছিলাম।

৩ ডিসেম্বর আমি স্বাভাবিক কাজকর্ম করলামঃ রাজনীতিবিদ ও এম এন এ-দের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে ২০ ডিসেম্বর অনুষ্ঠেয় জাতীয় পরিষদের প্রস্তাবিত অধিবেশনে যোগদানের উদ্দেশ্যে তাদেরকে রাওয়ালপিণ্ডি পাঠানোর আয়োজন সমন্বয় করা ছিল এর মধ্যে। পাকিস্তানের জন্য একটি সংবিধান প্রণয়নের উদ্দেশ্যে ইয়াহিয়া বিচারপতি কর্নেলিয়াসের নেতৃত্বে একটি ল কমিশন নিয়োগ করেছিলেন। দেশ পরিচালনায় সশস্ত্র বাহিনী সমূহের ভূমিকার বিধান ও ব্যবস্থা রাখা এর প্রধান বৈশিষ্ট্য হতে যাচ্ছিল। জাতীয় পরিষদের অধিবেশনের দিনটি যেহেতু আর কোনদিন আসেনি, তাই কেউ জানতে পারেনি যে, পরবর্তীকালে অমন একটি সাংবিধানিক ব্যবস্থার কি প্রতিক্রিয়া ঘটত। রাজনৈতিকভাবে সচেতন দেশের পূর্বাঞ্চলীয় অংশের কাছে অমন আয়োজন কোনোদিনই গ্রহণযোগ্য হত না। আগামী দিনের ক্ষমতাসীনরা সম্ভবত ইতিমধ্যেই পূর্ব পাকিস্তানকে বাদ দিয়ে রেখেছিলেন এবং তাঁরা কেবল পশ্চিম পাকিস্তানের জন্যই তখন পরিকল্পনা করছিলেন।

আমার মূল্যায়ন ছিল এই যে, নির্বাচনে অংশ নিলে আওয়ামী লীগই আবার বিজয়ী হবে। যা কিছুই ঘটুক না কেন, তা বিপর্যয়করই হবে। কারণ নির্বাচনে বিজয়ী ব্যক্তিরা পূর্ব পাকিস্তানের অধিবাসী হবেন। যাহোক, আওয়ামী লীগ নির্বাচন বয়কট করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। অন্য যে দলগুলো ময়দানে রয়ে গিয়েছিল সেগুলো হলো জামাতে ইসলামী,

পিডিপি, মুসলিম লীগের তিন অংশ এবং নেজামী ইসলাম। এই সবগুলো দলেরই বিশেষ কিছু এলাকায় সীমাবদ্ধ সমর্থক ছিল। ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনের ফলাফল থেকেই তাদের জনপ্রিয়তার বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল।

এদিকে ভারতীয় আর্মির সমর্থন নিয়ে মুক্তি বাহিনী সীমান্ত এলাকার পাশাপাশি পূর্ব পাকিস্তানের অভ্যন্তরেও আক্রমণ চালানো শুরু করেছিল। ফলে আইন-শৃংখলা পরিস্থিতির দ্রুত অবনতি ঘটে এবং বড় বড় শহর ব্যতীত অন্য কোথাও নির্বাচন অনুষ্ঠান করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। সে কারণে বিভিন্ন দলের মধ্যে আসন ভাগাভাগির জন্য দলগুলোর উপস্থাপিত প্রস্তাবের ব্যাপারে আমি সম্মত হয়েছিলাম। আমি পরামর্শ দিয়েছিলাম যে, বিগত সাধারণ নির্বাচনে প্রাপ্ত ভোটের অনুপাতে দলগুলোর মধ্যে আসন বণ্টন করা হোক। এক্ষেত্রে অবশ্য একটি বিপত্তির কারণ ছিল এবং তার মীমাংসা করাও প্রয়োজন ছিল। নূরুল আমীনকে পাকিস্তানের পরবর্তী প্রধান মন্ত্রী বানাতে হবে। আয়োজনটির সঙ্গে পূর্ব পাকিস্তানের অন্য সকল নেতাও একমত ছিলেন। কিন্তু সাধারণ নির্বাচনে নূরুল আমীন নিজে জিতলেও তার দল অন্য আসনগুলোতে ভালো করতে পারেনি। আওয়ামী লীগের ৬২ জন সদস্যের সঙ্গে আমি পূর্ব পাকিস্তানী নেতৃবৃন্দের মাধ্যমে, বিশেষ করে জনাব সোহরাওয়ার্দীর কন্যা আখতার সোলায়মানের সৌজন্যে যোগাযোগ করেছিলাম। তারা জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে যোগ দিতে এবং জনাব নূরুল আমীনকে সমর্থন দান করতে সম্মত হয়েছিলেন।

সুতরাং জনাব নূরুল আমীনের দলকে গুরুত্বপূর্ণ দলে পরিণত করার দরকার ছিল। সেজন্য প্রাপ্য আসনগুলোর মধ্য থেকে সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন পিডিপিকে দেয়া হয়েছিল, যদিও সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের পর জামাতে ইসলামীই সর্বাধিক ভোট পেয়েছিল।

আমরা যখন পূর্ব পাকিস্তানে স্বার্থের সংঘাত মেটানোর প্রচেষ্টা চালাচ্ছিলাম, পিপিপি তখন ইয়াহিয়া বিদায় নেয়ার পর তাদের ভবিষ্যৎ কৌশল নিয়ে সক্রিয়ভাবে পরিকল্পনা করছিল। নূরুল আমীন যদি প্রধান মন্ত্রী হন তাহলে তাদের বিগত এক বছরের সকল প্রচেষ্টাই নস্যাৎ হয়ে যাবে। তারা ক্ষমতা চাচ্ছিল। আমাকে রাওয়ালপিণ্ডিতে তলব করে নেয়া হলো। প্রেসিডেন্ট আমাকে বললেন আমি যেন পূর্ব পাকিস্তানের উপনির্বাচনে পিপিপিকে ২৪টি আসন দেই। এটা ছিল বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতো। আমি একটি বড় ধাক্কা খেলাম। আমার প্রতিক্রিয়াও ছিল তীক্ষ্ণ। প্রেসিডেন্টকে আমি জানালাম যে, পূর্ব পাকিস্তানে পিপিপি-র এমন কি একটি অফিসও নেই। ১৯৭০-এর নির্বাচনকালে তারা ঐ প্রদেশকে সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করেছে এবং একজন প্রার্থীকেও দাঁড় করায়নি। তারা পূর্ব পাকিস্তানের ব্যাপারে আদৌ আগ্রহী ছিল না। আমি প্রেসিডেন্টকে একথাও বলেছিলাম যে, পূর্ব পাকিস্তান থেকে যদি প্রধান মন্ত্রী বানানো না হয় তাহলে তিনি ঐ প্রদেশকে খারিজ করে দিতে পারেন–তারা তাদের পথেই পা বাড়াবে। আমি বলেছি, যদিও পূর্ব পাকিস্তানের পাকিস্তানপন্থী নেতৃবৃন্দ সম্পূর্ণরূপে সহযোগিতামূলক, তথাপি তাদের নিজস্ব বিবেক ও নীতি

রয়েছে। আমাদের প্রস্তাবে রাজি হওয়ার জন্য তাদেরকে অনুরোধ জানানো যেতে পারে, কিন্তু তাই বলে অসঙ্গত কোনো দাবি মেনে নিতে তাদের ওপর আমি চাপ প্রয়োগ করতে পারবো না। তদুপরি পূর্ব পাকিস্তানীরা তাদের গণতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গী ও উত্তরাধিকারের জন্য সুপরিচিত। তারা নির্বাচনে অংশ নিচ্ছেন, কিন্তু কোনো বাছায়ের ব্যাপারে তারা রাজি হবেন না। প্রেসিডেন্টের পরামর্শে আমি পূর্ব পাকিস্তানী নেতৃবৃন্দের, বিশেষ করে জনাব নূরুল আমীনের সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করার অঙ্গীকার করেছিলাম।

ঢাকায় ফিরে আসার পর নেতৃবৃন্দকে আমি সমস্যাটির কথা জানালাম। খাজা খয়েরুদ্দিন, জনাব মাহমুদ আলী, জনাব সবুর খান, জনাব ফজলুল কাদের চৌধুরী ও অধ্যাপক গোলাম আযম রাজনৈতিক বিষয়াবলী সংক্রান্ত বৈঠকসমূহে অংশ নিতেন। তারা অনিচ্ছার সঙ্গে পিপিপিকে বরাদ্দ দেয়ার জন্য ১২টি আসন ছেড়ে দিতে রাজি হলেন– ৬টি প্রথম পর্যায়ে এবং ৬টি দ্বিতীয় পর্যায়ে। আমি আসার পরপর পিপিপি-র একটি নেতৃস্থানীয় প্রতিনিধিদল ঢাকায় এসেছিল। এই দলে ছিলেন আবদুল হাফিজ পীরজাদা, মাহমুদ আলী কাসুরী, কামাল আজফার, খুরশিদ হাসান মীর এবং অন্যরা। তাদেরকে যথাযথভাবে পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত করা হয়নি। তারা একটি হোটেলে আস্তানা স্থাপন করেন এবং তারপর পিপিপি-র একটি অফিস খুলে বসেন। তাঁরা আমার সঙ্গে যোগাযোগ করেন নি। পরিবর্তে তারা জেনারেল নিয়াজী এবং গভর্নরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী তাদেরকে ২৪টি আসন দেয়ার দাবি জানান। এর উদ্দেশ্য ছিল এ বিষয়টি সুনিশ্চিতভাবে নিশ্চিত করা যাতে জাতীয় পরিষদে অন্তত প্রাথমিক পর্যায়ে পিপিপি সংখ্যাগরিষ্ঠ দলে পরিণত হতে পারে। একবার যদি জনাব ভুট্টো প্রধানমন্ত্রী হতে পারেন, তাহলে অন্যান্য দলের এম এন এ-দের সমর্থন আদায় করে নেই সংখ্যাগরিষ্ঠতা বজায় রাখা তার জন্য কঠিন হবে না।

তারা সম্ভাব্য প্রার্থীদের সাক্ষাৎকার নিয়েছিলেন, কিন্তু উল্লেখযোগ্য কোনো সাড়া পাননি। হতাশ হওয়ার পর জনাব খুরশিদ হাসান মীরকে সঙ্গে নিয়ে জনাব কাসুরী একদিন আমার অফিসে এলেন। তাদের সফরের উদ্দেশ্য সম্পর্কে জানতে চাইলে পূর্ব পাকিস্তান থেকে ২৪টি আসন পাওয়ার ইচ্ছা ব্যক্ত করে জনাব কাসুরী জানালেন যে, এর ফলে আন্তঃপ্রাদেশিক সংহতি আরো জোরদার করা যাবে। আমিও একইভাবে তাদের আসন লাভের সম্ভাবনার ব্যাপারে অনিশ্চয়তার কথা জানিয়ে জানতে চাইলাম, তারা কোন প্রার্থীদের কথা ভেবে রেখেছেন। তারা খুব দম্ভের সঙ্গে জানালেন যে, তাদের কাছে ১৫০ জনের একটি তালিকা রয়েছে। তালিকাটি চেয়ারম্যানকে দেখানোর জন্য জনাব পীরজাদা ফেরৎ নিয়ে গেছেন। চেয়ারম্যান ঐ তালিকা থেকে বিভিন্ন এলাকায় প্রার্থীদের মনোনয়ন দেবেন। এটা ছিল একটি সম্পূর্ণ ধাপ্পা। আমি জানতাম, তাদের কোনো উল্লেখযোগ্য প্রার্থীই ছিল না। আমি অবশ্য সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম। আমার সঙ্গে পরবর্তী বৈঠকে আমি

জনাব কাসুরীকে জানিয়েছিলাম যে, পূর্ব পাকিস্তানের নেতৃবৃন্দ পিপিপিকে এখন ৬টি এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে ৬টি – মোট ১২টি আসন দিতে অনিচ্ছার সঙ্গে রাজি হয়েছেন।

এই সংবাদটি তাদের জন্য এক বিরাট আঘাতের কারণ ঘটায়। হাফিজ পীরজাদা করাচীতে জনাব ভুট্টোর কাছে বার্তাটি পৌঁছে দেন, ভুট্টো সঙ্গে সঙ্গে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার সঙ্গে দেখা করার উদ্দেশ্যে রাওয়ালপিণ্ডি যান। প্রেসিডেন্টের কাছে যাওয়ার আগে তিনি জেনারেল পীরজাদার অফিসে যান। আলোচনাকালে পীরজাদাও ৬ সংখ্যার কথা উল্লেখ করেন– যা ঢাকায় জনাব কাসুরীকে আমি জানিয়েছিলাম। জনাব ভুট্টো রাগে ফেটে পড়ে বলে ওঠেন যে, এটা তার বিরুদ্ধে একটি ষড়যন্ত্রঃ তাকে ভূপাতিত করা হয়েছে, তার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করা হয়েছে, পশ্চিম পাকিস্তানের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করা হয়েছে ইত্যাদি। রাগান্বিত অবস্থায়ই তিনি ইয়াহিয়ার অফিসে যান। ইয়াহিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়ে বলেন যে, সংখ্যা ১২-এর বেশি করা যায় কি না তা তিনি দেখবেন। আমাকে রাওয়ালপিণ্ডি যাওয়ার এবং প্রেসিডেন্টের কাছে রিপোর্ট করার আদেশ দেয়া হয়। আমি যাই। পীরজাদা আমাকে ভুট্টোর সৃষ্ট হৈ চৈ ও উত্তেজনা সম্পর্কে জানান।

পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা : অন্তরায়সমূহ

সামরিক দৃষ্টিকোণ থেকে পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা অনেকগুলো সমস্যার জন্ম দিয়েছিল। এক হাজার মাইল শত্রুপক্ষীয় ভূখণ্ড একে পশ্চিম পাকিস্তানের মূল ভিত্তি থেকে বিচ্ছিন্ন করেছিল। দরিদ্র ও উন্নয়নশীল দেশ হওয়ায় পাকিস্তানের পক্ষে দেশের উভয় অংশেই বিরাট এবং শক্তিশালী বাহিনী রাখা সম্ভব হয়নি। সেজন্য সর্বোচ্চ পর্যায়ের যুদ্ধবিশারদরা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে, সশস্ত্র বাহিনীকে সমানভাবে খণ্ডিত করলে সামগ্রিক প্রতিরক্ষাই দুর্বল হয়ে পড়বে এবং কোনো অংশেই তা শক্তিশালী থাকবে না। আন্তর্জাতিক ভূ-রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে পশ্চিম পাকিস্তানের কৌশলগত অবস্থান ছিল বেশি তাৎপর্যপূর্ণ এবং সে কারণে বিচক্ষণতার সঙ্গে এবং সঠিকভাবেই সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছিল যে, মূল বাহিনী বা শক্তি রাখা হবে পশ্চিম পাকিস্তানে। এই সিদ্ধান্তের অনুসিদ্ধান্ত হিসেবে পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল অন্য একটি বিষয়- পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা নিহিত থাকবে পশ্চিম পাকিস্তানের ভেতরে। সহজ কথায় এর অর্থ ছিল, পূর্ব পাকিস্তান কখনো আক্রান্ত হলে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে সর্বাত্মক ও রক্তক্ষয়ী এমন আক্রমণ চালানো হবে যাতে শত্রুবাহিনী পূর্ব পাকিস্তান থেকে সরে যেতে বাধ্য হয়। এমন একটি পরিস্থিতির কথা কখনো চিন্তা করা হয়নি, যখন পূর্ব পাকিস্তানের বাহিনী একা হয়ে পড়বে এবং তাদেরকে নিজেদের শক্তিতে ঐ অঞ্চলকে রক্ষা করতে হবে।

ভৌগোলিক ও সামরিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে পূর্ব পাকিস্তান ছিল ভারতের পেটের ভেতরে। সামরিক পরিভাষায় ঐ অবস্থানকে স্যালিয়েন্ট বলা হয় এবং ঐ স্যালিয়েন্টের বিশেষ কিছু সামরিক বৈশিষ্ট্য থাকে। যদি কোনো স্যালিয়েন্টের স্বত্বাধিকারী শক্তিশালী হয় তাহলে স্যালিয়েন্টটি একটি উৎক্ষেপণ মঞ্চ হিসেবে ব্যবহৃত হবে এবং আক্রমণাত্মক অপারেশনের জন্য সুবিধাজনক অবস্থান হিসেবে নিজেকে যোগান দেবে। কিন্তু যদি স্যালিয়েন্ট প্রতিরক্ষাকারী বাহিনী দুর্বল হয় তাহলে শত্রু সুবিধাজনক অবস্থানে থাকবে। সেক্ষেত্রে শত্রু সকল দিক থেকে সহজেই একে আঘাত হানতে পারবে। পূর্ব পাকিস্তানের

মানচিত্রের দিকে তাকিয়ে দেখুন। যদিও সমগ্র ভূখণ্ড নিজেই একটি স্যালিয়েন্ট ছিল, তথাপি বেশ কিছু সংখ্যক ভারতীয় স্যালিয়েন্টও এর ভেতরে ছিল। সামগ্রিকভাবে তিন দিক থেকেই পূর্ব পাকিস্তানকে ভারতীয় ভূমি ঘিরে রেখেছে। শুধু কক্সবাজারের কাছে ২৬ মাইল বর্মী ভূখণ্ড ছাড়া, যা একটি সৈকতের পথ ধরে দক্ষিণে চট্টগ্রামের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। দক্ষিণে রয়েছে ভারতীয় সমুদ্র, যেখানে পাকিস্তানের নৌ বাহিনী না থাকলে ভারতীয়রাই সমুদ্রের রাজত্ব করবে। পূর্ব পাকিস্তান সকল দিক থেকেই সম্পূর্ণভাবে ভারতবেষ্টিত ছিল।

প্রতিরক্ষামূলক যুদ্ধের দৃষ্টিকোণ থেকে অঞ্চলটির বিশেষ কিছু সুবিধা ও অসুবিধা উভয়ই ছিল। মনে হত এটা কেন্দ্র থেকে পার্শ্বে এবং এক সেক্টর থেকে অন্য সেক্টরে বাহিনী স্থানান্তরের সম্ভাবনাসহ অভ্যন্তরীণ যোগাযোগ লাইনের যোগান দেবে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে অসংখ্য প্রশস্ত নদীর অস্তিত্ব থাকায় অঞ্চলটি পরস্পরের সঙ্গে সংযোগহীন চারটি স্বতন্ত্র সেক্টর সৃষ্টি করেছিল এবং এর ফলে কোনো কেন্দ্রীয় বাহিনীর পক্ষে এক সেক্টর থেকে অন্য সেক্টরে চলাচল করার সম্ভাবনা বিদ্যমান ছিল না। আকাশ ও নদীপথের ওপর নিয়ন্ত্রণ ছাড়া পার্শ্বাভিমুখীন স্থানান্তরিত হওয়া অসম্ভব ছিল। ওদিকে অভ্যন্তরীণ যোগাযোগ লাইনকে কাজে লাগানো সম্ভব হত যদি বাহিনীর বিমানযোগে চলাচল করার সুযোগ এবং নদী পারাপারের মতো নিয়ন্ত্রণ থাকত। প্রবল পরাক্রমশালী নদীগুলোর অস্তিত্বের কারণে যে চারটি সেক্টরের সৃষ্টি হয়েছিল, সেগুলো হল ঃ

ক. রাজশাহী সেক্টর ঃ এর অবস্থান ছিল গঙ্গার উত্তরে এবং যমুনা/ব্রহ্মপুত্রের পশ্চিমে ১০ মাইল প্রশস্ত থাকায় যমুনার ওপর কোনে সেতু ছিল না। দক্ষিণে পাবনার কাছে গঙ্গার ওপর হার্ডিঞ্জ সেতু ছিল। এই সেক্টরে হিলি সংলগ্ন ভারতীয় স্যালিয়েন্ট ছিল। নদীপথে হিলি থেকে শত্রুর আক্রমণ সেক্টরটিকে সহজেই দুটি খণ্ডে খণ্ডিত করতে পারত। এটা ছিল সবচেয়ে সংকটপূর্ণ ভৌগোলিক অবস্থান। এর উত্তরের এলাকায় অসংখ্য অ্যাকসিস ছিল, যেগুলো দিয়ে শিলিগুড়ি স্যালিয়েন্ট থেকে আক্রমণ চালানো যেত।

খ. খুলনা সেক্টর ঃ এর উত্তরে গঙ্গা ও পূর্বে ছিল যমুনা নদী, আর গঙ্গা থেকে বেরিয়ে আসা শাখা নদী মধুমতি প্রবাহিত হয়েছে সেক্টরের মধ্য দিয়ে। ভারতের পশ্চিম বঙ্গের ভূমির মুখোমুখি রয়েছে এর বিস্তৃত সীমানা। কোলকাতা থেকে আগত দুটি প্রধান সড়ক অসংখ্য সম্পূরক রাস্তাসহ এই অঞ্চলে প্রবেশ করেছে, যেগুলোর সামনে কোনো প্রতিবন্ধক নেই। মধুমতি নদীই হচ্ছে প্রথম প্রতিবন্ধক, কিন্তু যশোর, খুলনা ও কুষ্টিয়া এই তিনটি বড় শহর মধুমতির সামনে অবস্থিত।

গ. ঢাকা সেক্টর ঃ এই সেক্টরটি প্রধানত মেঘনার পশ্চিমের এবং যমুনার পূর্ব দিকে অবস্থিত অঞ্চল নিয়ে গঠিত, যার উভয় পার্শ্বই প্রমত্ত নদী দুটি দ্বারা সংরক্ষিত। এর অনাবৃত সম্মুখভাগ উত্তরে অবস্থিত। সেখানে রয়েছে সবচেয়ে বিপজ্জনক প্রবেশ

মুখ, যা দিয়ে অন্য সকল সেক্টরকে পাশ কাটিয়ে শত্রু সরাসরি ঢাকা পৌছাতে পারে। এক্ষেত্রে তাদেরকে কেবল ময়মনসিংহ-জামালপুর অঞ্চলে একটি মাত্র নদী পার হতে হবে। ভারতীয় ভূখণ্ডে কিছু পাহাড় রয়েছে, যেগুলোকে সৈন্য সমাবেশের পথে অন্তরায় হিসেবে বিবেচনা করা হত। যাহোক, ভারতীয়রা যেহেতু নিজেদের ভূখণ্ডে সকল তৎপরতা চালানোর মতো যথেষ্ট সময় পেয়েছিল, সে কারণে এই পাহাড়গুলো অনতিক্রমনীয় কোনো বাধা হতে পারেনি। জামালপুর-ময়মনসিংহ থেকে টাঙ্গাইল হয়ে ঢাকা পর্যন্ত খুব ভালো সড়ক পথ রয়েছে। টাঙ্গাইলে একটি ছোট বিমানক্ষেত্র রয়েছে। যমুনা থেকে বেরিয়ে আসা শাখা নদী, যাকে ব্রহ্মপুত্র বলা হয়, তাই সেখানে যথোচিত নদী পথের অন্তরায় ছিল।

ঘ. পূর্বাঞ্চলীয় সেক্টর ঃ এই সেক্টরটি সিলেট থেকে বার্মার সীমান্তের কাছাকাছি চট্টগ্রাম-কক্সবাজার পর্যন্ত বিস্তৃত। ভারতের সঙ্গে প্রায় ৭০০ মাইলের উন্মুক্ত সীমানাসহ এটা ছিল সবচেয়ে অবারিত সেক্টর। এর পশ্চিমে রয়েছে মেঘনা নদীর পেছনের ভাগ। এখানে আক্রমণকারীর জন্য অসংখ্য পথ রয়েছে। এই সেক্টরের প্রশস্ততা ৬০-৭০ মাইল, সীমান্তের ধার দিয়ে চট্টগ্রাম থেকে সিলেট পর্যন্ত দক্ষিণ থেকে উত্তরে চলে গেছে এক দীর্ঘ সড়ক, যার কোথাও কোথাও সীমান্তের দূরত্ব বড় জোর ৫০০ গজ। রেলওয়ে লাইনও একই অবস্থায় রয়েছে। এই লাইন সীমান্তের এত কাছাকাছি দিয়ে চলে গেছে যে, কোথাও কোথাও ভারতের ভূখণ্ডের ভেতরেও কয়েক গজ পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে। এমন কি আখাউরা রেলওয়ে স্টেশনের প্ল্যাটফর্মটি প্রকৃতপক্ষে ভারতের ভেতরে অবস্থিত। আগরতলা স্যালিয়েন্টটি মেঘনার নদীপথে প্রবেশের সহজ ব্যবস্থা যুগিয়েছে। ভৈরব অঞ্চলে মেঘনার ওপর একটি সেতু রয়েছে।

ভূমির বিন্যাসই এমন যে, সীমান্ত থেকে সূচিত সকল সড়কই ঢাকা অভিমুখী হয়েছে। (চট্টগ্রাম থেকে সিলেটমুখী ব্যতীত অন্য কোনো পার্শ্বাভিমুখিন সড়কই ছিল না। এমন কি সেটাও সীমান্তের এত কাছাকাছি যে, ছোটখাটো অস্ত্রের আঘাতেই তা কেটে বিচ্ছিন্ন করা যেত।) ফলে শত্রুর ঢাকা অভিমুখী চলাচল সহজ ছিল। সড়কসমূহের সারিবদ্ধকরণের ব্যাপারে যখন আপত্তি তোলা হয়েছিল, তখন রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক যুক্তিতে বাতিল করে দেয়া হয়েছে। গুরত্বপূর্ণ শহর খুলনা, যশোর, রাজশাহী, দিনাজপুর, সৈয়দপুর. রংপুর, সিলেট, কুমিল্লা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, ফেনী প্রভৃতির প্রতিটিই ভারত সীমান্তের খুব নিকটবর্তী ছিল। চট্টগ্রাম উন্মুক্ত ছিল সমুদ্র থেকে আক্রমণের জন্য। কেবল ওপরোল্লিখিত শহরগুলোরই নয়, সমগ্র সেক্টরেরও পেছনে রয়েছে সকল নদীর অন্তরায়। নদীর অন্তরায়ের ওপর কোনো প্রতিরক্ষার ঘাঁটি করতে হলে পূর্ব পাকিস্তানের বিশাল এলাকা থেকেই বাহিনী প্রত্যাহার করতে হত।

রেলওয়ে লাইন স্থাপিত হয়েছিল বৃটিশ আমলে। ফলে স্পষ্ট কারণেই ভারত–পাকিস্তান সংঘাতের প্রেক্ষাপটে এর কোনো কৌশলগত ভূমিকা পালনের সুযোগ ছিল না। শত্রুতা শুরু হওয়ারও আগে এর ট্র্যাক কাটা হয়েছিল এবং তা ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে পড়েছিল। হিলি রেলওয়ে স্টেশনের স্টেশন মাস্টারের বাংলার প্রবেশ দরোজা ছিল পাকিস্তানে, আর পেছনের জানালা ছিল ভারতে।

বর্ষাকালে সমগ্র অঞ্চলটি বন্যাকবলিত হয়ে পড়ে আর রয়েছে গ্রীষ্মকালে নৌ চলাচলের উপযোগী প্রায় ৩০০টি খাল। বর্ষাকালে মিলিটারি অপারেশন সীমাবদ্ধ থাকে। কিন্তু নভেম্বর থেকে মার্চ পর্যন্ত সময়পর্বে পূর্ব পাকিস্তানের সমগ্র অঞ্চলই পাঞ্জাবের সমতল ভূমির মতো চলমান অপারেশনের জন্য চমৎকার হয়ে ওঠে।

যে সীমান্তের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা করতে হয়েছিল তার মোট দৈর্ঘ্য ছিল ২৬০০ মাইল (পশ্চিম পাকিস্তানে চাম্ব থেকে করাচী পর্যন্ত পূর্বাঞ্চলীয় ফ্রন্টের দৈর্ঘ্য ছিল মাত্র ১৩০০ মাইল)। প্রতিটি সেক্টরেই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও সংবেদনশীল এলাকায় অন্তত চারটি করে প্রবেশমুখ ছিল, যেগুলো দিয়ে শত্রু আসতে পারত।

পূর্ব পাকিস্তান ভূখণ্ডে বাহিনী মোতায়েন করার সম্ভাব্য তিনটি প্রতিরক্ষা লাইন রয়েছেঃ

ক: বহির্বৃত্ত ঃ যশোর-রাজশাহী-দিনাজপুর, সৈয়দপুর, রংপুর-জামালপুর-ময়মনসিংহ-সিলেট–কুমিল্লা এবং চট্টগ্রাম সীমান্তের সামনের প্রতিরক্ষা লাইনটি অর্ধ চন্দ্রাকৃতি গঠন করেছে। এমন একটি এলাকায় মোতায়েন করতে হলে ১৮০০ মাইলব্যাপী করতে হবে এবং ফলে প্রতিরক্ষাকৃত স্থানগুলোর মধ্যে বিরাট শূন্যতার সৃষ্টি হবে।

খ. মধ্যবর্তী বৃত্ত ঃ খুলনা সেক্টরে মধুমিত নদীর তীর ধরে যশোর-খুলনাকে শক্তিশালী প্রতিরক্ষা অবস্থান থেকে বাদ দিয়ে। উত্তর দিকে রাজশাহী সেক্টরে দিনাজপুর-রংপুরকে শক্তিশালী প্রতিরক্ষা অবস্থান থেকে বাদ দিয়ে হিলি সংলগ্ন এলাকার প্রতিরক্ষা করতে হবে। ঢাকা সেক্টরে উত্তরে ব্রহ্মপুত্র নদীর এবং পূর্বে মেঘনা নদীর তীর ধরে নদীর ওপরের সেতুগুলোর নিরাপত্তা বিধানসহ প্রতিরক্ষামূলক অবস্থান নিতে হবে। পূর্বাঞ্চলীয় সেক্টরে সিলেট ও চট্টগ্রামকে স্বতন্ত্র প্রতিরক্ষা অবস্থানে পরিণত করতে হবে। মেঘনা নদী দিয়ে শত্রুর প্রবেশ ঠেকাতে হলে কুমিল্লাকে পরিত্যাগ করে মেঘনার পূর্ব দিকে প্রতিরক্ষামূলক অবস্থান নিতে হবে।

গ. নিকটবর্তী বৃত্ত : পশ্চিমে যমুনা, উত্তরে ব্রহ্মপুত্র এবং পূর্বে মেঘনার তীর ধরে প্রতিরক্ষামূলক অবস্থান অর্থাৎ কেবল ডিম্বাকৃতির ঢাকা সেক্টরকে শক্তিশালীভাবে প্রতিরক্ষা করতে হবে। সকল ট্রুপসকেই নদীর প্রতিবন্ধকের সম্মুখীন হতে হবে। সামরিক, রাজনৈতিক ও মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে ঢাকার গুরুত্ব ছিল সর্বোচ্চ। সুতরাং যে কোনো মূল্যে শেষ পর্যন্তও ঢাকাকে রক্ষা করতে হবে। মধ্যবর্তী বৃত্ত লাইন ও নিকটবর্তী প্রতিরক্ষার সমন্বয় ঘটিয়ে এবং যতটা সম্ভব নদীর প্রতিবন্ধকের

অগ্রবর্তী অংশে বাহিনী মোতায়েনের মাধ্যমে ঢাকাকে সবচেয়ে ভালোভাবে প্রতিরক্ষা করা সম্ভব। তারপর যুদ্ধ বিলম্বিতকরণ অ্যাকশন এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে ঢাকার নিকটবর্তী প্রতিরক্ষা। প্রদেশের প্রতি ইঞ্চি ভূমির প্রতিরক্ষা করা সম্ভব নয়। পশ্চিম পাকিস্তান থেকে যে পরিমাণ বাহিনীকে পাঠানো সম্ভব তারা কেবল জাতিসংঘের মাধ্যমে রাজনৈতিক সমাধানে আসা পর্যন্ত 'অস্তিত্বে টিকে থাকতে' পারে।

ঘ. রাজনৈতিক ফ্যাক্টর : পরিপূর্ণ সামরিক দৃষ্টিকোণ থেকে নিকটবর্তী বৃত্ত সবচেয়ে শক্তিশালী প্রতিরক্ষামূলক অপারেশনাল কনসেপ্ট যুগিয়েছে। পশ্চিম পাকিস্তান থেকে এ ধরনের একটি রণকৌশলের ওকালতি করা সামরিক পণ্ডিতদের জন্য সহজ ছিল। আমিও এর একটি সংশোধিত রূপের পক্ষে ওকালতি করেছিলাম। কিন্তু একজন পূর্ব পাকিস্তানীর দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে এমন একটি ধারণা ছিল ভীতিপ্রদ, যেখানে পূর্ব পাকিস্তানের এক বিরাট, প্রকৃতপক্ষে বৃহত্তর অংশ শত্রুর হাতে সমর্পণ করে দিতে হবে। শুধু রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলেও পূর্ব পাকিস্তানীদের জন্য এটা ছিল অগ্রহণযোগ্য। কারণ পশ্চিম পাকিস্তানীদের মতো তাদের কাছেও নিজেদের ভিটেমাটি, বাড়িঘর ও নারীদের সম্মান ছিল অত্যন্ত পবিত্র। ১৯৬৫ সালে ভারতের সঙ্গে যুদ্ধ চলাকালে এবং যুদ্ধের পর সম্পূর্ণ সামরিক দৃষ্টিকোণ থেকে বন্ধুত্বপূর্ণ কিন্তু বিদেশী রণকৌশলবিশারদরা লাহোর ও শিয়ালকোট থেকে বাহিনী প্রত্যাহার করে নেয়ার পরামর্শ দিয়েছিলেন। আমাদের মধ্যে কতজন স্বতঃস্ফূর্তভাবে অমন একটি রণকৌশল গ্রহণ করবো? নিকটবর্তী বৃত্তের বা ঢাকা; ভিত্তিক এই প্রতিরক্ষামূলক রণকৌশল কেবল জাতিসংঘে সংঘাতের একটি রাজনৈতিক সামাধান লাভের উদ্দেশ্যে কার্যকর বা উপকারী হতে পারতো। এর প্রধান উদ্দেশ্য হতে পারে 'অস্তিত্বে টিকে থাকা' যাতে ভারতকে সেনা প্রত্যাহার করে নিতে কিংবা রাজনৈতিক সমাধানে আসতে বাধ্য করার জন্য আন্তর্জাতিক চাপ সৃষ্টি করা সম্ভব হয়।

ওপরের অংশটুকু আমার সেই মূল্যায়নভিত্তিক, যা আমি ১৯৬৭ সালে এক্স সুন্দরবন ১ পরিচালনাকালে লিখেছিলাম। পরবর্তীকালে পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিরক্ষার জন্য কনসেপ্ট চূড়ান্তকরণের কাজে মেজর জেনারেল মুজাফফর উদ্দিন ও লেঃ জেনারেল সাহেবজাদা ইয়াকুব খানের প্রয়োজনমতো সকল অবদান আমি রেখেছিলাম। এই কনসেপ্ট বা ধারণা ছিল :

ক. ভূখণ্ডের প্রতিরক্ষা সম্ভব নয়। বেশি গুরুত্বপূর্ণ হল বাহিনীর অস্তিত্ব নিয়ে টিকে থাকা।

খ. প্রতিরক্ষার সামর্থ্য বাড়ানোর উদ্দেশ্যে সর্বাধিক পরিমাণে নদীর প্রতিবন্ধকসমূহের সদ্ব্যবহার করা।

গ. যে কোনো মূল্যে ঢাকাকে রক্ষা করা।

দৃশ্যপটে নিয়াজী আসার আগে পর্যন্ত এটাই ছিল পরিকল্পনা। তিনি ছিলেন একজন সিপাহী-জেনারেল এবং তাচ্ছিল্যকারী বুদ্ধিজীবী। তিনি ছিলেন বাইরের ব্যাপারে বেশি কৌতূহলী এবং একজন দাম্ভিক কমাণ্ডার, যিনি প্রচারণায় বেশি নির্ভর করতেন এবং হৈ-চৈপূর্ণ বিবৃতির মাধ্যমে নিজের প্রচারকে ভালোবাসতেন।

নিয়াজী অপারেশনের কনসেপ্টকে পরিবর্তন করেছিলেন। তার অপারেশনাল ইন্সট্রাকশনে উল্লেখ করা হয় যে, পূর্বাঞ্চলীয় কম্যাণ্ডের মিশন হল নিম্নবর্ণিত পথে পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা :

ক. ত্রিপুরা, কোলকাতা কিংবা শিলিগুড়ি কমপ্লেক্স অভিমুখে আক্রমণাত্মক অ্যাকশন গ্রহণ করা;

খ. সুযোগ সৃষ্টি হলে যত বেশি সম্ভব ভারতীয় ভূখণ্ড আত্মীভূত করা এবং

গ. যে কোনো মূল্যে ঢাকার প্রতিরক্ষা নিশ্চিত করা।

এই আক্রমণমুখী মিশনের ভিত্তিতে ভারতের ভূখণ্ডে পাল্টা-আক্রমণ চালানোর উদ্দেশ্যে তিনি শক্তিশালী অবস্থানবিন্দু ও দুর্গসমূহে আগেই রিজার্ভ সৈন্য মোতায়েনের মাধ্যমে একটি অগ্রবর্তী প্রতিরক্ষামূলক অবস্থান গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। নিয়াজী তাঁর কনসেপ্টে-নির্ভর অপারেশনাল ইন্সট্রাকশনের মূল কথায় বলেছিলেন, 'সংক্ষেপে এর প্রত্যাশিত ফলাফল হল শত্রুর আক্রমণকে বিলম্বিত করা, তাকে জড়িয়ে ফেলা এবং সরাসরি ছত্রভঙ্গ করে দেয়া, তার উদ্যোগকে কেড়ে নেয়া এবং এই প্রক্রিয়ায় তার প্রাণহানি ঘটানো, তাকে দুর্বল করা এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে তাকে ধ্বংস করা।' শুনতে খুব চিত্তগ্রাহী ও দম্ভপূর্ণ হলেও এই মূলকথাটি প্রায়োগিক দিক থেকে ছিল বাস্তবতাবিবর্জিত, এমন কি তাঁর অধীনে প্রয়োজনীয় বাহিনী ন্যস্ত করলেও তা সম্ভব হত না।

পরিকল্পনাটি প্রণীত হওয়ার পর এক্স সুন্দরবনের মতো একটি যুদ্ধক্রীড়া অনুষ্ঠান করা উচিত ছিল। কিন্তু তা করা হয়নি। শুধু সি ও সি জেনারেল হামিদের উপস্থিতিতে একটি আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সেখানে উত্থাপিত সকল আপত্তিকেই অগ্রাহ্য করা হয়। নিয়াজীর এই অবাস্তব পরিকল্পনার ব্যাপারে জেনারেল হামিদ এবং পরবর্তীকালে জি এইচ কিউ কোনো মন্তব্য প্রদান করেনি।

অন্যদিকে পাকিস্তানীরা অগ্রবর্তী অবস্থান ও অনড় প্রতিরক্ষা গ্রহণ করলে কি সুবিধাদি পাওয়া যাবে সে কথা ভারতীয়রা সম্পূর্ণরূপেই বুঝতে পেরেছিল। তারা চতুরতার সঙ্গে সমগ্র সীমান্তব্যাপী মুক্তিবাহিনীর আক্রমণকে সক্রিয় করে তুলেছিল। নিয়াজী একটি ষাঁড়ের মতো প্রতিটি হামলার বিরুদ্ধে পাল্টা আক্রমণ চালিয়েছেন এবং এ ভাবে তাঁর সকল বাহিনীকে অগ্রবর্তী অবস্থানে ঠেলে দিয়েছেন। ফলে ১৯৭১ সালের ৪ ডিসেম্বর যখন সর্বাত্মক যুদ্ধ শুরু হয়, তার আগেই তাঁর বাহিনী পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছিল।

ভারতীয়রা কোনো ঝুঁকি নিতে চায়নি। পশ্চিম বঙ্গের নকশাল বিদ্রোহের অজুহাতে তারা পূর্ব পাকিস্তানের চারদিকে আট ডিভিশনের বেশি সেনা ও একটি আর্মারড বিগ্রেডের সামাবেশ ঘটিয়েছিল। প্রতিটি ডিভিশনে ছিল স্বাভাবিক তিন ব্রিগেডের বেশি শক্তি। তারা ১৫০,০০০ নিয়মিত ট্রুপসের বিশাল সমাবেশ ঘটিয়েছিল এবং এর সমর্থনে ছিল বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্সের ৫০,০০০ এবং মুক্তি বাহিনীর ১,০০,০০০ সদস্য। ঢাকায় পৌঁছানোর উদ্দেশ্যে পূর্ব, পশ্চিম ও উত্তর এই তিন দিকে থেকেই আক্রমণ পরিচালনার জন্য তিনটি কোর এইচ কিউ মোতায়েন করা হয়েছিল। নদীর প্রতিবন্ধক অতিক্রম করার মতো বিপুল প্রকৌশল সমর্থন ছিল প্রতিটি কোর- এরই।

উল্লম্ব বা আকাশ পথে চলাচলের জন্য ছিল একটি হেলিকাপ্টার ফ্লিট, যা মাত্র কয়েক ঘণ্টায় একটি ব্যাটেলিয়নকে পারাপার করার জন্য যথেষ্ট ছিল। প্রয়োজনের সময় কাজে লাগানোর জন্য কোলকাতায় মোতায়েন ছিল প্যারা ব্রিগেড।

পাকিস্তান আর্মির ছিল তিনটি ডিভিশন ও একটি ব্রিগেড। মিলিটারি অ্যাকশনের আগে পূর্ব পাকিস্তানে একটি মাত্র ডিভিশন ছিল, ১৪ ডিভিশন। এটাই ছিল একমাত্র ডিভিশন, যার নিজস্ব সম্পূরক আর্টিলারি ও ইঞ্জিনিয়ার্স ছিল। এর কোনো আর্মারড ইউনিট ছিল না। মিলিটারি অ্যাকশনের পর ৯ ডিভিশন ও ১৬ ডিভিশনকে বাইরে পাঠিয়ে দেয়া হয়। বাইরে চলে যাওয়ায় আর্টিলারি ও ইঞ্জিনিয়ার্সের আকারে তারা সহায়ক অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে যেতে পারেনি। পশ্চিম পাকিস্তানের প্রতিরক্ষার জন্য এ সবের প্রয়োজন ছিল এবং সেখানেই সে সব রেখে দেয়া হয়। সহৃদয়তার সঙ্গে জি এইচ কিউ একটি আর্মারড রেজিমেন্টকে পূর্ব পাকিস্তানে পাঠিয়েছিল। এদের বাতিল হয়ে যাওয়া এমন সব এম ২৪ ট্যাঙ্ক দেয়া হয়েছিল, যেগুলো এমনকি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ই পরিত্যক্ত হয়ে গিয়েছিল। এটা ছিল এক মরণ ফাঁদ এবং ভারতীয় আর্মির এম ৫৪ ও পিটি ৭৬-এর সামনে কোনোভাবেই সমকক্ষ নয়। পূর্ব পাকিস্তানে অবস্থানরত পাকিস্তান আর্মি মূলত ছিল একটি পদাতিক বাহিনী যা অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা বিধান করার মতো দায়িত্ব পালনের উপযোগী ছিল। আর্টিলারির সর্বমোট চারটি রেজিমেন্টকে ১৮৯০ মাইলের সক্রিয় সীমান্ত রক্ষা করতে হয়েছিল। এই রেজিমেন্টগুলোর একটির কাছে ছিল ৩.৭˝ হাওয়িটজার– যেগুলো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগেই পরিত্যক্ত হয়েছিল এবং যেগুলোর গোলাবর্ষণের রেঞ্জ ছিল মাত্র ৬৮০০ গজ। এই তিনটি ডিভিশনকে পশ্চিম পাকিস্তানের ডিভিশনের সঙ্গে তুলনা করে দেখা যেতে পারে। সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানে যে পরিমাণ গোলাবারুদ বা ফায়ার পাওয়ার ছিল তা লাহোরের প্রতিরক্ষায় নিয়োজিত একটি মাত্র ডিভিশনের চাইতেও কম ছিল।

আধুনিক বিমানবহরের দশটি স্কোয়াড্রনের বিরুদ্ধে পি এ এফ-এর বাতিল হয়ে যাওয়া এফ ৮৬-সহ মাত্র একটি স্কোয়াড্রন ছিল। আই এ এফ-এর সকল বিমান ঘাঁটি অবস্থিত ছিল পূর্ব পাকিস্তানের চারদিকে, মাত্র দশ পনেরো মিনিটের উড্ডয়ন দূরত্বে। দীর্ঘ সময়ব্যাপী

তারা আক্রমণ অব্যাহত রাখতে পারতো। আই এ এফ-এর সে সময় অনেক উন্নত মানের বিমান ছিল। এফ ৮৬ ও মিগ ২১-এর মধ্যে কোনো তুলনাই চলতে পারে না। একটি ঘন্টায় ৬০০ মাইল বেগে ওড়ে, অন্যটি ওড়ে ১১০০ মাইল বেগে।

ভারতীয় নৌ বাহিনী তাদের একমাত্র বিমানবাহী জাহাজকে দক্ষিণে মোতায়েন করেছিল। পাকিস্তানের প্রকৃতপক্ষে কোনো নৌ বাহিনীর শক্তিই ছিল না। কয়েকটি মাত্র গানবোট ছিল, যেগুলোকে দিয়ে বড়জোর গোয়েন্দা কাজের দায়িত্ব পালন করা যেত।

এত সব অপর্যাপ্ততা ও ঘাটতির পরও জেনারেল নিয়াজী তাঁর সমগ্র বাহিনীকে অনেক বেশি অগ্রবর্তী অবস্থানে মোতায়েন করেছিলেন, এমন কি ধারণাগত বহির্বৃত্ত প্রতিরক্ষার চাইতেও অগ্রবর্তী অবস্থানে।

ভারতীয় আক্রমণ

৩ ডিসেম্বরের ঘটনা। মাগরিবের নামাজের পর বিবিসির দুই সাংবাদিক গেভিন ইয়াং ও তাঁর একই সংস্থার সহকর্মী আমার সঙ্গে পরিস্থিতি নিয়ে আলাপ করছিলেন। আন্তর্জাতিক সংবাদ মাধ্যমসমূহের বিরাট সংখ্যক প্রতিনিধির উপস্থিতি ইঙ্গিত দিচ্ছিল যে, বড় ধরনের কিছু একটা ঘটনার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। এঁরা কোনো না কোনোভাবে আগেই বড় বড় ঘটনার খবর পেয়ে যান। যেখানেই বিপর্যয়ের গন্ধ পান সেখানেই তারা শকুনের মতো উপস্থিত হয়ে থাকেন। গেভিন ইয়াং শেখ মুজিবের মুক্তির ব্যাপারে আমার মতামত সম্পর্কে জানতে চাইলেন। তাঁকে কি মুক্তি দেয়া উচিত? আমি বললাম, "হ্যাঁ, দেশের বৃহত্তর স্বার্থে তাঁকে মুক্তি দেয়া উচিত। তাঁকে গ্রেফতার করার সময় থেকেই মুজিব সম্পর্কে এটাই আমার অভিমত।" তিনি বললেন যে, প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়াকেও তিনি একই প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেছিলেন, যার জবাবে ইয়াহিয়া বলেছেন, "না। এখানে আমার সম্মান জড়িত রয়েছে।" একথা শোনার পর আমার মন্তব্য ছিল, "একজন ব্যক্তির সম্মানের চাইতে দেশের সম্মান বেশি গুরুত্বপূর্ণ।" ইয়াং বললেন, তিনিও ইয়াহিয়াকে একই কথা বলেছিলেন, কিন্তু তিনি মুজিবকে মুক্তি দিতে সম্মত হননি। এরপর তিনি আমাকে প্রশ্ন করলেন,"ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে কি কোনো যুদ্ধ বাঁধবে?" আমি বললাম, "আমার মনে হয় না কোনো যুদ্ধ বাঁধবে। ভারতের আক্রমণের জবাবে প্রতিক্রিয়া দেখানোর দায়িত্ব আমাদের এবং আমরা যুদ্ধ শুরু করতে আগ্রহ দেখাব না। কারণ আমাদের স্বার্থে তেমন কোনো যুদ্ধ মঙ্গলজনক হবে না।" আমি তখনো আমার মতামতের ব্যাখ্যা দিতে পারিনি, এমন সময় টেলিফোন বেজে উঠলো। টেলিফোনটি এসেছিল কোর এইচ কিউ থেকে। আমাকে জানানো হল যে, ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে এবং আমি যেন অবিলম্বে কোর এইচ কিউতে গিয়ে রিপোর্ট করি। ক্ষমা চেয়ে এবং যুদ্ধের ব্যাপারে কোনো কিছু না জানিয়ে তাঁদেরকে আমি বিদায় জানালাম এবং গভর্নরকে ঘটনাপ্রবাহ জানানোর জন্য তাঁর কাছে

গেলাম। প্রেসিডেন্ট তাঁকে অবহিত করেন নি। তিনি হতচকিত হয়ে গেলেন এবং উত্তেজিত হলেন। আমি কোর এইচ কিউতে গেলাম, সেখানে আমাদেরকে সর্বশেষ ঘটনাবলী ও পরিস্থিতি সম্পর্কে ব্রিফ করা হল। ব্রিফিংটি ছিল বিশদ বিবরণহীন ও অসম্পূর্ণ। কারণ যুদ্ধের শুরু সম্পর্কে তাদের নিজেদেরও কোনো পূর্ব ধারণা ছিল না, স্থল ও আকাশের পরিস্থিতি সম্পর্কেও তাদের কিছু জানা ছিল না। আমাদের বাহিনী যুদ্ধের অবস্থানে রয়েছে কি না আমি জানতে চাইলাম। উত্তরটি ছিল হ্যাঁ-সূচক। কারো মধ্যে কোনো আতংক ছিল না। সবাই খুব আস্থার সঙ্গে কথা বললেন। আমাদের তথা অসামরিক সরকারের কাছ থেকে তারা কিছু প্রত্যাশা করেন কি না, আমার এই প্রশ্নের জবাবে নিয়াজী বললেন, "আমরা আমাদের দেখাশোনা করতে পারবো। আমাদের সবকিছুই আছে।"

জি এইচ কিউ-এর উদ্দেশ্যের ব্যাপারে শুধু যে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর ও পূর্বাঞ্চলীয় কম্যান্ডের কম্যান্ডারকেই অন্ধকারে রাখা হয়েছিল তা-ই নয়। পাকিস্তান নৌ বাহিনীর কম্যান্ডার ইন চিফও রেডিও-র প্রচারিত খবর থেকে যুদ্ধ শুরু হওয়ার কথা জানতে পেরেছিলেন। সবচেয়ে অবিশ্বাস্য হল, আই এস আই-এর ডি জি জিলানীও এ সম্পর্কে কিছুই জানতেন না। তিনি স্বয়ং আমাকে বলেছেন যে, খবরটি জানার পর তিনি একে ঠাট্টা বলে মনে করেছিলেন। অমন একটি অসমন্বিত ও এলোমেলো প্রচেষ্টায় কে জয় লাভ করার আশা করতে পারে?

৪ ডিসেম্বর পূর্ব পাকিস্তান খুব শান্ত দিন ছিল- এটা ছিল ঝড়পূর্ব স্থিতিকাল। ঐ দিনটিতে ভারতীয় আর্মি আক্রমণের সমাবেশ স্থলগুলোতে ট্রুপসের চূড়ান্ত আনা-নেয়ার কাজ সম্পন্ন করেছিল। অবশ্য মুক্তিবাহিনী পাকিস্তানী বাহিনীর পশ্চাদ্ভাগের বিরুদ্ধে সক্রিয় ছিল, তারা যোগাযোগ ও সরবরাহে বিঘ্ন সৃষ্টি করেছে। ট্রুপসের স্বল্পতার কারণে ট্রেঞ্চ খনন ও দুর্গ নির্মাণের কাজে পাকিস্তান আর্মি বাঙ্গালী শ্রমিকদের ব্যবহার করেছিল। শ্রমিকদের মধ্যে বিদ্রোহীরা অনুপ্রবেশ করে। ফলে পাকিস্তান আর্মি মোতায়েন সম্পর্কে সম্পূর্ণ তথ্য তারা জেনে যায়। এমন কি তাও যদি না হত, তাহলেও তারা সব জানতে পারত। কারণ তারা ঐ সব এলাকার অধিবাসী ছিল। সুতরাং পাকিস্তান আর্মির সমাবেশ ও প্রতিরক্ষার ব্যাপ্তি, প্রশস্ততা ও গভীরতা সম্পর্কে তারা সব জেনে গিয়েছিল। এ সব তথ্য যথাযথভাবে ভারতীয়দের কাছে পৌছে দেয়া হয়েছিল। তথ্যসমৃদ্ধ হয়ে এবং বিদ্রোহীদের সাহায্যে দিকনির্দেশনা প্রাপ্ত হয়ে ৪/৫ ডিসেম্বর রাতে ভারতীয়রা সকল সেক্টরে একযোগে আক্রমণ চালিয়েছিল।

৫ ডিসেম্বর সকালের ব্রিফিং-এ কুমিল্লার দক্ষিণ অঞ্চলের সংকটময় পরিস্থিতির এবং একটি ব্যাটালিয়ানের আত্মসমর্পণ করার দুঃসংবাদ জানানো হয়েছিল। সবচেয়ে অসম্মানকর ব্যাপারটি ছিল এই যে, মেগাফোনযোগে ট্রুপসকে আত্মসমর্পণ করার আহ্বান জানানোর জন্য ব্যাটালিয়ান কম্যান্ডারদের বাধ্য করা হয়েছিল। তারা তা করতে রাজি হওয়ায় বোঝা

গিয়েছিল যে, ট্রুপসের মনোবল খুবই নিচু হয়ে পড়েছিল। অন্যান্য সেক্টর থেকে আগত সংবাদেও জানা গিয়েছিল যে, ভারতীয় আর্মি এগিয়ে আসছে।

পূর্ববর্তী এক আকাশ যুদ্ধে আমরা দুটি এফ ৮৬ হারিয়েছিলাম। বিমানবাহিনী ৫ ডিসেম্বর সকালে আরো দুটি বিমানকে পাঠিয়েছিল। এ দুটি ৫ ডিসেম্বর সকাল ৯ টায় অবতরণ করে এবং এটাই ছিল এয়ার অপারেশন ও বিমান সমর্থনের সমাপ্তি। ভারতীয় বিমান বাহিনীর দশ স্কোয়াড্রন বিমান সকল দিক থেকে একমাত্র কার্যক্ষম ঢাকার বিমান বন্দরের ওপর সার্বক্ষণিক আক্রমণ পরিচালনা করেছে। বিমান বন্দরের প্রতিরক্ষার জন্য মোতায়েনকৃত অ্যান্টি-এয়ারক্রাফট রেজিমেন্ট এক বীরত্বপূর্ণ কৃতিত্ব দেখিয়েছিল। শেষ পর্যন্তও তারা গোলা বর্ষণ অব্যাহত রেখেছিল, এমন কি যুদ্ধ বিরতির পরও একটি ক্যানবেরা বিমানকে ভূপাতিত করেছিল। তারা এক সাহসী বাহিনী ছিল এবং প্রথম দিনেই তারা অন্তত চারটি শত্রুর বিমান ভূপাতিত করেছে। এগুলোর মধ্যে একটি বিমান গিয়ে পড়েছিল মীরপুরে, যেখানে বিহারীরা বসবাস করতো। সেখানে সর্বত্র বন্য উল্লাস শুরু হয়ে যায়। মিষ্টি বিতরণ করা হয়। জনগণের প্রতিক্রিয়া দেখে গভর্নর হাউসে আমরা অনুপ্রাণিত হয়েছিলাম। ওয়াকিবহাল বাঙ্গালী মহলগুলোতেও হঠাৎ করে পরিবর্তন দেখা গিয়েছিল। যারা ভারতীয় আগ্রাসনের পরিণতি বুঝতে পেরেছিলেন, তারা যুদ্ধে ভারত বিজয়ী হলে ভারতীয় দখলদারিত্বের আশংকায় ভীত হয়ে পড়েছিলেন। মানুষকে বলতে শোনা গেছে যে, ভারতীয় বাহিনী পাকিস্তানী বাহিনীর স্থান দখল করুক, এটা তারা চায় না। পাকিস্তানীরা অন্তত মুসলমান ভাই ছিল। আমরা তাদের সঙ্গে কথা বলতে পারতাম। অজানার ভীতি তাদেরকে আঘাত করেছিল। কিন্তু আমাদের আনন্দোল্লাস ছিল স্বল্পস্থায়ী।

আমরা খবর পেলাম ভারতীয় বিমানগুলো রাশিয়ার তৈরি বোমা দিয়ে আক্রমণ চালাচ্ছে, সেগুলো একমাত্র রানওয়েতে খুব গভীর গর্ত সৃষ্টি করেছে এবং রানওয়েকে ব্যবহারের অনুপযোগী করে ফেলেছে। আমরা রানওয়েটি মেরামত করার আয়োজন করলাম, কিন্তু পাকিস্তান বিমান বাহিনী একে মেরামত করতে ব্যর্থ হলো। তারা রেঙ্গুন হয়ে সকল বৈমানিককে পশ্চিম পাকিস্তানে পাঠিয়ে দেয়ার নির্দেশ পেলো। ফলে কোনো রকম আকাশ পথের সমর্থন ছাড়া যুদ্ধ চালাতে হয়েছিল। বৈমানিকদের প্রত্যাহার করে নেয়ার ঘটনার মধ্য দিয়ে এ তথ্য প্রকাশিত হয়ে পড়েছিল যে, রাওয়ালপিণ্ডির কর্তৃপক্ষ পূর্ব পাকিস্তানকে পরিত্যাগ করেছিল। আমি শেষ মুহূর্তেও সকলকে বোঝাতে চেষ্টা করেছিলাম যে, আমাদের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা নিয়ে কোলকাতা বিমান ঘাঁটির ওপর একমুখী আক্রমণ চালানো উচিত। আমার পরামর্শ ছিল যে, নতুন রাজধানীর প্রধান সড়কের বৈদ্যুতিক খুঁটিগুলো তুলে ফেলা হোক এবং এই সড়কটি ফাইটার বিমানের উড্ডয়নের উপযোগী ছিল। এফ ৮৬-র জন্য কোলকাতা অনেক দূরবর্তী এলাকা ছিল এবং আক্রমণ শেষে সেখান থেকে ফিরে আসা সম্ভব

হত না। কিন্তু ঢাকায় থেকেও এগুলো যখন কোনো কাজে আসছিল না, সে কারণে আমি একমুখী অভিযানের প্রস্তাব দিয়েছিলাম। একে আত্মঘাতী হিসেবে বর্ণনা করা যেতে পারে। কিন্তু এর মাধ্যমে সারা বিশ্বকে একথা জানানো যেত যে, আমরা শেষ পর্যন্তও যুদ্ধ করতে প্রতিজ্ঞ ছিলাম। পাকিস্তানীদের বিমান শক্তি নেই জেনে ভারতীয়রা কোনো বিমান আক্রমণের আশংঙ্কা করেনি, সুতরাং আকস্মিক আক্রমণের মাধ্যমে হতচকিত করে তাদের ক্ষতি সাধন করা যেত। আমার প্রস্তাব ছিল, কোলকাতা বিমান ঘাঁটিতে অবস্থানরত শত্রুর বিমান বহরের যত বেশি সম্ভব ক্ষতি সাধনের পর আমাদের বৈমানিকরা বেইল আউট করে বিমান থেকে নেমে আসতে পারে। যা হোক, আমার এই প্রস্তাব গ্রহণ করার মতো কেউ তখন ছিল না এবং ৬ ডিসেম্বর রাতে পশ্চিম পাকিস্তানের পথে বৈমানিকদেরকে রেঙ্গুন পাঠিয়ে দেয়া হয়েছিল।

কোর এইচ কিউ-এ ৬ ডিসেম্বর ব্রিফিং-এর পর জেনারেল নিয়াজীকে আমি নদীর তীর ধরে ট্রুপস ফিরিয়ে আনার পরামর্শ দিয়েছিলাম। মানচিত্রের ওপর দিকনির্দেশ করে আমি তাঁকে প্রশ্ন করেছিলাম, দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও ও কুমিল্লায় ট্রুপস কি কাজ করছে? আমি আশংকা প্রকাশ করে এ কথাও বলেছিলাম যে, হিলির সংলগ্ন সংকীর্ণ লেকটি যে কোন সময় কেটে দেয়ার আশংকা রয়েছে এবং সেজন্য দিনাজপুর, রংপুর ও ঠাকুরগাঁও থেকে ট্রুপস প্রত্যাহার করে বগুড়ায় নিয়ে আসার পরামর্শ আমি দিয়েছিলাম। কুমিল্লা গ্যারিসনকে মেঘনা নদীর লাইনে নিয়ে আসা দরকার। অন্যান্য সেক্টরেও একই ধরনের কৌশল অবলম্বন করা উচিত। শুনে নিয়াজী আমার দিকে তাকালেন এবং পাঞ্জাবী ভাষায় বললেন, "তারা এখনো আক্রান্ত হয়নি।" স্পষ্টতই কৌশলগত প্রত্যাহার সম্পর্কে তাঁর কোনো ধারণা ছিল না। পরিকল্পিত প্রত্যাহারের পথে যাওয়ার পরিবর্তে তিনি এক নির্দেশ জারি করে বললেন যে, শতকরা ৭৫ ভাগ ট্রুপস হতাহত হওয়ার আগে কোথাও থেকে প্রত্যাহার করা যাবে না। এটা ছিল সবচেয়ে অপেশাদার এক নির্দেশ এবং এ ব্যাপারে কোনো মন্তব্যের প্রয়োজন পড়ে না। তিনি অবশ্য সংশ্লিষ্ট কম্যান্ডারদের সঙ্গে কথা বলবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। ৭ তারিখে কিছুই শোনা যায়নি, কিন্তু ৮ তারিখে আমার প্রশ্নের জবাবে নিয়াজী জানালেন যে, তিনি কুমিল্লার ব্রিগেড কম্যান্ডার আতিকের সঙ্গে আমার প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা করেছেন। কিন্তু আতিক জানিয়েছেন যে, তার পক্ষে প্রত্যাহার করা সম্ভব নয়, কারণ শত্রু ইতিমধ্যেই তার পশ্চাতের রাস্তা কেটে ফেলেছে। অন্যান্য সেক্টর থেকে আগত সংবাদও বিরামহীনভাবে একই ধরনের বিপর্যয় পরিস্থিতির চিত্র তুলে ধরছিল। ব্রিফিং কক্ষে পশ্চিম পাকিস্তানের মানচিত্রের স্থলে পূর্ব পাকিস্তানের অপারেশনাল মানচিত্র টাঙানো হয়েছিল।

পশ্চিম পাকিস্তান থেকে পাঠানো পূর্ববর্তী খবরে সকল ফ্রন্টে অগ্রগামী থাকার কথা বলা হলেও পরবর্তীতে বিপরীত ঘটনার অস্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছিল। প্রকৃতপক্ষে আজাদ

কাশ্মীরে ও শিয়ালকোট সেক্টরে ভারত তাৎপর্যপূর্ণ বিজয় অর্জন করেছিল। সাবমেরিন গাজীর ডুবে যাওয়ার খবরটি ছিল সবচেয়ে বেশি নৈরাশ্যজনক। আমরা আশা করছিলাম যে, এই সাবমেরিনটি অন্তত ভারতের বিমানবাহী জাহাজ বিক্রান্তকে ডুবিয়ে দেবে। আমরা যেহেতু নিজেদের কোনো সূত্র থেকে কিছুই জানতে পারছিলাম না, সেজন্য ধরে নিয়েছিলাম যে, ভারতের দাবিগুলি সত্য ছিল। ভারতীয়রা আরো বলিষ্ঠ হচ্ছিল এবং করাচীর তেল স্থাপনাগুলোর ওপর আক্রমণ চালিয়ে কয়েকটি অয়েল ট্যাংকে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল। ভারতের বিমান বাহিনী পাকিস্তানের আকাশকে মুক্ত পেয়েছিল বলে জানা যাচ্ছিল। কারণ পাকিস্তান বিমান বাহিনীকে এর কম্যান্ডার-ইন-চিপ এয়ার মার্শাল রহিম ছয়মাস স্থায়ী যুদ্ধের জন্য সংরক্ষিত অবস্থায় রেখেছিলেন। এটা কি বিশেষ কোনো রাজনৈতিক বিবেচনায় গৃহীত তাঁর নিজস্ব সিদ্ধান্ত ছিল, নাকি সিদ্ধান্ত নিয়েছিল জয়েন্ট অপারেশনাল এইচ কিউ ? সে কথা কেউ কোনোদিন জানতে পারবে না। পূর্ব পাকিস্তানের বাহিনীসমূহের মনে এর প্রতিক্রিয়া ছিল এই যে, এমন কি পশ্চিম পাকিস্তানেও আমরা হেরে যাচ্ছি।

পাকিস্তানের প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থাসমূহ, অপারেশনাল প্ল্যানস ও মোতায়েন কৌশল বাঙ্গালী অফিসারদের জানা ছিল। সেনাবাহিনী, বিমানবাহিনী ও নৌবাহিনীতে কর্মরত এই সব অফিসারের এক বিরাট অংশ ভারতে পালিয়ে গিয়েছিলেন এবং ভারতীয়দের কাছে চিহ্নিত মানচিত্রগুলো তুলে দিয়েছিলেন। বিশেষ করে মেজর মঞ্জুর, যিনি পরবর্তীকালে মেজর জেনারেল হিসেবে বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানকে হত্যা করেছেন, তিনি ১৯৭১ সালে শিয়ালকোট সেক্টরের ব্রিগেড মেজর ছিলেন। তিনি চিহ্নিত মানচিত্রসহ ভারতে চলে যান এবং এর ফলে শিয়ালকোটের অরক্ষিত অঞ্চলসমূহে ভারতীয়রা ঢুকে পড়তে সক্ষম হয়। একই পন্থায় বিমান বাহিনীর একজন বাঙালী অফিসার বিমান বাহিনীর পরিকল্পনা সম্পর্কে ভারতীয়দের জানিয়ে দিয়েছেন। এর ফলে ৩ ডিসেম্বর সন্ধ্যায় পি এ এফ আক্রমণ চালানোর আগেই ভারতীয়রা তাদের বিমানগুলোকে সরিয়ে ফেলতে সমর্থ হয়েছিল। যদি শত্রুর পরিকল্পনাসমূহ জানা যায় এবং তার বিন্যাসগুলোও গোপন না থাকে তাহলে সফল অপারেশন পরিচালনা করা খুব সহজ হয়ে ওঠে। পাকিস্তানের সশস্ত্র বাহিনীকে কঠিন অবস্থার সম্মুখিন হতে হয়েছিল। নিজের বাহিনীর ভেতরে কোনো দেশদ্রোহী না থাকলেও সর্বত্র শত্রুর এজেন্ট ও সমর্থক থাকায় যুদ্ধটি তাদের জন্য অত্যন্ত ভয়াবহ হিসেবে দেখা দিয়েছিল।

৬ ডিসেম্বর সকালের ব্রিফিং শেষে কোর এইচ কিউ থেকে ফেরার পর গভর্নর আমাকে ডেকে পাঠালেন । তিনি সামরিক পরিস্থিতি সম্পর্কে জানতে চাইলেন এবং বললেন, তিনি শুনেছেন যে, তাঁর নিজের শহরে চৌগাছা ও চুয়াডাঙ্গা ভারতীয়রা দখল করে নিয়েছে। এগুলো সীমান্তবর্তী শহর এবং আমি হ্যাঁ-সূচক জবাব দিয়ে তাঁকে বললাম, সবচেয়ে ভালো

যে ব্যক্তিটি তাঁকে সঠিক ও প্রামাণিক চিত্র দিতে পারবেন তিনি হলেন নিয়াজী। সুতরাং নিয়াজীর সঙ্গে গভর্নরের সাক্ষাতের আয়োজন করা হলো। চিফ সেক্রেটারি মুজাফফর হোসেনকে সঙ্গে নিয়ে গভর্নর কোর এইচ কিউতে গেলেন। জেনারেল নিয়াজী সেখানে তাদেরকে পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত করলেন। পরদিন অর্থাৎ ৭ ডিসেম্বর সকালে গভর্নর তাঁর মন্ত্রীদের জন্য বিভিন্ন এলাকায় সফরের আয়োজন করার জন্য আমাকে বললেন, যাতে মন্ত্রীরা গিয়ে জনগণের মনোবল বৃদ্ধি করতে পারেন। প্রকৃতপক্ষে এটা ছিল নিয়াজীর প্রস্তাব। গভর্নরকে তিনি আরো বলেছিলেন যে, অপারেশনগত দিক থেকে উদ্বিগ্ন হওয়ার কোনো কারণ নেই এবং পূর্ব পাকিস্তানকে রক্ষা করার জন্য আর্মি যথেষ্ট শক্তিশালী ছিল। পরিস্থিতি সম্পর্কে আমার অন্য রকম সন্দেহ ছিল। আমি তাই গভর্নরকে বললাম যে, মন্ত্রীদের জন্য ঢাকার বাইরে যাওয়ার কোনো উপায় নেই। সকল নদীর ফেরি পরিত্যক্ত হয়েছে, বিদ্রোহীরা নদীতে নৌকা ডুবিয়ে দিয়েছে এবং সড়কগুলোও নিরাপদ নয়। গভর্নর বললেন, তিনিও এ কথাগুলোই নিয়াজীকে বলেছেন। কিন্তু নিয়াজী মন্ত্রীদেরকে আর্মির হেলিকপ্টার ব্যবহার করার পরামর্শ দিয়েছেন। আমি প্রথম কোর এইচ কিউতে যোগাযোগ করলাম, তখন আমাকে জানানো হলো যে, কোনো হেলিকপ্টার দেয়া সম্ভব নয়ঃ ৬ টি হেলিকাপ্টারের প্রতিটিই অপারেশনের কাজে প্রতিদিন ব্যস্ত রয়েছে।

এতটাই ছিল আমাদের দুরবস্থা। এই বিদ্রোহ দমন ও যুদ্ধের জন্য সব মিলিয়ে মাত্র ৬ টি হেলিকাপ্টারের বিরাট শক্তি ছিল আমাদের! অথচ ভিয়েতনামে ইউএস-এর চার হাজার হেলিকপ্টার থাকার পরও তারা একে অপর্যাপ্ত বলেছিল। নিয়াজী শুধুই ধাপ্পা দিয়েছিলেন। আমি নিয়াজীকে গভর্নর হাউসে আমন্ত্রণ জানিয়ে নিয়ে আসার জন্য গভর্নরকে পরামর্শ দিলাম, যাতে নিয়াজী খোলাখুলিভাবে নিজের অবস্থা ব্যক্ত করতে পারেন। একটি আর্মি এইচ কিউতে, নিজের অধীনস্থদের সামনে একজন কম্যান্ডারকে সাহস দেখাতে হয় এবং কঠোরতা ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞা তুলে ধরতে হয়। আমি বললাম, এটা একটি প্রয়োজন এবং তা সেভাবেই করতে হয়। কিন্তু একটি বিচ্ছিন্ন প্রদেশের অসামরিক সরকারের প্রধান হিসেবে গভর্নর পরিস্থিতির তথ্যনির্ভর, সত্য ও বাস্তব অবস্থা জানার অধিকার রাখেন, যাতে তিনি করণীয় সম্পর্কে নিজের মতামত তৈরি করতে পারেন। নিয়াজী এলেন। আমি তাঁকে অভ্যর্থনা জানালাম এবং গভর্নরের কাছে নিয়ে গেলাম। সেখানে চিফ সেক্রেটারি মুজাফফর হোসেনও আমাদের সঙ্গে যোগ দিলেন। এটা তখন গভর্নর হাউসের এক প্রথা ছিল যে, কোনো অতিথি আসার কয়েক মিনিটের মধ্যেই অনেকটা স্বতশ্চলভাবে চা বা কফি চলে আসতো। গভর্নরের সামনে নিয়াজীকে বামে এবং মুজাফফরকে ডানে নিয়ে আমরা বসা মাত্র গভর্নর সাধারণ ভাষায় তার বক্তব্য শুরু করে বললেন, "যুদ্ধে যে কোনো কিছুই ঘটতে পারে। যখন দুটি পক্ষ যুদ্ধ করে তখন এক পক্ষ জেতে এবং অন্য পক্ষ হেরে যেতে পারে।

কোনো সময় একজন কম্যান্ডারকে আত্মসমর্পণ করতে হতে পারে এবং অন্য সময়... ।" গভর্নর এ প্রসঙ্গে আরো কিছু বলতে পারার আগে আমি একটি চিৎকার, একটি কান্না ও উচ্চ শব্দে ফোঁপানো শুনতে পেলাম। আমি দেখলাম নিয়াজী তাঁর দু'হাত দিয়ে মুখ ঢেকে রয়েছেন এবং কাঁদছেন। ঠিক সেই নাটকীয় মুহূর্তে চা নিয়ে পরিচারক প্রবেশ করল এবং যা ঘটেছিল তার সবই সে দেখল এবং শুনল। মুজাফফর উঠে দাঁড়ালেন, পরিচারকের হাত থেকে দ্রুততার সাথে চায়ের ট্রে নিলেন এবং খুব বিশ্রীভাবে তাকে ঠেলে বাইরে বের করে দিলেন। মিলিটারি সেক্রেটারি ও অন্যরা কারণ জিজ্ঞেস করায় পরিচারক বলেছিল, "সাহেবরা সবাই কান্নাকাটি করছেন।" এ সম্পর্কে পরে উত্তর দিতে গিয়ে আমি বলেছিলাম, "একজন মাত্র সাহেবই কাঁদছিলেন, আমাদের আর কেউ কাঁদিনি।" যা-ই হোক, অন্য সব খবরের মতো এই খবরটিও তাৎক্ষণিকভাবে ঢাকার সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল। যার মধ্য দিয়ে পাকিস্তান আর্মির ভয়াবহ ও মরিয়া অবস্থার কথা প্রকাশিত হয়ে পড়েছিল। এর ফলে মিত্রদের মধ্যে হতাশার সৃষ্টি হয়েছিল, অন্যদিকে মুক্তিবাহিনী হয়েছিল উৎসাহিত। অচিরেই নগরীতে তাদের তৎপরতা বৃদ্ধি পেয়েছিল।

নিয়াজী কি আত্মসমর্পণ শব্দটির ব্যবহার পর্যন্ত করতে পারেন নি বলে কেঁদেছিলেন নাকি তিনি একজন বিধ্বস্ত মানুষে পরিণত হয়ে গিয়েছিলেন বলে কেঁদেছিলেন, সে কথা তিনি বা তাঁর খোদাই জানেন। আমি এখানে শুধু যা দেখেছিলাম এবং সেটা যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল, তারই উল্লেখ করছি। যে ধারণা গভর্নর, চিফ সেক্রেটারি ও আমি পেয়েছিলাম, তা হলো সেদিন খুব দূরে নয় যখন পাকিস্তান আর্মি যুদ্ধক্ষেত্রে পরাজিত হবে। বিপর্যয় এড়ানোর উদ্দেশ্যে একটি রাজনৈতিক সমাধান খুঁজে বের করার জন্য আমাদের মাত্র কয়েকটি দিনই রয়েছে।

প্রেসিডেন্ট যাতে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারেন, সে উদ্দেশ্যে ঐ দিনের বিদ্যমান সঠিক পরিস্থিতি তাঁকে অবহিত করার ব্যাপারে বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছিল। নিয়াজী প্রকৃত চিত্র তুলে ধরছিলেন না। ফলে পশ্চিম পাকিস্তানের সংবাদপত্র ও জনগণ ৯ ডিসেম্বর পর্যন্তও জানতে পারেনি যে, শত্রুর হাতে ৭ ডিসেম্বরই যশোরের পতন ঘটেছিল। নিয়াজীর অনুমোদন নিয়ে যৌথভাবে একটি টেলেক্স বার্তা তৈরি করা হলো, যার বিষয়বস্তুর সঙ্গে নিয়াজী একমত হয়েছিলেন। তিনি অবশ্য বার্তাটি আমাকে গভর্নর হাউস থেকে পাঠাতে বলেছিলেন। সে সময় আমি বুঝতে পারিনি যে, নিয়াজী কোনো গোপন ফন্দি আঁটছিলেন এবং গভর্নর হাউস থেকে ৭ ডিসেম্বর প্রেসিডেন্টের কাছে প্রেরিত বার্তার বিষয়বস্তুর প্রতি নিজের সম্মতি থাকার ব্যাপারটি প্রয়োজনীয় সময়ে অস্বীকার করার জন্য তিনি বিকল্প পথ খোলা রাখছিলেন। বার্তায় পরিষ্কারভাবে সামরিক পরিস্থিতির বর্ণনা দেয়া হয় এবং জাতিসংঘে আমাদের অবলম্বিত কৌশলের ব্যাপারে সংশয় প্রকাশ করা হয়। আমাদের

প্রতিনিধি দল সাধারণ যুদ্ধ বিরতির এবং ভারতীয় বাহিনীর প্রত্যাহারের দাবি জানাচ্ছিল, তারা পূর্ব পাকিস্তান সমস্যার সমাধানের লক্ষ্যে কোনো রাজনৈতিক পদক্ষেপের ইঙ্গিত বা প্রতিশ্রুতি দিচ্ছিল না। সে সময় পৃথিবীর কেউই রাজনৈতিক প্রস্তাবনাবিহীন কোনো প্রস্তাব গ্রহণ করতে সম্মত হত না। গভর্নরের বার্তায় জাতি সংঘে রাজনৈতিক সমাধানের পরামর্শ দেয়ার এবং তার ভিত্তিতে একটি যুদ্ধ বিরতি প্রস্তাব পাস করানোর জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছিল।

ঘটনাপ্রবাহ তখন খুব দ্রুত ঘটতে শুরু করেছিল। ৭ ডিসেম্বর সন্ধ্যায় অ্যাডহক ৩৬ ডিভিশনের কম্যান্ডার মেজর জেনারেল রহিম চাঁদপুর থেকে তার বাহিনী ও এইচ কিউ প্রত্যাহার করার এবং ঢাকায় চলে আসার অনুমতি চাইলেন। রহিম ও তাঁর হেডকোয়ার্টারস চাঁদপুর পরিত্যাগ করলো। মেঘনা নদী পার হওয়ার সময় ভারতীয় বিমান খুব কার্যকরভাবে তাদের আক্রমণ করেছিল। নৌকাগুলো মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়, বেশ কিছু সংখ্যক সেনা ও অফিসার নিহত হয় এবং জেনারেল রহিমসহ অসংখ্যজন আহত হন। রহিমকে ঢাকা সিএমএইচ-এ ভর্তি করা হয়েছিল। আমি দু'বার তাঁকে দেখতে গিয়েছিলাম, কিন্তু দু'বারই তাঁকে ঘুমন্ত অবস্থায় পেয়েছি। খুব উঁচু মাত্রায় ঘুমের অষুধ দেয়া হয়েছিল।। শত্রু ঢাকার উল্টো দিকে মেঘনার তীরে পৌঁছে গিয়েছিল। বিভিন্ন ইউনিটের ফিরে আসা ছিটেফোঁটা অংশকে ঢাকাকে রক্ষার উদ্দেশ্যে এদিকের তীরে মোতায়েন করা হয়েছিল।

বগুড়া সেক্টরে ১৬ ডিভিশনের কম্যান্ডিং অফিসার জেনারেল নজরকে শত্রুর একটি দল অ্যামবুশ করেছিল। এরা হিলির প্রতিরক্ষাকে পাশ কাটিয়ে রংপুর-বগুড়ার প্রধান সড়কটি কেটে দিয়েছিল- যেমনটি আমি আশংকা করেছিলাম এবং আগেই বলেছিলাম। শত্রু বাহিনী গঠিত ছিল ট্যাংক ও পদাতিক সেনার সমন্বয়ে। পূর্ববর্তী রিপোর্টে জানানো হয়েছিল যে, জেনারেল নজর নিখোঁজ রয়েছেন এবং সেজন্য তাঁর স্থলে নতুন একজনকে নিযুক্তি দেয়া প্রয়োজন। ইপিআর-এর কম্যান্ডার মেজর জেনারেল জামশেদ এ ডিভিশনের দায়িত্ব গ্রহণ করার জন্য গিয়েছিলেন। আকাশের ওপর শত্রুর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ থাকায় তিনি রাতের অন্ধকারে হেলিকপ্টারে করে গিয়েছিলেন, কিন্তু অবতরণ এলাকা চিনতে পারেন নি। ফলে তিনি ফিরে এসেছিলেন। সৌভাগ্যক্রমে জেনারেল নজর শত্রুর হাতে ধরা পড়া এড়াতে পেরেছিলেন এবং নিরাপদে ও সুস্থ অবস্থায় তাঁর বাহিনীর সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন। জামশেদের অনুপস্থিতিকালে আমাকে ইপিআর কম্যান্ড করতে হয়েছিল, যেহেতু আমি তখন উপস্থিত ছিলাম। এ কথা জেনে আমি আতংকিত হয়ে পড়েছিলাম যে, ঢাকাকে রক্ষা করার জন্য তখন কোনো নিয়মিত ট্রুপস পাওয়া যাচ্ছিল না। বিষয়টি কোর এইচ কিউকে অবহিত করা ছাড়া আমি আর কিছু করতে পারিনি, কারণ ১৬ ডিভিশনের এলাকায় অবতরণ করার ব্যর্থ প্রচেষ্টা শেষে জামশেদ তাঁর কম্যান্ডে ফিরে এসেছিলেন। কোর এইচ কিউ অবশ্য

ঢাকার প্রতিরক্ষার জন্য কিছু ট্রুপস পাঠানোর জন্য অধীনস্থ ফর্মেশনগুলোকে বলেছিল। কিন্তু পরিবহনের মাধ্যমের অভাবে ট্রুপস সংগ্রহ করার উদ্দেশ্যটি বাস্তবায়িত করা যায়নি।

গভর্নরের ৭ ডিসেম্বরের বার্তার জবাবে ৮ ডিসেম্বর প্রেসিডেন্টের অফিস থেকে একটি টেলেক্স বার্তা পাওয়া গিয়েছিল। বার্তায় যুদ্ধ অব্যাহত রাখার জন্য গভর্নরকে নির্দেশ দিয়ে জানানো হয় যে, প্রেসিডেন্ট আন্তর্জাতিক পর্যায়ে যথাযথ পদক্ষেপ নিচ্ছেন। বার্তায় আরো জানানো হয় যে, পাকিস্তানের ঘটনা ও বক্তব্য উপস্থাপন করার জন্য একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন প্রতিনিধি দল নিউ ইয়র্কে ছুটে গেছেন। 'ছুটে গেছেন' কথাটি পরিস্থিতির ভয়াবহতা সম্পর্কে অনুধাবন করতে পারার ইঙ্গিত দিয়েছিল। অবশ্য জনাব ভুট্টোর নেতৃত্বাধীন প্রতিনিধি দলটি যত বেশি সম্ভব সময় নষ্ট করার বিষয়টিকে নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে শম্বুক গতিতে 'ছুটে' গিয়েছিলেন। নিয়াজীর পছন্দের বিকল্প সংকুচিত হয়ে পড়েছিল, ওদিকে রাজনৈতিক সমাধানও নাগালের মধ্যে ছিল না। প্রতিনিধি দলটি ৮ ডিসেম্বর সড়ক পথে কাবুল 'ছুটে' গিয়েছিলেন, যেন কাবুলের হাতে রাজনৈতিক সমাধানের চাবিকাঠি ছিল! তারপর তাঁরা সবচেয়ে আঁকাবাঁকা পথে ফ্রাংকফুর্ট, রোম ও লন্ডন হয়ে 'ছুটে' গিয়েছিলেন এবং নিউ ইয়র্ক পৌছেছিলেন ১০ তারিখে। যেখানে অন্যরা এ পথে ১২ ঘন্টার সুবিধা লাভ করে, সেখানে প্রতিনিধি দল নিউ ইয়র্ক পৌছাতে ৬০ ঘন্টা সময় লাগিয়েছিল। অথচ তারা ঐ দিনটিতেই সেখানে যেতে পারতেন। যে সময়ে তারা নিউ ইয়র্কে গিয়েছিলেন, ততক্ষণে ঘটনাপ্রবাহ অনেক দূর এগিয়ে গেছে। অপারেশনাল পরিস্থিতির মারাত্মক অবনতি ঘটেছিল, যা ব্যক্ত হয়েছিল জিএইচ কিউ-এর কাছে ৯ ডিসেম্বর জেনারেল নিয়াজীর নিম্নবর্ণিত সিগন্যালে ঃ

(১) সিগন্যাল নং জি-১২৫৫ তারিখ ৯ ডিসেম্বর ১৯৭১

এক (.) আকাশে শত্রুর আধিপত্যের কারণে রিগ্রুপিং বা পুনর্বিন্যাস করা সম্ভব নয় (.) জনগোষ্ঠী চরমভাবে শত্রুতাপূর্ণ হচ্ছে এবং শত্রুকে সর্বাত্মক সাহায্য যোগাচ্ছে (.) বিদ্রোহীদের সংহত অ্যামবুশের কারণে রাতের বেলা কোনো পদক্ষেপ নেয়া সম্ভব নয় (.) ফাঁকা স্থান ও পেছনের অংশ দিয়ে বিদ্রোহীরা শত্রুকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছে (.) বিমান ক্ষেত্র ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত, গত তিন দিনে কোনো মিশন হয়নি এবং ভবিষ্যতেও সম্ভব নয় (.) সকল জেটি, ফেরি ও নৌযান শত্রুর বিমান হামলায় ধ্বংস হয়ে গেছে (.) বিদ্রোহীরা সেতু ধ্বংস করেছে (.) এমন কি মুক্ত করাও অত্যন্ত কঠিন (.) দুই (.) শত্রুর বিমান আক্রমণে ভারি অস্ত্রশস্ত্র ও সরঞ্জাম ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত (.) ট্রুপস খুবই ভালোভাবে যুদ্ধ করছে কিন্তু চাপ ও ক্লান্তি এখন মারাত্মক হয়ে উঠছে (.) গত ২০ দিনে ঘুমোতে পারেনি (.) বিমান, আর্টিলারি ও ট্যাংকের বিরামহীন গোলা বর্ষণের মুখে রয়েছে। (.) তিন (.) পরিস্থিতি মারাত্মক সংকটপূর্ণ, আমরা যুদ্ধ চালিয়ে যাবো এবং আমাদের সর্বোচ্চ চেষ্টা

করবো (.) চার (.) নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি (.) এই রণাঙ্গনে শত্রুর বিমান ঘাঁটিগুলোর ওপর অবিলম্বে আঘাত হানা (.) সম্ভব হলে ঢাকার প্রতিরক্ষার জন্য বিমানযোগে ট্রুপসের রিইনফোর্সমেন্ট (.) বার্তা সমাপ্ত।

ওপরের সিগন্যালে যে পরিস্থিতি বর্ণিত হয়েছে তার চাইতে বেশি উদ্বেগজনক পরিস্থিতির কথা কল্পনা করাও সম্ভব নয়। মারাত্মক রকম সংকটপূর্ণ হিসেবে বর্ণনা করে পরিস্থিতির সত্যিকার চিত্র তুলে ধরার পর কম্যান্ডার এতে তার বাহিনীর পরিশ্রান্ত হওয়ার কথা জানিয়ে ঢাকার প্রতিরক্ষার জন্য বিমানযোগে রিইনফোর্সমেন্ট পাঠানোর অনুরোধ করেছেন। তাঁর এই অনুরোধের কথাটি ব্যাপক প্রচারণা পেয়েছিল এবং পরবর্তীকালে যখন বিমানযোগে ভারতীয় ট্রুপস টাঙ্গাইল অঞ্চলে অবতরণ করছিল তখন পাকিস্তান আর্মি তাদের চীনা ট্রুপস হিসেবে ভুল করে বসে এবং তাদেরকে স্বাগত জানাতে গিয়ে বন্দীত্ব বরণ করে।

(২) সিগন্যাল নং জি-১২৬৫ তারিখ ১০ ডিসেম্বর ১৯৭১ এক (.) আলফা (.) এই রণাঙ্গনের প্রতিটি সেক্টরে এই কম্যান্ডের সকল ফর্মেশন প্রচন্ড চাপের মধ্যে (.) ব্রাভো. সকল ফর্মেশন / ট্রুপস-এর বেশির ভাগ সেই সব দুর্গে বিচ্ছিন্ন অবস্থায়, যেগুলোকে প্রাথমিক পর্যায়ে শত্রু অবরোধ করেছিল, সেগুলো এখন প্রচণ্ড আক্রমণের মধ্যে এবং শত্রুর সর্বব্যাপী শক্তির কারণে ধ্বংস হয়ে যেতে পারে (.) চার্লি (.) শত্রু আকাশে আধিপত্য করছে এবং নিজেদের ইচ্ছানুসারে ও শক্তি সংহত করে তারা আমাদের সকল যানবাহন ধ্বংস করে দিতে পারে। (.) ডেল্টা (.) স্থানীয় জনগণ ও বিদ্রোহীরা কেবল শত্রুতাপূর্ণই নয়, সমগ্র অঞ্চলে আমাদের ট্রুপসকে সর্বাত্মকভাবে ধ্বংস করার জন্যও সক্রিয় (.) ইকো (.) সড়ক / নদী পথে সকল যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন (.) দুই (.) নিজেদের ট্রুপসকে শেষ সৈন্য থাকা পর্যন্ত যুদ্ধ চালানোর আদেশ জারি করা হয়েছে, কিন্তু সেটা বেশিক্ষণ সম্ভব নাও হতে পারে। কারণ যুদ্ধ খুব দীর্ঘস্থায়ী হচ্ছে এবং ট্রুপস সম্পূর্ণরূপে পরিশ্রান্ত (.) যাই হোক, যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া কঠিন হয়ে পড়বে যখন আগামী কয়েক দিনের মধ্যে অস্ত্রশস্ত্র / গোলাবারুদ নিঃশেষিত হয়ে যাবে (.) যুদ্ধে ব্যাপক হারে ব্যয় হওয়া ছাড়াও শত্রু/বিদ্রোহীদের অ্যাকশনের কারণে সরবরাহ / গোলাবারুদ ধ্বংস হয়ে চলেছে (.) তিন (.) অবগতি ও উপদেশের জন্য পেশ করা হলো।

এই বার্তাটি ছিল নিয়াজীর পরাজয় মেনে নেয়ার পরিষ্কার ইঙ্গিত। তিনি উল্লেখ করেছেন যে, আর কয়েকদিনের বেশি তাঁর ট্রুপসের পক্ষে যুদ্ধ চালানো সম্ভব নাও হতে পারে। সামরিকভাবে যখন এ ধরনের পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়, তখন রাজনীতিকদের উচিত এর ক্ষতিকর প্রভাবকে যতটা সম্ভব কমিয়ে আনা। যত ওপরে একজন যান, তাঁর তত বেশি দূরদর্শী হওয়া উচিত। সর্বোচ্চ নেতৃত্বের উচিত ছিল ভবিষ্যত দেখতে সক্ষম হওয়া। গভর্নর বুঝেছিলেন যে, ঐ পরিস্থিতিতে জরুরি ভিত্তিতে রাজনৈতিক পদক্ষেপ নেয়া দরকার ছিল, না

হলে পূর্বাঞ্চলীয় কম্যান্ডকে লজ্জা ও অবমাননার কবলে পড়তে হবে। নিরাপত্তা পরিষদে আলোচনা চলছিল। আমাদের প্রতিনিধির বক্তৃতাগুলো থেকে মনে হয়েছে, কোনো রকম রাজনৈতিক সমাধানের প্রস্তাব না দিয়ে আমরা কেবল সাধারণ যুদ্ধ বিরতির জন্য জাতি সংঘের কাছে দাবি জানাচ্ছিলাম। সে সময় বেশির ভাগ রাষ্ট্রেরই মত ছিল যে, বাঙ্গালীদের বৃহত্তর স্বায়ত্তশাসন দেয়া হোক অথবা এমন কিছু রাজনৈতিক পথ খুলে দেয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়া হোক, যাতে যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটানো যায়। নিরাপত্তা পরিষদকে দিয়ে একটি যুদ্ধ বিরতির প্রস্তাব পাশ করাতে হলে, আমাদের মতে একটি রাজনৈতিক সমাধানের প্রস্তাব দেয়া অত্যাবশ্যক ছিল। সে কারণে ৯ ডিসেম্বর প্রেরিত এক সিগন্যালে প্রেসিডেন্টকে অনুরোধ জানিয়ে গভর্নর বলেছিলেন, "আশু যুদ্ধ বিরতি এবং রাজনৈতিক মীমাংসা বিবেচনার জন্য আরো একবার আপনার কাছে আবেদন জানাচ্ছি।"

এই সিগন্যালের উত্তরে প্রেসিডেন্ট নিম্নবর্ণিত সিগন্যালটি পাঠিয়েছিলেন ঃ ফ্লাশ তারিখ ০৯২৩০০ (৯ ডিসেম্বর রাত ১১ টা)

প্রেরক ঃ এইচ কিউ সি এম এল এ

প্রতি ঃ গভর্নর পূর্ব পাকিস্তান ও পূর্বাঞ্চলীয় কম্যান্ড

টপ সিক্রেট (.) জি-০০০১ (.) প্রেসিডেন্টের কাছ থেকে গভর্নরের প্রতি পুনরাবৃত্তি পূর্বাঞ্চলীয় কম্যান্ডের প্রতি (.) আপনার ৯ ডিসেম্বর ফ্ল্যাশ বার্তা এ-৪৬৬০ পেয়েছি এবং পুরোপুরি বুঝতে পেরেছি (.) আমার কাছে পেশকৃত আপনার প্রস্তাবসমূহের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্য আপনাকে আমার অনুমতি দেয়া হল (.) আন্তর্জাতিক পর্যায়ে আমি সকল পদক্ষেপ নিয়েছি এবং এখনো নিয়ে চলেছি। কিন্তু আমাদের উভয়ের বিছিন্ন অবস্থার কারণে পূর্ব পাকিস্তানের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়ার বিষয়টি আমি সম্পূর্ণরূপে আপনার শুভ বুদ্ধি ও বিবেচনার ওপর ছেড়ে দিচ্ছি (.) আপনি যে সিদ্ধান্তই নেবেন তা-ই আমি অনুমোদন করবো এবং আমি একই সাথে জেনালের নিয়াজীকে নির্দেশ দিচ্ছি যাতে তিনি আপনার সিদ্ধান্ত মেনে নেন এবং সেই অনুসারে সবকিছুর আয়োজন করেন। (.) আপনার উল্লেখকৃত অসামরিক মানুষের অর্থহীন ধ্বংস বন্ধ করার, বিশেষ করে আমাদের সশস্ত্র বাহিনীসমূহকে রক্ষা করার জন্য যে কোনো প্রচেষ্টার সিদ্ধান্ত নিয়ে আপনি অগ্রসর হতে পারেন এবং আমাদের প্রতিপক্ষের সঙ্গে প্রয়োজনীয় সকল রাজনৈতিক পন্থায় সশস্ত্র বাহিনীসমূহের নিরাপত্তা নিশ্চিত করুন।

পূর্ব পাকিস্তানের ব্যাপারে নিজের শুভ বুদ্ধি অনুসারে যে কোনো সিদ্ধান্ত নেয়ার কর্তৃত্ব প্রেসিডেন্ট পরিষ্কারভাবে এবং দ্ব্যর্থহীন ভাষায় গভর্নরকে দিয়েছিলেন। পূর্ব পাকিস্তানের ভেতরে না বলে পূর্ব পাকিস্তানের ব্যাপারে বলার মধ্য দিয়ে গভর্নরকে ব্যাপকতর ক্ষমতা দেয়া হয়েছিল। অন্য কয়েকটি বিশেষ শব্দ সমষ্টিও তাৎপর্যপূর্ণ ছিলঃ "অর্থহীন ধ্বংস থেকে

অসামরিক নাগরিকদের রক্ষা করুন এবং রাজনৈতিক পন্থায় সশস্ত্র বাহিনীসমূহের নিরাপত্তা নিশ্চিত করুন।" যুদ্ধ বিরতির অনুরোধসহ জাতি সংঘে একটি রাজনৈতিক সমাধান উপস্থাপনার মাধ্যেমেই শুধু এ দুটি উদ্দেশ্য অর্জন করা সম্ভব ছিল। কিন্তু কতিপয় অজানা ও সন্দেহজনক কারণে জাতি সংঘে রাজনৈতিক সমাধানের প্রস্তাব পেশ করতে এবং ঢাকায় হস্তক্ষেপ করতে পাকিস্তান সরকার অনিচ্ছুক ছিল। এর প্রমাণ রয়েছে নিচের বাক্যে, "আপনি অগ্রসর হতে পারেন এবং আমাদের প্রতিপক্ষের সঙ্গে প্রয়োজনীয় সকল রাজনৈতিক পন্থায় সশস্ত্র বাহিনীসমূহের নিরাপত্তা নিশ্চিত করুন।" এ কথার অর্থ ছিল, লজ্জা এড়ানোর উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় সরকার চাচ্ছিল যে, গভর্নর জাতি সংঘে প্রস্তাবটি পেশ করুন।

সশস্ত্র বাহিনীসমূহের নিরাপত্তা বিধানের জন্য ইচ্ছা ব্যক্ত করার মধ্যেই আত্মসমর্পণ করার পরামর্শের বীজ নিহিত ছিল। আমার মতে সশস্ত্র বাহিনী তখনই নিরাপদ থাকে যখন তারা যুদ্ধ করে কিংবা যুদ্ধ বিরতির মাধ্যমে যুদ্ধের অবসান ঘটানো হয় অথবা তারা আত্মসমর্পণ করে। নিয়াজীর যুদ্ধ করার ক্ষমতা সে সময়ে সর্বনিম্ন পর্যায়ে চলে এসেছিল, যার ইঙ্গিত রয়েছে তাঁর পাঠানো ওপরের দুটি এস ও এস সিগন্যালে। তিনি ' যা-ই হোক, আগামী কয়েকদিনের মধ্যে যখন অস্ত্রশস্ত্র/গোলাবারুদ নিঃশেষিত হয়ে যাবে তখন যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া কঠিন হয়ে পড়বে' কথাগুলোর মধ্য দিয়ে পরিষ্কারভাবে তার উপসংহার টেনেছিলেন। পরবর্তী বিকল্পটি ছিল জাতি সংঘের মাধ্যমে যুদ্ধ বিরতি চাওয়া এবং অর্জন করা। এটা একজন পেতে পারত কেবল রাজনৈতিক সমাধানের প্রস্তাব দেয়ার মাধ্যমে। জাতি সংঘে অনুষ্ঠিত বিতর্কের প্রেক্ষিতে আমাদের মূল্যায়ন ছিল রাজনৈতিক সমাধানের প্রস্তাব দেয়ার ব্যপারে পাকিস্তানের প্রতিনিধি অনীহ ছিলেন। স্পষ্টত কেউ কেউ তখন তাদের বিকল্প তথা আত্মসমর্পণের বিষয়টি নিয়াজীর ওপর চাপিয়ে দিচ্ছিলেন।

একই যোগে জেনারেল নিয়াজীর কাছে সি ও এস আর্মির একটি অনেক বেশি সুনির্দিষ্ট সিগন্যাল পাঠানো হয়েছিল। সেটা নিচে দেয়া হলো ঃ

প্রেরক ঃ পাক আর্মি — ডিটিজি ঃ ১০০৯১০ ফ্ল্যাশ
প্রতি ঃ পূর্বাঞ্চলীয় কম্যান্ড — টপ সিক্রেট
জি- ০২৩৭

সি ও এস আর্মির কাছ থেকে কম্যান্ডারের জন্য (.) আপনার প্রতি অনুলিপিসহ গভর্নরের প্রতি প্রেরিত প্রেসিডেন্টের বার্তা দ্রষ্টব্য (.) আপনার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত নেয়ার কর্তৃত্ব প্রেসিডেন্ট গভর্নরকে দিয়েছেন (.) যেহেতু পরিস্থিতির ভয়াবহতার কারণে সঠিকভাবে কোনো সিগন্যাল পৌছানো সম্ভব হচ্ছে না, সেজন্য অকুস্থলে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের কর্তৃত্ব আপনাকে দেয়া হলো (.) এটা অবশ্য এখন পরিষ্কার এবং কেবল সময়ের

ব্যাপারে যে জনবল ও সামগ্রীর শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে এবং বিদ্রোহীদের সক্রিয় সহযোগিতায় শত্রু পূর্ব পাকিস্তানের ওপর সম্পূর্ণরূপে আধিপত্য করবে (.) ইতিমধ্যে অসামরিক জনগোষ্ঠীর বিপুল ক্ষতি সাধন করা হয়েছে এবং আর্মিরও প্রচুর প্রাণহানি ঘটছে (.) আপনাকে যদি পারেন তাহলে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার মূল্য পরিমাপ করতে হবে এবং ভালোভাবে এর মূল্যায়ন করতে হবে, এর ওপর ভিত্তি করে আপনি গভর্নরকে আপনার অকপট পরামর্শ দেবেন এবং তিনি প্রেসিডেন্টের দেয়া কর্তৃত্বের বলে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দেবেন (.) যখনই তেমনটি প্রয়োজন মনে করবেন তখনই যত বেশি সম্ভব সামরিক সরঞ্জাম ধ্বংস করে দেয়ার চেষ্টা করবেন যাতে সেগুলো শত্রুর হাতে না পড়ে (.) আমাকে অবহিত রাখবেন (.) আল্লাহ আপনার মঙ্গল করুন।

নিচের বাক্যগুলো লক্ষ্য করুন ঃ

(১) বিদ্রোহীরা পূর্ব পাকিস্তানে সম্পূর্ণরূপে আধিপত্য করবে।
(২) প্রেসিডেন্টের দেয়া কর্তৃত্বের বলে গভর্নর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দেবেন।
(৩) একটি অব্যক্ত, পরামর্শমূলক এবং ধূর্ত বাক্যের সমন্বয়ে শব্দসমষ্টি ঃ 'যখনই তেমনটি (?) প্রয়োজন মনে করবেন তখনই যত বেশি সম্ভব সামরিক সরঞ্জাম ধ্বংস করে দেয়ার চেষ্টা করবেন যাতে সেগুলো শত্রুর হাতে না পড়ে।'

মন্তব্য ঃ 'তেমনটি'-কে অস্পষ্ট রাখা হয়েছিল। কখন একজন সরঞ্জাম ধ্বংস করে? উত্তর হলো, যখন একজন আত্মসমর্পণ করে। সুতরাং 'তেমনটি' শব্দের অর্থ হল আত্মসমর্পণ। জি এইচ কিউ পরামর্শ দিচ্ছিল যে, গভর্নরের অনুমোদন নিয়ে আপনি আত্মসমর্পণ করতে পারেন। এটা ছিল ১০ ডিসেম্বরের ঘটনা।

ওপরের দুটি সিগন্যালই ছিল কর্তৃত্বপূর্ণ শব্দে প্রণীত। সমগ্র উদ্দেশ্য ছিল আত্মসমর্পণের দায়দায়িত্ব পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর ও কম্যান্ডারের ওপর ছুঁড়ে দেয়া যাতে যদি কখনো সময় ও প্রয়োজন দেখা দেয় তাহলে পূর্ব পাকিস্তানের পতনের জন্য গভর্নর ও কম্যান্ডারকে দোষারোপ করে ইসলামাবাদের শাসকরা পশ্চিম পাকিস্তানে নিজেদের শাসন চালিয়ে যেতে পারেন।

অসামরিক দিক থেকে প্রচণ্ড চাপের মুখে গভর্নর যুদ্ধের একটি সম্মানজনক সমাপ্তি চাচ্ছিলেন। যে সকল স্থানে ভারতীয় আর্মি ও মুক্তিবাহিনী অব্যাহতভাবে ধ্বংসাত্মক তৎপরতা চালাচ্ছিল, সে সকল এলাকার পরিস্থিতি পাকিস্তানের বন্ধুদের জন্য কল্পনাতীত রকম ভয়াবহ ছিল। বিশিষ্ট বাঙ্গালীদের মধ্যে যারা পাকিস্তানকে সমর্থন দিয়েছিলেন, তাদেরকে জবাই করা হচ্ছিল এবং তাদের সম্পদ লুণ্ঠিত হচ্ছিল। বিহারীদের লুকানোর মতো কোনো জায়গা ছিল না। তাদেরকে পাই কুকুরের মতো তাড়িয়ে বেড়ানো হচ্ছিল এবং নির্দয়ভাবে হত্যা করা হচ্ছিল। আরো বেশি সময় দেয়া হলে এই নৃশংস হত্যাকাণ্ড আরো বিস্তৃত হয়ে পড়ত। গভর্নর ভগ্নহৃদয় ও বিষাদগ্রস্ত হয়ে পড়লেও তার মন তখনো কাজ করছিল। তিনি ভাবলেন,

আত্মপমর্পণের পদক্ষেপ নেয়ার পরিবর্তে যুদ্ধ বিরতির জন্য চেষ্টা করে দেখা যাক না কেন। যেহেতু একটি রাজনৈতিক সমঝোতার দায়িত্ব গভর্নরের ওপর অর্পণ করা হয়েছিল, সে কারণে জাতিসংঘের কাছে পাঠানোর উদ্দেশ্যে রচিত নিচের বার্তাটি অনুমোদনের জন্য তিনি প্রেসিডেন্টের কাছে পাঠিয়েছিলেন ঃ

প্রেরক ঃ গভর্নর পূর্ব পাকিস্তান — টপ সিক্রেট
প্রতি ঃ এইচ কিউ সি এম এল এ — এ-৭১০৭

পাকিস্তানের প্রেসিডেন্টের জন্য (.) সূত্র আপনার ০৯২৩০০ ডিসেম্বরের জি-০০০১ (.) যেহেতু চূড়ান্ত ও নিয়তিনির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত গ্রহণের দায়িত্ব আমাকে দেয়া হয়েছে, সে কারণে আপনার অনুমোদন পাওয়ার পর নিচের নোটটি আমি সহকারি সেক্রেটারি জেনালের মিঃ পল মার্ক হেনরির কাছে হস্তান্তর করতে চাই (.) নোটের শুরু হল (.) পূর্ব পাকিস্তানের ভূমিতে সর্বাত্মক যুদ্ধে নিজেদের জড়িয়ে ফেলার ইচ্ছা পাকিস্তানের সশস্ত্র বাহিনীর কখনো ছিল না (.) যাহোক এমন এক পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল যা সশস্ত্র বাহিনীকে আত্মরক্ষামূলক অ্যাকশন গ্রহণে বাধ্য করে (.) পাকিস্তান সরকারের সব সময় ইচ্ছা ছিল পূর্ব পাকিস্তানের সমস্যাগুলোর রাজনৈতিক পন্থায় সমধান করা, যার জন্য আলাপ-আলোচনা চলছিল। (.) প্রচণ্ড বাধার বিরুদ্ধে সশস্ত্র বাহিনী বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করেছে এবং এখনো যুদ্ধ চালিয়ে যেতে পারে, কিন্তু আরো রক্তপাত ও নির্দোষ জীবনের ক্ষয়ক্ষতি এড়ানোর উদ্দেশ্যে আমি নিম্নোক্ত প্রস্তাবগুলো পেশ করছি (.) যেহেতু রাজনৈতিক কারণে সংঘাতের সূচনা হয়েছে, সেহেতু এর সামাপ্তি অবশ্যই রাজনৈতিক সমাধানের মাধ্যমে হতে হবে (.) সে কারণে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্টের কাছে কর্তৃত্বপ্রাপ্ত হয়ে আমি এতদ্বারা শান্তিপূর্ণভাবে ঢাকায় সরকার গঠনের আয়োজন করার জন্য পূর্ব পাকিস্তানের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি (.) এই প্রস্তাব দানকালে এ কথা বলা আমার কর্তব্য বলে মনে করি যে, পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ একই সাথে তাদের ভূমি থেকে ভারতীয় বাহিনীর আশু প্রত্যাহারও দাবি করবে (.) সুতরাং শান্তিপূর্ণ ক্ষমতা হস্তান্তরের আয়োজন করার জন্য আমি জাতি সংঘের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি এবং নিচের আয়োজনগুলোর জন্য অনুরোধ করছি (.) এক (.) আশু যুদ্ধ বিরতি (.) দুই (.) সম্মানের সাথে পাকিস্তানের সশস্ত্র বাহিনীর পশ্চিম পাকিস্তানে প্রত্যাবাসন (.) তিন (.) পশ্চিম পাকিস্তানে ফিরে যেতে ইচ্ছুক পশ্চিম পাকিস্তানের সকল পার্সোনেলের প্রত্যাবাসন (.) চার (.) ১৯৪৭ সাল থেকে পূর্ব পাকিস্তানে বসবাসরত সকল মানুষের নিরাপত্তা (.) পাঁচ (.) পূর্ব পাকিস্তানে কোনো ব্যক্তির ওপর প্রতিশোধমূলক আচরণ না করার নিশ্চয়তা (.) এই প্রস্তাব পেশকালে আমি এ কথা পরিষ্কার করতে চাই যে, শান্তিপূর্ণ ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য এটি একটি সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব (.) সশস্ত্র বাহিনীর আত্মসমর্পণের প্রশ্নটি বিবেচিত হবে না ও উঠবে না এবং যদি এই প্রস্তাব গৃহীত না

হয় তাহলে সশস্ত্র বাহিনী শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যাবে (.) নোট সমাপ্ত (.) জেনারেল নিয়াজীর সঙ্গে পরামর্শ করা হয়েছে এবং তিনি নিজেকে আপনার কমান্ডে ন্যস্ত করেছেন।

নিম্নোক্ত বিষয়গুলো লক্ষ্য করার জন্য পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে ঃ

(ক) সংঘাতকে অবশ্যই রাজনৈতিক সমাধানের মাধ্যমে সমাপ্ত করার প্রস্তাব।

(খ) পূর্ব পাকিস্তানের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দিয়ে ঢাকায় শান্তিপূর্ণভাবে সরকার গঠন করার রাজনৈতিক সমাধানের প্রস্তাব।

(গ) সশস্ত্র বাহিনী আত্মসমর্পণ করবে না।

রাতে গভর্নর দুটি সিগন্যাল পেয়েছিলেন। একটি প্রেসিডেন্টের কাছ থেকে এবং অন্যটি সি ও এ এস জেনারেল হামিদের কাছ থেকে এসেছিল। পশ্চিম পাকিস্তানের অন্য সকল সেক্রেটারিসহ চিফ সেক্রেটারি জনাব মুজাফফর হোসেন সে সময় গভর্নর হাউসে বাস করছিলেন। মুজাফফর হোসেনকে সঙ্গে নিয়ে ১০ ডিসেম্বর সকালে গভর্নর আমার গভর্নর হাউসের অফিসে এলেন এবং ওপরে উল্লিখিত বার্তাটি আমাকে দেখালেন, যেটা গভর্নর প্রেসিডেন্টের কাছে পাঠাতে চেয়েছিলেন। মুজাফফর এর খসড়া তৈরি করেছিলেন। গভর্নর আমাকে মুজাফফরকে নিয়াজীর কাছে বার্তাটি নিয়ে যেতে এবং তাঁর অনুমোদন আনতে বললেন। ঢাকার ওপর ভারতীয় বিমান বাহিনী তখন খুবই সক্রিয় থাকায় রাস্তায় চলাচল করা বিপজ্জনক হয়ে পড়েছিল। প্রচুর সংখ্যায় মুক্তিবাহিনীর গেরিলাও নগরীতে তৎপর ছিল। এ সবের মধ্য দিয়ে সাত মাইল পথ পেরিয়ে আমাদেরকে কোর এইচ কিউ-তে পৌঁছাতে হয়েছিল। আমাদের কোনো সামরিক প্রহরা ছিল না। এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় আড়াল নিয়ে আমাদের পথ করে নিতে হয়েছিল। আমরা কোর এইচ কিউতে পৌঁছলাম এবং সকল গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্বকেই জেনারেল নিয়াজীর সঙ্গে উপস্থিত পেয়ে গেলাম। নিয়াজী ততদিনে ব্রিফিং সেশন অনুষ্ঠান করা বাদ দিয়েছেন, পরিবর্তে সেখানে হচ্ছিল পুনর্মিলনী সভা। উপস্থিত ছিলেন অ্যাডমিরাল শরীফ, জেনারেল জামশেদ এবং সি ও এস কোর ব্রিগেডিয়ার বকর সিদ্দিকী। জনাব মুজাফফর খসড়া বার্তাটি জেনারেল নিয়াজীর হাতে দিলেন, তিনি ওটা সকলকে পড়ে শোনালেন। তারপর তিনি মতামত জানতে চাইলেন। জেনারেল জামশেদ ও অ্যাডমিরাল শরীফ বার্তায় দেয়া প্রস্তাব সমর্থন করে বললেন, "এছাড়া আমাদের আর কোনো বিকল্প নেই।" নিয়াজী তখন বললেন, "আমার কোন্ ক্ষমতার কারণে আপনারা আমার অনুমোদন চাচ্ছেন ?" আমি বললাম, "পূর্ব পাকিস্তান রণাঙ্গনের কম্যান্ডার হিসেবে আপনার ক্ষমতার কারণে।" তিনি বললেন, "ঠিক আছে, আপনারা আমার অনুমোদন পেয়েছেন।"

আমরা দু'জনই আলাদাভাবে গভর্নর হাউসের উদ্দেশে রওয়ানা হলাম। মুজাফফরের অন্য কোথাও যাওয়ার প্রয়োজন ছিল। আমি নিয়াজীর অনুমোদিত বার্তাটিসহ গভর্নর হাউসে

ফিরে এলাম। দেখলাম গভর্নর এবং জাতি সংঘের প্রতিনিধ মিঃ পল মার্ক হেনরি আমাদের জন্য অপেক্ষা করছেন। আমি গভর্নরকে বললাম, প্রেসিডেন্টের কাছে পাঠানোর জন্য বার্তাটি জেনারেল নিয়াজী অনুমোদন করেছেন। গভর্নর বার্তার একটি অনুলিপি মিঃ পল হেনরিকে দিতে বললেন। আমি তা স্বাক্ষর দিয়ে তাঁকে দিলাম। আমি স্বাক্ষর দিয়েছিলাম, কারণ বার্তাটি আর্মি কমিউনিকেশন সিস্টেমের মাধ্যমে প্রেরণ করতে হবে এবং এজন্য ওতে একজন আর্মি অফিসারের স্বাক্ষরের প্রয়োজন। গভর্নর হাউসে ঐ সময়ে আমিই একমাত্র আর্মি স্টাফ অফিসার উপস্থিত ছিলাম, সুতরাং আমি স্বাক্ষর দিয়েছিলাম। একজন স্টাফ অফিসারের স্বাক্ষর দেয়ার অর্থ এটা নয় যে, বার্তাটি তিনি পাঠিয়েছেন। বার্তাটি প্রেসিডেন্টের কাছে গভর্নর পাঠাচ্ছিলেন, আমি পাঠাই নি। কিন্তু আমি প্রস্তাবগুলোর সঙ্গে একমত ছিলাম। কারণ এগুলো গ্রহণ করা হলে আমরা আত্মসমর্পণের অবমাননা থেকে বেঁচে যেতে পারতাম।

ঢাকায় জীবন একেবারে থেমে গিয়েছিল। নগরীর ভেতরে মুক্তিবাহিনীর তৎপরতা মোকাবিলার উদ্দেশ্যে কার্ফিউ লাগানো হয়েছিল। সকল সড়কেই সড়ক প্রতিবন্ধক নির্মাণ করা হয়েছিল, কিন্তু তারপরও গেরিলাদের অনুপ্রবেশ অব্যাহত ছিল। সরকারি কোনো কার্যক্রম তখন ছিল না। কারণ সকল পর্যায়ের বাঙালী পার্সোনেল পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠিত সরকারের প্রতিরোধে জড়িত হয়ে পড়েছিল- কেউ কেউ প্রকাশ্যে, কেউ কেউ লুকিয়ে লুকিয়ে। অমন একটি পরিস্থিতিতে আত্মসমর্পণ এড়ানোকে নিশ্চিত করার জন্য একটিই মাত্র সম্মানজনক পথ খোলা ছিল, যার ইঙ্গিত গভর্নরের বার্তায় দেয়া হয়েছিল।

অপারেশনের সারসংক্ষেপ ও বিশ্লেষণ

খুলনা-যশোর সেক্টরে ব্রিগেডিয়ার মনযুর ও ব্রিগেডিয়ার হায়াতের অধীনস্থ দুটি ব্রিগেডসহ ৯ ডিভিশনের কম্যান্ডার মেজর জেনারেল আনসারী তাঁর বাহিনীকে বেশ অগ্রবর্তী অবস্থানে মোতায়েন করেছিলেন। কিছুটা পেছনের অবস্থানে সরে আসার অনুমতি চেয়ে তাঁর পাঠানো আবেদনকে নিয়ে কোর এইচ-কিউ-তে হাসি-ঠাট্টা করা হয় এবং তাকে পাশ কাটিয়ে যাওয়া হয়।

২০ নভেম্বর ঃ ভারতীয়রা পাকিস্তানের প্রায় ৩ মাইল অভ্যন্তরে গরীবপুর গ্রাম দখল করে। স্বল্প সংখ্যক ট্যাংকের সমর্থন নিয়ে ৬ পাঞ্জাব পাল্টা আক্রমণ চালায়। আক্রমণ প্রতিহত করা হয়। বেশির ভাগ ট্যাংক ধ্বংস হয়ে যায়। নিম্নমানের যুদ্ধ বিমান হওয়ায় আক্রমণের সমর্থনে আগত পি এ এফ-এর দুটি বিমান ধ্বংস হয়।

২১/২২ নভেম্বর ঃ ২১/২২ রাতে নিজেদের ৩৮ এফ এফ চৌগাছা থেকে সরে আসে।

৪ ডিসেম্বর সর্বাত্মক যুদ্ধ শুরু হয়।

যশোর সাব-সেক্টর ঃ ৬ ডিসেম্বর সকাল প্রায় দশটায় ট্যাংক ও বিমানের সমর্থন নিয়ে শত্রুর একটি ব্রিগেড ৬ পাঞ্জাবকে আক্রমণ করে। বিকেল ৪ টায় ৬ পাঞ্জাব উত্তর পার্শ্বে একটি ফাটলের কথা ব্রিগেড এইচ কিউ-কে অবহিত করে। পরিকল্পনা অনুসারে মধুমতি নদীতে পশ্চাদপসরণ করার পরিবর্তে ব্রিগেডিয়ার হায়াতের অধীনস্থ ব্রিগেড যশোরকে অরক্ষিত রেখে খুলনার দিকে সরে আসে। স্বল্প সংখ্যক সৈনিক নিয়ে একজন ক্যাপ্টেন ২৪ ঘণ্টা যুদ্ধ চালিয়ে যান, যশোরের পতন ঘটে ৭ ডিসেম্বর। রেডিও পাকিস্তান সংবাদটি জানায় ৯ ডিসেম্বর।

ঝিনাইদহ সাব-সেক্টরঃ দুটি ব্যাটেলিয়ান নিয়ে গঠিত ব্রিগেডিয়ার মনযুরের অধীনস্থ ৫৭ ব্রিগেডকে ২৪ নভেম্বর ৪র্থ ভারতীয় মাউন্টেন ডিভিশন আক্রমণ করে। ২৭ নভেম্বর জীবননগরের পতন ঘটে। শত্রু দর্শনাকে পরিষ্কার করতে পারেনি, কিন্তু বিরাট ব্যবধানের সৃষ্টি হয় এবং মুক্তিবাহিনীর সহযোগিতায় শত্রু চৌগাছা-ঝিনাইদহ সড়কের পেছনের অংশে

সড়ক প্রতিবন্ধক তৈরি করে। ৩৭ ব্রিগেড এই প্রতিবন্ধক অপসারণ করতে পারেনি এবং সে কারণে এর বড় অংশটিকে তার অপারেশন এলাকা থেকে উত্তর দিকে সরে আসতে হয়। এই অংশটি যমুনা পার হওয়ার পর থেকে রাজশাহীর পূর্ব দিকে ১৬ ডিভিশনের এলাকায় প্রবেশ করে। অবশিষ্টরা বিশৃংখলভাবে মধুমতির পেছন দিকে পশ্চাদপসরণ করে, যেখানে ইতিমোধ্যেই যশোর থেকে ৯ ডিভিশন এইচ কিউ চলে এসেছিল।

অর্থাৎ ৬/৭ ডিসেম্বরের মধ্যেই একটি যোদ্ধা ফর্মেশন হিসেবে ৯ ডিভিশনের অস্তিত্ব বিনষ্ট হয়ে গিয়েছিল। ডিভিশনটি অবশ্য শক্তির ক্ষমতা প্রদর্শন করে প্রতিপক্ষের কম্যাণ্ডারকে প্রতারিত করতে পেরেছিল, যার ফলে তিনি মধুমতি নদী পার হওয়ার ঝুঁকি নেননি। একটি কম্যাণ্ড হিসেবে ৯ ডিভিশনের ভাঙন ঘটলেও ব্যক্তিগত পর্যায়ে এর অফিসার ও সৈনিকরা অসাধারণ সাহসিকতা দেখিয়েছিল এবং ব্যক্তিগতভাবে বীরত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল, যেগুলোর জন্য শত্রুরাও প্রশংসা করেছে।

ব্রিগেডিয়ার হায়াত কেন মধুমতি নদীতে না গিয়ে খুলনায় পশ্চাদপসরণ করেছিলেন? এটা ছিল তার নিজের জি ও সি আনসারীর আদেশের বিরোধী কাজ। জেনারেল নিয়াজী সরাসরি ব্রিগেডিয়ার হায়াতকে আদেশটি দিয়েছিলেন, যাতে তিনি ৬ষ্ঠ নৌ বহরের জন্য খুলনা বন্দরকে দখল করতে পারেন। ধারণা করা হয়েছিল যে, নিয়াজীকে সাহায্য করার জন্য নৌবহরটি আসছিল। এটা ছিল অত্যন্ত খারাপ একটি কৌশল, যার ফলে শত্রুর জন ঢাকা উন্মোচিত হয়ে পড়েছিল। ঢাকা ও শত্রুর মধ্যখানে সে সময় কেবল একটি কোম্পানি, দুটি ৩.৭ ইঞ্চি কামান এবং ৯ ডিভিশনের এইচ কিউ বিদ্যমান ছিল। এ কেমন ঝুকি নেয়া?

রংপুর ঃ বগুড়া-রাজশাহী সেক্টর ঃ মেজর জেনারেল নজর হোসেনের নেতৃত্বাধীন ১৬ ডিভিশন এই সেক্টরকে রক্ষা করছিল। হিলি স্যালিয়েন্টকে কাজে লাগিয়ে শত্রু এই ডিভিশনটিকে দ্বিখণ্ডিত করে ফেলেছিল। রংপুর-বগুড়ার প্রধান সড়কে শত্রুর অ্যামবুশ থেকে জিওসি প্রাণে বেঁচে গিয়েছিলেন। ডিভিশনের কম্যাণ্ডে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালের ২৪ এম এম কামান সজ্জিত একটি আর্মার্ড রেজিমেন্ট ছিল। এই কামানগুলো শত্রুর পিটি ৭৬ ও এম ৫৯ /এম ৬০-এর বিরুদ্ধে অর্থহীন ছিল। শত্রু বেশির ভাগ দুর্গকে পাশ কাটিয়ে যায় এবং ১৬ ডিভিশনকেও এক কম্যাণ্ডের বাইরে খণ্ডিত অবস্থায় পায়। আত্মসমর্পণের সময় এই ডিভিশনটি একটি যোদ্ধা ফর্মেশন হিসেবে ঐক্যবদ্ধ ছিল না, যদিও অন্য ডিভিশনের তুলনায় এর পৃথক পৃথক ব্যাটালিয়নগুলো অক্ষত অবস্থায় ছিল। ব্রিগেডিয়ার তোজাম্মেলের ভূমিকা ছিল অসাধারণ রকম প্রশংসনীয়।

সিলেট-ব্রাহ্মণবাড়িয়া সেকশন ঃ সর্বাত্মক যুদ্ধের আগেই জৈন্তাপুর, রাধানগর ও শমসের নগরের পতন ঘটেছিল। ২ ডিসেম্বররে মধ্যে ট্রুপস মৌলভীবাজারে পশ্চাদপসরণ করেছিল।

৩১৩ ব্রিগেডকে প্রথমে শেরপুর এবং শেষে সিলেট যাওয়ার আদেশ দেয়া হয়েছিল, যেখানে তারা শেষ পর্যন্ত ছিল।। সিলেটের ট্রুপস কোনো ভূমিকা পালন করতে পারেনি, তারা যুদ্ধকেও কোনোভাবে প্রভাবিত করতে পারেনি।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া-আশুগঞ্জ ঃ ব্রিগেডিয়ার সাদ উল্লাহর অধীনে ২৭ ব্রিগেড বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করলেও শত্রুর সংখ্যাধিক্যের কারণে তাদেরকে পর্যায়ক্রমে পশ্চাদপসরণ করতে হয় এবং ৪/৫ ডিসেম্বর রাতে তারা আখাউড়া ও কসবা হয়ে ব্রাহ্মণবাড়িয়া চলে আসে। ৫ ডিসেম্বর ব্রাহ্মণবাড়িয়া হুমকির সম্মুখিন হয় এবং ৫/৬ ডিসেম্বর রাতে ব্রাহ্মণবাড়িয়া পরিত্যক্ত হয়। ভৈরব যাওয়ার পথে ৯/১০ ডিসেম্বর রাত পর্যন্ত আশুগঞ্জে এই ব্রিগেড ভালো যুদ্ধ করে। এটা ছিল একটা ভুল পদক্ষেপ, কারণ ভৈরবের দক্ষিণ দিকেও খাল ছিল। ফলে ভৈরবে ডিভিশন এইচ কিউ ও ২৭ ব্রিগেড নিরাপত্তা পেলেও তারা পূর্ব পাকিস্তানকে রক্ষার যুদ্ধ থেকে বাইরে চলে গিয়েছিল। শত্রু বিনা বাধায় ১১ ডিসেম্বর নরসিংদী পার হতে সক্ষম হয়েছিল এবং ১৪ ডিভিশনের উত্তর দিকের অংশের কোনো হুমকির সম্মুখিন না হয়েই ঢাকার দিকে অগ্রসর হতে পেরেছিল।

সংক্ষেপে বলতে গেলে ৪ ডিসেম্বর সর্বাত্মক যুদ্ধ শুরু হওয়ার ৪৮ ঘণ্টার মধ্যেই ১৪ ডিভিশনের প্রতিরক্ষা ছিন্নভিন্ন হয়ে পড়েছিল। ৬ ডিসেম্বরের মধ্যে ডিভিশনটি অস্তিত্বহীন হয়ে পড়ে, শুধু সিলেটে একটি এবং ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় একটি ব্যাটেলিয়ান রয়ে যায়। ১২ ডিসেম্বরের মধ্যে সিলেট ব্যতীত এই ডিভিশনের আওতাধীন সমগ্র এলাকা শত্রু দখল করে নেয়। সিলেট বিচ্ছিন্ন ও অকার্যকর ছিল।

দক্ষিণাঞ্চলীয় সেক্টরে (চাঁদপুর-কুমিল্লা) ঃ শত্রুকে প্রতারিত করার উদ্দেশ্যে জেনারেল নিয়াজী ৩৯ ডিভিশন সৃষ্টি করেছিলেন। কিন্তু বাস্তবে এই পদক্ষেপের ফলে ফর্মেশনগুলি ভেঙে পড়ে এবং যোগাযোগ সমস্যার কারণে কম্যাণ্ড ও নিয়ন্ত্রণের ঘাটতি সৃষ্টি হয়। মেজর জেনারেল রহিমের নেতৃত্বাধীন ৩৯ ডিভিশনে দুটি ব্রিগেড ছিল। ব্রিগেডিয়ার নিয়াজীর নেতৃত্বে একটি ব্রিগেড ছিল লাকসাম-ফেনী অঞ্চলে, অন্যটি ব্রিগেডিয়ার আতিকের নেতৃত্বে ছিল কুমিল্লা অঞ্চলে। শত্রুর একেবারে সামনাসামনি মোতায়েন থাকায় ব্রিগেডিয়ার নিয়াজীর ব্রিগেডটির অবস্থান ক্রটিপূর্ণ ছিল এবং অরক্ষণীয় একটি সড়ককে রক্ষার উদ্দেশ্যে তাদের সুদীর্ঘ রৈখিক বা লিনিয়ার ফর্মেশনে ছড়িয়ে রাখা হয়েছিল।

৪/৫ ডিসেম্বর রাতে শত্রু চৌদ্দগ্রাম অঞ্চলে আক্রমণ চালায় এবং মুক্তিবাহিনীর সহযোগিতায় মোজাফফরগঞ্জ দখল করে পেছন দিকে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করে। ৫/৬ ডিসেম্বর রাতে ৫৩ ব্রিগেড লাকসাম চলে যায়। ব্যাটেলিয়ন কম্যাণ্ডারদের আত্মসমর্পণ করার খবরের কারণে ঐ এলাকায় মারাত্মক বিভ্রান্তি ও বিশৃখলার সৃষ্টি হয়। অস্ত্রশস্ত্র ও আহতদের ফেলে রেখে লাকসাম পরিত্যক্ত হয়। চাঁদপুর যাওয়ার পথে ব্যাটেলিয়নগুলো ছত্রভঙ্গ হয়ে

পড়ে এবং যত্রতত্র আত্মসমর্পণ করতে থাকে। ইতিমধ্যে ৮ ডিসেম্বরই ৩৯ ডিভিশন এইচ কিউ চাঁদপুর পরিত্যাগ করেছিল। ঢাকা আসার পথে ডিভিশনাল হেডকোয়াটার্সকে বহনকারী নৌকাগুলোকে ভারতীয় বিমান বাহিনী আক্রমণ করে। ডিভিশনের সি ও এস ১ লেঃ কর্নেল কোরেশী ও অন্য দশ জন নিহত হয় এবং এর জি ও সি মেজর জেনারেল রহিম আহত হন। কুমিল্লায় ব্রিগেডিয়ার আতিকের অধীনে গ্যারিসন ঘেরাও হয়ে পড়ায় ৮/৯ ডিসেম্বর রাতে ৩৯ ডিভিশন অস্তিত্বহীন হয়ে যায়।

৭ ডিসেম্বরের মধ্যে ঘটনা প্রবাহ পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডের জন্য অত্যন্ত অলক্ষুণে অবস্থার সৃষ্টি করে। যশোর ও ঝিনাইদহের পতন ঘটে এবং ৯ ডিভিশন ছিন্নভিন্ন হয়ে পড়ে। সিলেট গ্যারিসন বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। ১৪ ডিভিশন ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে চলে আসে এবং ভারতীয়রা আশুগঞ্জ ভৈরব বাজারের জন্য হুমকি সৃষ্টি করে। ৩৯ ডিভিশন (অ্যাডহক ডিভিশন)-এর প্রতিরক্ষা ছিন্নভিন্ন হয়ে যায় এবং ডিভিশনাল এইচ কিউ-কে চাঁদপুর পরিত্যাগ করার অনুমতি দেয়া হয়। এর দুটি ব্যাটেলিয়ন বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে।। উত্তর-পশ্চিম ফ্রন্টে ১৬ ডিভিশনকে দ্বিখণ্ডিত করে ফেলা হয় এবং এর জি ও সি বিছিন্ন হয়ে পড়েন।। ফলে সর্বাত্মক যুদ্ধ শুরু হওয়ার তিন থেকে চার দিনের মধ্যেই সমগ্র পূর্বাঞ্চলীয় কম্যান্ডই নানান অংশে বিভক্ত হয়ে পড়ে।

৯ ডিসেম্বরের মধ্যেই পূর্বাঞ্চলীয় কম্যান্ডের জিওসি-র জন্য পরিস্থিতি নৈরাশ্যকর হয়ে পড়েছিল। জিএইচকিউ-কে পরিস্থিতির ভয়াবহতা সম্পর্কে অবহিত করতে গিয়ে তিনি জানান যে, তাঁর পক্ষে আর মাত্র কয়েকদিন যুদ্ধ চালানো সম্ভব হবে। তিনি সামরিক পরাজয় বরণ করেছিলেন। যদিও এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই যে পাকিস্তান আর্মিকে এক অত্যন্ত প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে যুদ্ধ করতে হয়েছিল। রাজনৈতিক ব্যাপারে ভুল পদক্ষেপের কারণে পূর্ব পাকিস্তানের জনগোষ্ঠীর সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ পাকিস্তানের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিল এবং মুক্তিবাহিনীর জঙ্গী সমর্থনে ভারতীয় সেনাবাহিনীকে বিপুলভাবে কার্যকর সহযোগিতা যুগিয়েছিল। এই সহযোগিতার ফলে পাকিস্তান আর্মির পার্শ্ব ও পেছন দিক দিয়ে চলাচল ও কৌশল অবলম্বনের ক্ষেত্রে ভারতীয় আর্মি বিরাট সুবিধা পেয়েছিল। তারপরও যুদ্ধকে দীর্ঘায়িত করা যেতো যদি নিয়াজী জেনারেল মুজ্জাফফর উদ্দিন ও জেনারেল ইয়াকুবের প্রণীত চলমান প্রতিরক্ষার মূল ধারণাটি অনুসরণ করতেন, যার প্রণয়নে আমিও কিছুটা অবদান রেখেছিলাম।

১০ ডিসেম্বর সামগ্রিক সামরিক পরিস্থিতি নিচে তুলে ধরা হল ঃ

৯ ডিভিশন

ক. ৬ ডিসেম্বর যশোর পরিত্যক্ত হয়েছিল। মধুমতি নদীর পেছনে মাগুরায় পশ্চাদপসরণ করার পরিবর্তে হায়াতের ব্রিগেড খুলনা অভিমুখে সরে গিয়েছিল।

খ. ব্রিগেডিয়ার মনযুরের ব্রিগেড গঙ্গা পার হয়ে ১৬ ডিভিশনের এলাকায় চলে যায়। বাকী অংশ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। এদেরকে ঢাকায় আসার নির্দেশ দেয়া হয়। কিন্তু নৌকার অভাবে তারা আসতে পারেনি। মুক্তিবাহিনী সকল নৌকা সরিয়ে ফেলেছিল।

ডিভিশনের দুটি মাত্র ব্রিগেড ৭৫ মাইলের ব্যবধানে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। শত্রু ও ঢাকার মধ্যস্থলে মাত্র দুটি কোম্পানি এবং ডিভিশন এইচ কিউ ছিল।

১৬ ডিভিশন

ক. ৭ ডিসেম্বর পীরগঞ্জের কাছে শত্রু রংপুর-বগুড়া সড়ক কেটে ফেলে। ডিভিশনটি দ্বিখণ্ডিত হয়ে পড়ে।

খ. ডিভিশন এইচ কিউ নাটোরে চলে আসে এবং যুদ্ধের শেষ পর্যন্ত যুদ্ধের বাইরে অকার্যকর অবস্থায় থাকে। ব্রিগেডগুলো বিচ্ছিন্নভাবে নিজেদের অবস্থান রক্ষার জন্য যুদ্ধ করেছিল।

১৪ ডিভিশন

ক. ২৭ ব্রিগেড ১০ ডিসেম্বর ভৈরব বাজারে চলে আসে। এর দক্ষিণ দিকে নদীপথ থাকায় ব্রিগেডটি বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় এবং পূর্ব পাকিস্তানের যুদ্ধের ব্যাপারে অকার্যকর হয়ে পড়ে। যেখানে ছিল সেখানে তারা নিরাপদে থাকলেও ঢাকাকে রক্ষার ক্ষেত্রে তারা কোনো সমর্থনই যোগাতে পারেনি।

খ. ৩১৩ ব্রিগেড সিলেটে চলে যায়। সেখানে তারা ২০২ ব্রিগেডের সঙ্গে অবস্থান করে। এটা ছিল মাত্র একটি ব্যাটেলিয়নসহ এক অ্যাডহক ব্রিগেড। সিলেটের বিচ্ছিন্ন দুর্গকে ভারতীয়রা অযথা বিরক্ত করেনি। কারণ এই যুদ্ধে তাদের আর কোনো ভূমিকা পালনের সুযোগ ছিল না।

৩৯ অ্যাডহক ডিভিশন

ক. দুটি কোম্পানি ও ব্যাটেলিয়ন এইচ কিউ ৪/৫ ডিসেম্বর প্রথম রাতে আত্মসমর্পণ করেছিল।

খ. ২৭ পাঞ্জাব ও ২১ এ কে ১০ ডিসেম্বর আত্মসমর্পণ করে।

গ. ৮ ডিসেম্বর মেজর জেনারেল রহিম চাঁদপুর থেকে ঢাকায় তার এইচ কিউ সরিয়ে আনেন।

ঘ. ৫২৩ ব্রিগেড গ্রামাঞ্চলের সর্বত্র ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে। এর ব্যাটেলিয়নগুলোর একটি পথ হারিয়ে ফেলে এবং শত্রুর কাছে আত্মসমর্পণ করে।

ঙ. কুমিল্লা গ্যারিসনকে পাশ কাটানো হয়। ১১৭ ব্রিগেড কেবল সেনানিবাস এলাকা রক্ষা করতে থাকে। শত্রুর কাছে আগেই কুমিল্লা শহরের পতন ঘটেছিল।

চ. শত্রু দাউদকান্দি ও চাঁদপুর পৌছে গিয়েছিল এবং এই সেক্টরে আমাদের ট্রুপস হয় আত্মসর্মপণ করেছে নয়তো ছত্রভঙ্গ হয়ে গেছে কিংবা নিহত হয়েছে।

৩৬. অ্যাডহক ডিভিশন

এই ডিভিশনের মাত্র দুটি নিয়মিত ব্যাটেলিয়ন ছিল, ৩৩ পাঞ্জাব ও ৩১ বালুচ। জামালপুর ও ময়মনসিংহ থেকে ঢাকার দুটি প্রবেশ মুখ এই দুটি ব্যাটেলিয়ন দেখাশোনা করতো। সীমান্তে বীরত্বপূর্ণ যুদ্ধশেষে এদের প্রত্যাহার বিশৃংখল হয়ে পড়ে। টাঙ্গাইল অঞ্চলে বিমানযোগে শত্রুর অবতরণের পর কম্যান্ডের মিল ও সংহতি বিনষ্ট হয়ে যায়। দলভ্রষ্ট হয়ে যারাই ঢাকায় ফিরেছিল তাদের সকলের দশাই ছিল অত্যন্ত খারাপ। বিভিন্ন সেক্টর থেকে আগত বাহিনীর খণ্ডিত ও অবশিষ্ট অংশগুলোকে ঢাকার প্রতিরক্ষার জন্য সংগঠিত করা হয়েছিল।

পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিরক্ষার অপারেশনগত ধারণার পরিবর্তন করার মধ্য দিয়ে লেঃ জেনারেল নিয়াজী বিপর্যয়ের বীজ বপন করেছিলেন। তিনি যে পরিকল্পনা বিকশিত করেছিলেন তা বিদ্যমান অপারেশনগত পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ ছিল না। ভারতীয় আক্রমণ শুরু হওয়ার সাথে সাথেই পরিকল্পনাটির দুর্বলতা প্রকাশিত হয়ে পড়তে শুরু করেছিল এবং প্রত্যাহার না করার নির্দেশ দিয়ে কোর এইচ কিউ থেকে জারি করা আদেশ পালন করা সকল পর্যায়ের কম্যান্ডারদের জন্য অসম্ভব হয়ে পড়েছিল। বিস্তৃত ফ্রন্ট, দুর্বল ও পাতলা প্রতিরক্ষা এবং সংখ্যায় ও গোলাবারুদের ক্ষমতায় শত্রুর সর্বব্যাপী শ্রেষ্ঠত্বের কারণে দুর্গের মাধ্যমে দৃঢ় ও শক্তিশালী প্রতিরক্ষার ধারণা সফল হতে পারেনি। এটা কেবল বিশৃংখল পশ্চাদপসরণেরই কারণ ঘটিয়েছে।

বীরত্ব, সাহসিকতা ও আত্মোৎসর্গের স্বল্প সংখ্যক দৃষ্টান্তের ব্যতিক্রম ছাড়া যুদ্ধের পরিচালনা ছিল আতংক, বিভ্রান্তি, বিশৃংখলা ও কলংকে পরিপূর্ণ এক বিষাদ কাহিনী যার পরিণতি ঘটেছিল পূর্ব পাকিস্তানের আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়ে।

২০ নভেম্বর থেকে ৩ ডিসেম্বর পর্যন্ত ভারতীয় আক্রমণের প্রাথমিক পর্যায়ে ইস্টার্ন কমান্ডের কম্যান্ডার অত্যাসন্ন বিপদ সম্পর্কে উপলব্ধি করতে পারেন নি এবং তিনি এক ইঞ্চি ভূমিও হারানো যাবে না– এই বাতিল হয়ে যাওয়া ধারণার ভিত্তিতে এগিয়ে যাচ্ছিলেন। সম্পূর্ণরূপে সামরিক বিবেচনা থেকে তার বাহিনীগুলিকে পুনর্বিন্যস্ত করতে তিনি ব্যর্থ হয়েছিলেন। পরিবর্তে এলাকায় প্রাথমিক অপারেশনকালে শত্রুর দখল করা ভূমি পুনরুদ্ধার করার প্রচেষ্টা চালাতে গিয়ে ট্রুপসকে বিপুল ক্ষয়ক্ষতির শিকার হতে হয়েছিল, এমন কি 'অপারেশনাল টাস্কের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বাহিনীকে পুনর্বিন্যস্ত করা' জন্য জি এইচ কিউ থেকে ৩ ডিসেম্বর জেনারেল নিয়াজীকে নির্দেশ পাঠানোর পরও তিনি অবস্থানসমূহের পুনর্বিন্যাস করার আদেশ দেননি। এর ফলে ৫ ডিসেম্বর থেকে পরবর্তীকালে অগ্রবর্তী প্রতিরোধগুলো দ্রুত ভেঙে পড়তে শুরু করেছিল।

যুদ্ধ শুরুর সময় যে সামান্য রিজার্ভ ছিল তাকে খণ্ডিত করে ছড়িয়ে দেয়া হয়েছিল। নভেম্বরে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আগত ব্যাটেলিয়নগুলোকেও বিভিন্ন ডিভিশনের মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ করে বণ্টন করা হয়েছিল। যুদ্ধের কোনো পর্যায়েই উল্লেখযোগ্য কোনো রিজার্ভ সৃষ্টি করার কোনো প্রচেষ্টা নেয়া হয়নি। সে কারণে ঘটনা প্রবাহের গতিধারাকে প্রভাবিত করার মতো কোনো ক্ষমতাই ছিল না ইষ্টার্ন কম্যান্ডের রিজার্ভহীন কমান্ডারের ঢাকায়ও তার কোন রিজার্ভ ছিল না এবং তার ফলে তিনি উর্ধ্বতন কমান্ডের আদেশ অমান্য করেছিলেন।

একটি বাস্তবধর্মী সামগ্রিক কৌশলগত ধারণার অভাবের কারণেও পরিচালিত প্রতিরোধমূলক যুদ্ধ প্রধানত ক্ষয়ক্ষতির শিকার হয়েছিল। দুর্গ ও শক্তিশালী অগ্রমুখ পদ্ধতিভিত্তিক প্রতিরক্ষার ধারণার সফল বাস্তবায়ন নির্ভর করে চলমান রিজার্ভ ও আকাশ শক্তির সমতার ওপর– শক্তিতে শ্রেষ্ঠতর না হলেও যাতে এই রিজার্ভ পাল্টা আক্রমণ চালাতে সক্ষম হয়। কিন্তু দুর্গ প্রতিরক্ষা কৌশল অবলম্বন করাকে যুক্তিসঙ্গত করার মতো না ছিল যথেষ্ট ট্রুপস, না ছিল আরমার্ড ফোর্স এবং ছিল না বিমান শক্তিও। প্রতিরক্ষামূলক একমাত্র যে ধারণাটি সাফল্যার্জন করতে পারতো তা ছিল বাহিনীগুলোকে অস্তিত্বে টিকিয়ে রাখার মিশন অর্জন করার উদ্দেশ্যে সময় কেনা। কিন্তু তেমনটি পরিকল্পিত হয়ে থাকলেও প্রতিরক্ষার পর্যায়ক্রমিক লাইনসমূহকে নির্দিষ্ট করা হয়নি এবং প্রতিটি লাইনে যুদ্ধের জন্য সময়ের কাঠামো সম্পর্কে ফর্মেশনগুলোকে অবহিত করা হয়নি। ফলে শুর করার পরিকল্পনার ব্যাপারে কোনো নমনীয়তা ছিল না এবং ফর্মেশন কম্যান্ডারদের উদ্যোগ খর্বিত হয়েছিল– যখন ২৭ নভেম্বর ইস্টার্ন কমান্ড থেকে জারিকৃত নির্দেশে বলা হয়েছিল যে, "শতকরা ৭৫ ভাগ হতাহত না হলে পশ্চাদপসরণ করা চলবে না।" এই অযৌক্তিক আদেশ অধীনস্থ কমান্ডারদের মনে মারাত্মক প্রতিক্রিয়া ঘটিয়েছিল– যদিও সর্বাত্মক যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর কোনো একটি ফর্মেশন বা ইউনিটই আদেশটি মান্য করেনি, তারা সে আদেশ প্রতিপালন করার মতো অবস্থায় ছিলও না।

ঢাকার প্রতিরক্ষার জন্য পর্যাপ্ত পদক্ষেপ নেয়ার ক্ষেত্রে ইষ্টার্ন কমান্ড ব্যর্থ হয়েছিল। কারণ, ঢাকা অঞ্চলে মোতায়েনের জন্য রক্ষিত রিজার্ভ ব্রিগেডকে আগেই ফেনী–লাকসাম এলাকায় পাঠিয়ে দেয়া হয়েছিল। সকল ফ্রন্টেই যখন পরিস্থিতির অবনতি ঘটে এবং ঢাকাকে রক্ষার গুরুত্ব যখন অনুধাবন করতে হয়, ততক্ষণে ফ্রন্ট লাইনগুলো থেকে ঢাকার দিকে ট্রুপস ফিরিয়ে আনায় অনেক বিলম্ব হয়ে গেছে। ঢাকার জন্য কিছু ট্রুপস পাঠানোর অনুরোধ জানিয়ে ৯ম ও ১৬শ ডিভিশনের কাছে মরিয়াভাবে বার্তা পাঠানো হয়েছিল। যেহেতু মনজুরের ব্রিগেড তার অপারেশনের এলাকা ছেড়ে চলে এসেছিল এবং পাবনা অঞ্চলে অবস্থান করছিল, সেহেতু এই ব্রিগেডের কিছু ট্রুপসকে ঢাকার জন্য পাঠানো যেতো। কিন্তু ফেরির অভাবে এবং আকাশের ওপর নিয়ন্ত্রণ না থাকায় কোনো উদ্যোগ নেয়া সম্ভব হয় নি।

ফলে ভারতীয়রা যখন প্যারা ট্রুপের সমর্থনে ময়মনসিংহ–টাংগাইল দিয়ে ঢুকে পড়ে এবং পূর্ব দিকে নরসিংদী অঞ্চলে যখন ১২ ডিসেম্বর হেলিকপ্টারযোগে ট্রুপস নামানো হয়, তখন বাস্তবে ঢাকায় কোনো যুদ্ধ করার মতো ফরমেশন ছিল না। ইপিআর এবং পশ্চাদপসরণকৃত ও বিভিন্ন সেক্টরে বিপর্যস্ত হয়ে পালিয়ে ঢাকায় আগমনরত ট্রুপসের সমন্বয়ে ঢাকার প্রতিরক্ষার আয়োজন করা হয়েছিল।

জি এইচ কিউ-এর উর্ধ্বতন কমান্ড এবং প্রেসিডেন্টের এইচ কিউ-তে নির্দেশনার জ্ঞান, রাজনৈতিক বিচক্ষণতা এবং সুষ্ঠু সামরিক বিচারের অভাব ছিল। তাদের মধ্যে জাতীয় লক্ষ্য সম্পর্কে স্বচ্ছতা ছিল না এবং তারা সে লক্ষ্য অর্জনের জন্য কোনো জাতীয় কৌশলকে বিকশিত করেননি। জাতীয় কৌশল থেকে সামরিক কৌশলের উৎসারণ ঘটে এবং প্রথমোক্তটির সঠিক বাস্তবায়নের জন্য শেষোক্তটির সুষ্ঠুতা অত্যাবশ্যক। অন্য কথায় বলা যায়, জাতীয় কৌশল যদি দেউলে বা শূন্য হয়, তাহলে শুধু সামরিক পন্থা, এককভাবে কোনো ভালো অর্জন করতে পারে না। এই ক্ষেত্রে পরিষ্কার কোনো রাজনৈতিক লক্ষ্য ছাড়াই কেবল সামরিক সমাধান চাওয়া হয়েছিল। ১৯৭১ সালের মার্চ মাসে মিলিটারি অ্যাকশনের মধ্য দিয়ে রাজনৈতিক ভ্রান্তির পরিসমাপ্তি ঘটেছিল, যা ডিসেম্বর ১৯৭১-এর সর্বনাশের বীজ বপন করেছিল। এটি যুদ্ধের একটি সুপরিচিত নিয়ম যে, সরকারের উদ্যোগে যত বেশি সম্ভব অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির পরই কোনো দেশের সশস্ত্র বাহিনীকে অভিযানে নামানো উচিত। পূর্ব পাকিস্তানের ক্ষেত্রে আমরা দেখি যে, সবচেয়ে প্রতিকূল এক পরিস্থিতির মধ্যে সশস্ত্র বাহিনীকে তৎপরতা চালাতে হয়েছিল– শত্রুভাবাপন্ন জনগণ, মূল ভূমি থেকে বিরাট দূরত্ব, কঠিন ও অসুবিধাজনক ভূখণ্ড, আকাশে প্রভুত্বসহ সংখ্যায় ও অস্ত্রশস্ত্রে অনেক বেশি শ্রেষ্ঠ শত্রু, পশ্চিম পাকিস্তান ফ্রন্টে আশাব্যঞ্জক অবস্থার অগ্রগতি না থাকা ও সেখান থেকে কোনো সাহায্য পাওয়ার আশাহীন পরিস্থিতি এবং সর্বোপরি প্রতিকূল এক বিশ্বজনমত।

অন্য দিকে সুচিন্তিতভাবে কূটনৈতিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও মনস্তাত্ত্বিক পন্থাসমূহ ব্যবহার করার মধ্য দিয়ে ভারত অত্যন্ত অনুকূল এক পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছিল এবং এর ভিত্তিতেই ২১–২২ নভেম্বর ভারত তার সামরিক শক্তির প্রয়োগ ঘটিয়েছিল।

যা অবশ্যম্ভাবী ছিল

১১ ডিসেম্বর সকালে ইউ এস এস আর-এর কাউন্সেল-জেনারেল মিঃ পোপাস আমার সঙ্গে সাক্ষাত করতে এলেন। তিনি বললেন, গভর্নরের বার্তায় যে প্রস্তাব দেয়া হয়েছে সেগুলো তাঁর সরকারের কাছে গ্রহণযোগ্য। আমি প্রশ্ন করলাম: তিনি কিভাবে প্রস্তাব সম্পর্কে জানতে পেরেছেন? তিনি বললেন: কূটনৈতিক মহলের প্রত্যেকেই এ সম্পর্কে জানেন এবং তিনি আমাকে বার্তাটির একটি অনুলিপি দেখালেন। আমি জানতে চাইলাম বার্তার গ্রহণ সংক্রান্ত বিষয়টি মস্কো থেকে এসেছে কিনা। তিনি বললেন, "হ্যাঁ।" এবার আমি জানতে চাইলাম ইসলামাবাদে তাঁদের রাষ্ট্রদূত আমাদের ফরেন অফিসকে বার্তাটি পৌঁছে দিয়েছেন কি না। তিনি বললেন, "হ্যাঁ, পৌঁছে দিয়েছেন।" আমি তাঁকে বললাম, যদি তাই হয়ে থাকে তাহলে গভর্নরের পক্ষে এর বেশি কিছু করার নেই। তিনি একমত হলেন। তারপর তিনি বললেন, "আমি কি একটি ব্যক্তিগত পরামর্শ দিতে পারি? মুক্তিবাহিনী আপনাকে হত্যা করবে। আমি আপনার জন্য বিশেষ একটি কক্ষ তৈরি করেছি। আপনি আসুন এবং সেখানে থাকুন। আমরা আপনাকে নিরাপদে ঢাকার বাইরে পাঠিয়ে দেব।" আমি বললাম, "প্রস্তাবটির জন্য ধন্যবাদ। আমি দুঃখিত, আপনার প্রস্তাবটি গ্রহণ করতে পারছি না। আমার নিয়তি আমরা বাকি জনগণের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে।" প্রস্তাবটি উন্মুক্ত রেখে তিনি চলে গেলেন। অমন একটি প্রস্তাব গ্রহণ করার কোনো ইচ্ছাই আমার ছিল না। অন্য বাংগালী বন্ধুদের আশ্রয় দানের প্রস্তাবও আমি বাতিল করে দিয়েছিলাম।

১১ ডিসেম্বর সকাল ৯ টার দিকে জেনারেল পীরজাদা টেলিফোন করলেন এবং বললেন, "কিছু সামান্য সংশোধনীসহ গভর্নরের প্রস্তাবটি অনুমোদিত হয়েছে। আমরা সংশোধিত খসড়াটি পাঠাচ্ছি।" সেটা এল। সংশোধনী ছিল এই যে, রাজনৈতিক সামাধানের ধারাটি বাদ দেয়া হয়েছিল। বাকীটুকু অনুমোদন পেয়েছিল। সংশোধিত টেলেক্স বার্তা জাতিসংঘেও পাঠানো হয়েছিল। রাজনৈতিক ধারাটুকু না থাকায় প্রস্তাবটির কোনো শক্তি ছিল না। কিন্তু

প্রস্তাবটি অনুমোদিত হওয়ায় এ কথা প্রমাণিত হয়েছিল যে, গভর্নর সরাসরি জাতি সংঘের সঙ্গে যোগাযোগ করলে তাতে প্রেসিডেন্টের আপত্তি নেই এবং রাজনৈতিক আলাপ-আলোচনা ও মীমাংসার পর প্রয়োজনে পশ্চিম পাকিস্তানী বাহিনীর প্রত্যাহার করার ব্যাপারেও প্রেসিডেন্টের সম্মতি রয়েছে।

কিন্তু রেডিওতে আমরা শুনলাম, বার্তাটির জন্য কোনো দায়িত্ব গ্রহণ করতে প্রেসিডেন্ট অস্বীকার করেছেন। বার্তাটির দায়িত্ব আমার ওপর চাপানো হয়েছিল এবং সরকার ঘোষণা করেছিল যে, জাতি সংঘের কাছে অমন কোনো বার্তা প্রেরণের জন্য ফরমানকে কর্তৃত্ব দেয়া হয়নি। প্রকৃত ঘটনাকে আসলে বিকৃত করা ও বানানো হয়েছিল। একথা সত্য যে, ফরমানকে কোনো কর্তৃত্ব দেয়া হয়নি। কিন্তু গভর্নরকে কর্তৃত্ব দেয়া হয়েছিল। বার্তাটি ফরমান পাঠায়নি, নিয়াজীর সম্মতি নিয়ে পাঠিয়েছিলেন গভর্নর এবং তাঁরা এই সত্যটিরও কোনো উল্লেখ করেন নি যে, সমগ্র নাটকটিই সাজানো হয়েছিল জাতিকে ধাপ্পা দেয়ার উদ্দেশ্যে। পরিকল্পনাটি ছিল অন্যদের ওপর দোষ চাপিয়ে ক্ষমতায় টিকে থাকা। যারা নিজেদেরকে রক্ষা করতে পারেন নি, তাদের ওপর থেকে জাতির আক্রোশকে অন্য দিকে সরিয়ে দেয়ার উদ্দেশ্যে এটা ছিল এক জঘন্য ও নিষ্ঠুর প্রচারণা। নিজেদের অপকর্ম ও অসতোদ্দেশ্যকে আড়াল করার জন্যই সমগ্র নাটকে সাজানো হয়েছিল।

১২ ডিসেম্বর মাগরিবের নামাজের পূর্বে আমি একটি কক্ষে প্রবেশ করেছিলাম, গভর্নর হাউসের যে কক্ষটিতে সকল অসামরিক প্রশাসকরা অবস্থান করছিলেন। আমি তাঁদের কয়েকজনকে দেখলাম দু'জন বিদেশী সাংবাদিককে ঘিরে বসে আছেন। অসামরিক প্রশাসকরা তাঁদের কাছে নিজেদের অবস্থান পরিষ্কার করতে গিয়ে বলছিলেন, "আমরা নিজেরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে নিযুক্তি নিয়ে পূর্ব পাকিস্তানে আসিনি। এখানে আসতে আমাদেরকে বাধ্য করা হয়েছে। আমরা কেবল আদেশ পালন করেছি। আমরা কোনো নৃশংসতা চালাই নি। যা কিছু করা হয়েছে তার সবই আর্মি করেছে।" বিদেশীরা মাথা নেড়ে তাঁদের উৎসাহিত করছিলেন, সম্ভবত ভেতরে ভেতরে হাসছিলেনও। কয়েকজনকে আমি দেখলাম টেলিফোনের চারপাশে। তাঁরা করাচীতে অবস্থানরত নিজেদের পরিবারের সঙ্গে কথা বলছিলেন। এতে দোষের কিছু নেই, কিন্তু তাঁরা ঢাকার ভয়াবহ পরিস্থিতির কথা জানাতে গিয়ে টেলিফোনে কান্নাকাটি করছিলেন। ঢাকায় তখন প্রথমবারের মতো শত্রুর কামানের শব্দ শোনা যাচ্ছিল, শত্রু কাছে এগিয়ে আসছিল। আর্মি তাদের নিরাপত্তা বিধান করতে পারেনি এবং মুক্তিবাহিনী তাদের সবাইকে জবাই করতে পারে।

আমি আলোচনায় হস্তক্ষেপ করলাম এবং সাংবাদিকদের কাছে ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বললাম যে, পূর্ব পাকিস্তান আলাদা কোন দেশ নয়। পাকিস্তান একটি দেশ এবং কেন্দ্রীয় সরকার যেখানে প্রয়োজন সেখানেই যে কোন অসামরিক বা সামরিক অফিসারকে নিযুক্তি

দিতে পারে। আমি তাঁদের বললাম যে, নিজেদের দেশকে রক্ষা করার সম্পূর্ণ অধিকার আমাদের রয়েছে এবং পূর্ব পাকিস্তান যতটা বাংগালীদের দেশ ঠিক ততটাই আমাদেরও দেশ। আমাকে কর্তৃত্বপূর্ণ আচরণ করতে হয়েছিল। এর ফলে বিদেশী সংবাদ মাধ্যমে আমাকে পূর্ব পাকিস্তানের সবচেয়ে ক্ষমতাবান মানুষ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছিল। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে গভর্নরের অফিসেরই তখন কোনো ক্ষমতা ছিল না, তার স্টাফ অফিসারের তো কোন প্রশ্নই ওঠে না।

পরদিন সকালে যথারীতি আমি সকাল সাড়ে ৭ টায় আমার অফিসে এসেছি। সেখানে আন্তর্জাতিক রেডক্রস কমিটি ও ইউ এন রিলিফ কমিশনের প্রতিনিধিসহ কয়েকজন সাক্ষাতকারী ছিলেন। আমি নেতৃস্থানীয় কিছু ব্যক্তির ব্যাপারে খুব উদ্বিগ্ন ছিলাম, যাঁরা পাকিস্তানের প্রতি অনুগত ছিলেন এবং যাঁরা অবশ্যই মুক্তিবাহিনীর শিকারে পরিণত হবেন। মুক্তিবাহিনীর কর্মপদ্ধতি ততদিনে তাদের কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল। যে সব এলাকা ভারতীয় আর্মির দখলে এসেছিল সে সব এলাকার সর্বত্রই সঙ্গে আগত মুক্তিবাহিনী খুব নৃশংসভাবে মানুষকে হত্যা করেছিল। তাদের একটি একটি করে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কাটা হয়েছে, বর্শা ও তরবারি দিয়ে দেহ ছিন্ন করা হয়েছে, চোখ তুলে ফেলা হয়েছে এবং এমনি ধরনের জঘন্য অন্যান্য কাজ করা হয়েছে। সে কারণে হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে একটি আন্তর্জাতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠিত করার জন্য আমি ইন্টারন্যাশনাল কমিশন অফ রেড ক্রসকে অনুরোধ জানিয়েছিলাম। তারা সহানুভূতিশীল ছিলেন এবং দায়িত্বটি গ্রহণ করেছিলেন। কাজটির জন্য তাদের কোন বাধ্যব ধকতা ছিল না, কিন্তু মানবিক সমঝোতার ভিত্তিতে তারা এটা করেছিলেন। আইসিআরসি-র মিশন প্রধান আমার কয়েকটি স্বাক্ষর চেয়েছিলেন, যাতে প্রয়োজনের সময় কেউ গিয়ে আশ্রয় চাইলে হোটেলে প্রবেশ করতে এবং এ ধরনের অঞ্চলে আন্তর্জাতিক আইনের ভিত্তিতে নিরাপত্তা পেতে পারে। আমি কয়েকটি স্বাক্ষর দিয়েছিলাম। জাতি সংঘ প্রতিনিধি আমাকে এ কথা বলতে এসেছিলেন যে, যদি কোনো যুদ্ধ বিরতি চুক্তি হয়ে যায় তাহলে তারা জাতি সংঘ কোনো বিকল্প আয়োজন করার আগে তিন চার দিন পর্যন্ত বিষয়টি তত্ত্বাবধান ও মনিটর করার মতো যথেষ্ট সংখ্যক লোকবল যোগাড় করতে পারবেন। অমন একটি প্রস্তাবের জন্য আমার সন্তোষ প্রকাশ করে আমি বলেছিলাম, একমাত্র গভর্নর কিংবা প্রেসিডেন্টই রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। অবশ্য প্রয়োজন হলে ঘনিষ্ঠ সমন্বয় সাধনের কাজটি আমার অফিস সম্পাদন করতে পারবে।

আমরা যখন আলোচনা করছিলাম, তখন টেলিফোন বেজে উঠল। অন্য প্রান্ত থেকে কথা বলছিলেন মেজর জেনারেল রহিম। আমি এ কথা জেনে বিস্মিত হয়েছিলাম যে, তিনি গভর্নর হাউসের বেষ্টনীর ভেতর অবস্থিত আমার বাসা থেকেই কথা বলেছিলেন। তিনি

বললেন, "আপনি কি একটু আসতে পারেন? আমি আপনার সঙ্গে কথা বলতে চাই।" আমি হেঁটেই আমার বাসায় গেলাম। সেখানে দুটি প্রবেশ পথ ছিল। আমি যখন ঢুকছিলাম তখন দেখলাম অন্য দরজা দিয়ে নিয়াজী ও জামশেদ ঢুকছেন। রহিম আলোচনার জন্য তাঁদেরকেও ডেকেছিলেন। তাঁরা একটু দূরের দরজা দিয়ে আসতে থাকায় আমি তাদের আগেই শোবার ঘরে ঢুকলাম। একটি মোটর বোটে চড়ে চাঁদপুর থেকে ফেরার সময় রহিম আহত হয়েছিলেন। তাঁকে সি এম এইচ-এ ভর্তি করা হয়েছিল, যা ঢাকা সেনানিবাসের শেষ প্রান্তে অবস্থিত। তিনি সি এম এইচ-কে নিরাপদ ভাবতে না পেরে আমার বাসায় চলে এসেছিলেন। আমি দু'বার তাকে দেখার জন্য সি এম এইচ-এ গিয়েছিলাম, কিন্তু দু'বারই তাঁকে ঘুমন্ত পেয়েছি। তাঁকে কড়া ওষুধ দেয়া হয়েছিল। আমি তিনি কেমন আছেন তা জানতে চাইলাম এবং আমাকে ডাকার উদ্দেশ্য কি জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন যে, যুদ্ধ বিরতির আহ্বান জানানোর একমাত্র পথটিই এখন খোলা রয়েছে। এ সময় নিয়াজী ও জামশেদ প্রবেশ করলেন, করমর্দন করলেন এবং রহিমের সঙ্গে কথা বলা শুরু করলেন। রহিম যেহেতু আমার অতিথি সে কারণে তার জন্য তোয়ালে ও টয়লেটের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র দেয়ার এবং আমাদের দু'জনের খাবারের আয়োজন করতে পরিচারককে বলার উদ্দেশ্যে আমি পাশের ঘরে চলে গেলাম। আমি কয়েক মিনিট পর ফিরে এলাম। মনে হল যুদ্ধের একটি সম্মানজনক পরিসমাপ্তি ঘটানোর আয়োজন করার ব্যাপারে রাওয়ালপিন্ডির কর্তৃপক্ষকে বলার জন্য তিনজনের মধ্যে আলোচনা হয়ে গেছে। আমি যেহেতু যুদ্ধ পরিচালনার ব্যাপারে যুক্ত ছিলাম না, সে কারণে আমি নীরব রইলাম। এটা একটি কয়েক মিনিটের বৈঠক ছিল। নিয়াজী ও জামশেদ চলে গেলেন। রহিমের আরামের আয়োজন নিশ্চিত করে আমিও আমার অফিসে ফিরে এলাম। মিনিট পনোরোর মধ্যে নিয়াজী একা আমার অফিসে ঢুকলেন। আমার সঙ্গে সাক্ষাতের সময় যাতে দ্বিতীয় কোনো সাক্ষী না থাকে সেজন্য তিনি জামশেদকে বিদায় করেছিলেন। নিয়াজী এর আগে আর কখনো আমার অফিসে আসেন নি, সে কারণে তাঁকে দেখে আমি বিস্মিত হয়েছিলাম। তিনি বললেন, "ওটা এখান থেকে পাঠিয়ে দিন।" তিনি যা বোঝাচ্ছিলেন তা হল, যুদ্ধ বিরতির বার্তাটি গভর্নরের অফিস থেকে পাঠানো হোক। ততদিনে আমি তাঁর খেলা বুঝে ফেলেছিলাম। যুদ্ধে পরাজিত হওয়ার পর তিনি সমগ্র দায়-দায়িত্ব গভর্নর হাউসের ওপর ছুঁড়ে দিতে চাচ্ছিলেন। আমি বললাম, "আমি বার্তাটি এখান থেকে পাঠাচ্ছি না।" আমি কথাটি শেষ করা মাত্রই চিফ সেক্রেটারি মোজাফফর হোসেন সেখানে প্রবেশ করলেন। তিনি বললেন, "কি ব্যাপার?" আমি বললাম, "জেনারেল একটি বার্তা পাঠাতে চান।" তিনি বললেন, "স্যার, আমার সঙ্গে আসুন।" তিনি নিয়াজীকে নিয়ে চলে গেলেন। প্রায় ঘন্টা খানেক পর মিলিটারি সেক্রেটারি টেলিফোন করে আমাকে জানালেন, "সেই বার্তাটি স্বাক্ষরের জন্য তৈরি হয়ে

গেছে।" আমি তাকে বললাম, "নিয়াজীর উদ্যোগে তৈরী কোনো বার্তাকে আমি অনুমোদন করব না, ওতে স্বাক্ষরও দেব না।" বিষয়টির এখানেই সমাপ্তি ঘটেছিল। বার্তাটি কোনোদিনই আর পাঠানো হয়নি।

১৩ ডিসেম্বর সকাল ১১ টার দিকে ভারতীয় বিমান বাহিনী গভর্নর হাউসের ওপর আক্রমণ চালিয়েছিল। তারা সুনির্দিষ্টভাবে আমার অফিসকে আঘাত হানার দাবি করেছিল। ঘটনাটি সত্য ছিল, কিন্তু এই আক্রমণে আমার অফিসের সামনের একটি পিলারই কেবল কিছুটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। আমি বাইরে বেরিয়ে আসি, সেখানে খাজা খায়েরুদ্দিন ও অন্যরা আমার সঙ্গে যোগ দেন। ভারতীয় বিমানগুলো ঘুরে এসে আবারও গভর্নর হাউসের ওপর নেমে আসতে থাকে। আমি চিৎকার করে সকলকে মাটিতে শুয়ে পড়তে বলি, কিন্তু নিজে একটি গাছের নিচে দাঁড়িয়ে থাকি। রিসেপশন হলের ওপর রকেট হামলা চালানো হয়, যেখানে একটি সম্মেলন চলছিল বলে ভারতীয়রা দাবি করেছিল। একটি সভা অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু সেটা স্থগিত করা হয়েছিল। ভারতের দাবিটি থেকে বোঝা গিয়েছিল যে, ঢাকায় কখন কি ঘটছে সে ব্যাপারে তারা কতটা ঘনিষ্ঠভাবে জানত। আক্রমণের পর খাজা সাহেব আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, আমি কেন নিরাপত্তামূলক পদক্ষেপ নেইনি। আমি বলেছিলাম, "আমি একজন জেনারেলের পোশাক পরে আছি। আমি অন্যদের দেখাতে পারি না যে, আমি ভয় পেয়েছি।"

লাইব্রেরিতে আগুন ধরে গিয়েছিল। মিলিটারি সেক্রেটারি ফায়ার ব্রিগেড ডেকে এবং অন্যান্য উপায়ে আগুন নেভানোর চেষ্টা করছিলেন। গভর্নর আমাদের কয়েকজনকে ডাকলেন এবং বললেন, যেহেতু ইসলামাবাদ তাঁর উপদেশের প্রতি কর্ণপাত করছে না, সে কারণে তিনি পদত্যাগ করছেন। তিনি গভর্নর হাউস থেকে বেরিয়ে গিয়ে জরুরি পরিস্থিতিতে আশ্রয় নেয়ার জন্য মাটির নিচে নির্মিত শেল্টারে গিয়ে আশ্রয় নিলেন।

আমি এবার দ্বিতীয়বারের মতো বেকার হয়ে পড়লাম, যেহেতু তখন আর কোনো গভর্নর ছিলেন না। চিফ সেক্রেটারি, প্রাদেশিক সেক্রেটারিবৃন্দ এবং গভর্নর হাউসের অসামরিক স্টাফের সদস্যরা আইসিআরসি-র অধীনে ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেলে আশ্রয় ও নিরাপত্তা চাওয়ার উদ্দেশ্যে চলে গেলেন। আমি আমার বাসায় গেলাম এবং দেখে বিস্মিত হলাম যে, জেনারেল রহিম সেখানে নেই। বিমান আক্রমণের অব্যবহিত পর পরই তিনি চলে গিয়েছিলেন। গভর্নর হাউসকে পরিত্যক্ত মনে হচ্ছিল। আমি তখন কি করতে পারতাম? আমি আইসিআরসি-র আন্তর্জাতিক অঞ্চলে যেতে পারতাম, যা আমি নিজে তৈরি করিয়েছিলাম। কিন্তু সেটা আমার পদমর্যাদার জন্য উপযোগী কাজ হত না। আমি সেনানিবাসে যাওয়ার এবং আর্মির সঙ্গে থাকার সিদ্ধান্ত নিলাম। সেনানিবাসে গিয়ে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ কম্যান্ডান্টের বাসভবনে এক কক্ষ আমি খালি পেয়ে গেলাম। সেখানে

আমার জিনিসপত্র রেখে আমি কোর হেডকোয়ার্টার্সে গিয়ে রিপোর্ট করলাম। আমাকে পালনীয় কোন দায়িত্ব দেয়া হলো না। ১৩ ডিসেম্বর দুপুর ১২টা থেকে ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত আমার কোনো চাকরি ছিল না, কোনো দায়িত্ব ছিল না এবং কোনো কর্তৃত্ব ছিল না। আমি তখন এমন একজন ব্যক্তি যে শুধু তার নিজের পরিচারককে আদেশ দিতে পারত। আমি বিভিন্ন সম্মেলনে যোগ দিয়েছি, মতামত প্রকাশ করেছি এবং চাওয়া হলে পরামর্শ দিয়েছি, কিন্তু বেশির ভাগ সময় আমি উপেক্ষিত থেকেছি। ১৪ তারিখে আমি গভর্নর হাউসেও গিয়েছি। সেখানে দেখলাম গভর্নর হাউসের প্রধান কনফারেন্স হলে ভারতীয় বিমান বাহিনীর রকেট হামলায় আগুন লেগে যাওয়া দরজা-জানালাগুলো ভেতরের দিকে পড়ে গেছে। জ্বলন্ত একটি জানালাকে দেখলাম লাল কার্পেট ছুঁয়ে থাকতে, যার ফলে কার্পেটটিতে আগুন লেগে যেতে পারত। আমার মনে এই পরিষ্কার ধারণাটি ছিল যে, এমন কি ভবিষ্যতেও এটা একটি মুসলিম দেশের রাষ্ট্র প্রধানের বাসভবন হবে। সে কারণে আমি নিজের হাত ও পা দিয়ে বিপজ্জনক স্থানগুলো থেকে আগুন সরিয়ে দিয়েছি এবং রক্ষা করেছি গভর্নর হাউসকে।

অন্যান্য প্রাদেশিক সেক্রেটারির সঙ্গে চিফ সেক্রেটারি তাদের জন্য বরাদ্দকৃত বাংলাগুলোতে বসবাস করা নিরাপদ মনে না করায় সবাই গভর্নর হাউসে চলে এসেছিলেন। এদের সকলে পশ্চিম পাকিস্তানী ছিলেন এবং পূর্ব পাকিস্তান সরকারের অধীনে নিযুক্তি হয়েছিলেন। তাঁদের পক্ষে দায়িত্ব পালন করা অসম্ভব হয়ে পড়ে এবং তারা সচিবালয়ের পরিত্যক্ত অফিসে যাতায়াত বন্ধ করে দেন। ১৯৭১ সালের ৬ ডিসেম্বরের দিক থেকে কোনো অসামরিক সরকার বিদ্যমান ছিল না। ভারতীয় বিমান বাহিনী যখন শহরটিতে আক্রমণ চালায় তখন রাস্তা পরিষ্কার করার কিংবা আহতদের সেবা করার মতো কোনো অসামরিক সংস্থা ছিল না। একমাত্র যে স্থানটিতে কেউ কিছু তৎপরতা দেখতে পারত, সেটা ছিল ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেল, যেখানে আন্তর্জাতিক সংবাদ মাধ্যমের একদল সংবাদদাতা অবস্থান করছিলেন। ঢাকা একটি ভূতুড়ে নগরীতে পরিণত হয়েছিল। মুক্তিবাহিনীর তৎপরতার ভয়ের কারণে বেশির ভাগ সময় ঢাকা থাকত কার্ফিউ-এর অধীনে।

অধিকাংশ পাকিস্তানপন্থী মানুষের মনে তখন আতংক বিরাজ করছিল. তারা পূর্ব বা পশ্চিম যেখানকারই হোক না কেন। মুক্তিবাহিনী ঢাকায় একটি গোপন অফিস প্রতিষ্ঠিত করেছিল–সেটা এমন কি একজন প্রাদেশিক সেক্রেটারির অফিসেও হতে পারে, যিনি হয়তো মুক্তিবাহিনীর পক্ষে কাজ করছিলেন। বেশির ভাগ বিশিষ্ট ব্যক্তিকে টেলিফোনে বা চিঠি লিখে মুক্তি বাহিনী এই মর্মে হুমকি দিয়েছিল যে, যদি তারা 'দখলদার বাহিনী'কে সাহায্য করেন তাহলে তাদেরকে হত্যা করা হবে। সিভিলিয়ান অফিসিয়ালরা তো বটেই, এমন কি আর্মি অফিসারদেরও অনেকে ভীত হয়ে পড়েছিলেন। তারা মুক্তিবাহিনী গণহত্যা করবে বলে আশংকা করছিলেন। অনেক অফিসার ও সৈনিক আমাকে জিজ্ঞেস করেছে, "আপনারা

আমাদের কেন মাংসের কিমা বানাচ্ছেন। দয়া করে কিছু একটা করুন।" যারা কোনো অপরাধ করেছিল তারা বিশেষ করে আতংকগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল।

মুক্তিবাহিনী ঘোষণা দিয়েছিল যে, তারা তাদের ভাষায় পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের ওপর চালিত গণহত্যার প্রতিশোধ নেবে। অবনতিশীল সামরিক পরিস্থিতিতে উর্ধ্বতন কম্যান্ডারদের ও গভর্নরের ওপর জনগনেণর চাপ বাড়ছিল। কিছু একটা করতে হবে। জেনারেল নিয়াজী সন্দেহাতীতভাবে ভেঙে পড়েছিলেন। তার বিবেক পরিষ্কার ছিল না, তার কার্যক্রম বিশুদ্ধ ছিল না, তিনি কর্মফলের জন্য ভীত হয়ে পড়েছিলেন। তিনি একটি পুতুলের মতো হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি তার সকল অশ্লীল রসিকতা এবং উচ্চ দাম্ভিকতা খুইয়ে ফেলেছিলেন। মানুষ তাকে নিজের অফিসেও কাঁদতে দেখেছে। তার কম্যান্ডের অধীনে সকল ফ্রন্ট বিপর্যস্ত হয়ে যাওয়ায় আর্মি কোনো সমাধান যোগাতে পারেনি। সমাধানটি অবশ্যই রাজনৈতিক হতে হবে এবং একমাত্র ইসলামাবাদের কেন্দ্রীয় সরকার ও জাতি সংঘে তার প্রতিনিধিই সে সমাধান দিতে পারতো। জাতির সম্মান তখন বিপদের সম্মুখীন। জাতি সংঘে যদি যুক্তিসংঙ্গত রাজনৈতিকভাবে গ্রহণযোগ্য কোনো প্রস্তাব উপস্থিত করা যেতো তাহলে হয়তো সশস্ত্র বাহিনী আত্মসমর্পণ করার অবমাননার কবল থেকে রক্ষা পেতে পারতো। কিন্তু সেটা ভবিষ্যতের সর্বময় ক্ষমতার জন্য উচ্চাকাঙক্ষীদের পরিকল্পনার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ ছিল না। কেবলমাত্র আর্মির পরাজয়ই তাদের জন্য সর্বময় ক্ষমতার দিগন্ত উন্মোচিত করতে পারত। অংশিদারহীন ক্ষমতার জন্য উন্মাদ লালসার কাছে জাতীয় সম্মান পরাজিত হয়েছিল।

এমন কি পোল্যান্ডের প্রস্তাবকেও জাতি সংঘে আমাদের প্রতিনিধি দলের নেতা ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করেছিলেন। আত্মসমর্পণ ব্যতীত মীমাংসার সকল দরজাই বন্ধ করে দেয়া হয়েছিল। পূর্ব পাকিস্তানে সশস্ত্র বাহিনীর অসম্মানজক পরিণতি নিশ্চিত করার পাশাপাশি হাজার বছরব্যাপী যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার দম্ভপূর্ণ ঘোষণা উচ্চারণ করা হয়েছিল। তারা পূর্ব পাকিস্তানকে রক্ষা করার ব্যাপারে আগ্রহী ছিলেন না। কারণ এক লোক এক ভোটের ফর্মুলা পাকিস্তানের অংশ হিসেবে পূর্ব পাকিস্তানকে সমগ্র পাকিস্তানের ওপর শাসন চালানোর সুযোগ ও অধিকার দিয়েছিল। সেটা সম্ভত হবু ক্ষমতাসীনদের কাছে গ্রহণযোগ্য ছিল না।

যদি গভর্নরের বার্তার কিংবা পোলিশ প্রস্তাবের মূলকথাকে গ্রহণ করা হতো তাহলে ঘটনাপ্রবাহ অনেকটা এ রকম হতে পারতোঃ

ক. যুদ্ধ বিরতির আহ্বান জানিয়ে একটি জাতি সংঘ প্রস্তাব গৃহীত হতো।

খ. সে প্রস্তাব বাস্তবায়নকে নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে একই যোগে আলাপ-আলোচনা শুরু হয়ে যেতো।

আমরা নিশ্চিত ছিলাম যে, জাতিসংঘ প্রস্তাবটি পাস করবে। কারণ এর মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানের সংঘাত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে রাজনৈতিক ধারা অন্তর্ভুক্ত ছিল। ভারতীয়রাও এটা

গ্রহণ করতো। কারণ তারা তখন পর্যন্ত ঢাকায় আমাদের দুর্বলতা সম্পর্কে জানতো না এবং তারা নিজেদের বাহিনীর অনেক বেশি প্রাণহানির আশংকা করছিল। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে বাঙালীরাও একটি রাজনৈতিক সমাধানকে স্বাগত জানাতো, কারণ তারা তখন ভারতীয় দখলের সম্ভাবনার সম্মুখীন হয়ে পড়েছিল।

যুদ্ধ বিরতির পর পাকিস্তান আর্মি নতুনভাবে দলবদ্ধ হওয়ার এবং মোতায়েন হওয়ার জন্য সময় ও সুযোগ পেয়ে যেতো। কেন্দ্রীয় সরকার তখন কি কৌশল গ্রহণ করতে হবে সে সিদ্ধান্ত নিতে পারতো। ভারতীয়রা ১৯৪৮ সালে কাশ্মীরে একটি যুদ্ধ বিরতি পেয়েছিল এবং তারা এখনো ঐ ভূখণ্ডের দখলে রয়েছে। জাতি সংঘের কোনো প্রস্তাবের অত্যাবশ্যকীয় অর্থ এই নয় যে, তার প্রতিটি বিষয়কেই বাস্তবায়িত করতে হবে। যুদ্ধবিরতির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও মীমাংসাসূচক পর্যায়টি অর্জন করা গেলে নতুনভাবে যোগাযোগ- আলোচনা করা যেতে পারে এবং পরিস্থিতিও সামলানো সম্ভব হতে পারে।

এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারটি হলো, এর ফলে আত্মসমর্পণ এড়ানো যেতো। একটি রাজনৈতিক মীমাংসার সকল প্রচেষ্টা বন্ধ করার পর নিয়াজীকে বলা হয়েছিল যে, তিনি আত্মসমর্পণ করতে পারেন। যুদ্ধ বিরতির প্রস্তাব প্রদানের অনুমতি চেয়ে গভর্নরের পাঠানো বার্তাকে বাতিল করার মাত্র তিন দিন পর এটা ঘটেছিল। আত্মসমর্পণের কর্তৃত্ব দিয়ে প্রেসিডেন্টের পাঠানো একটি সিগন্যাল জেনারেল নিয়াজী পেয়েছিলেন। ১৪ ডিসেম্বর সকাল ৯ টায় অনুষ্ঠিত সকালের সম্মেলনে কোর-এর সি ও এস ব্রিগেডিয়ার বকর সিগন্যালটি সকলের মধ্যে বিতরণ করেছিলেন। অ্যাডমিরাল শরীফ, জেনারেল জামশেদ এবং এভিএম ইনামও উপস্থিত ছিলেন। অ্যাডমিরাল শরীফ তার অভিমত ব্যক্তকালে বলেন যে, প্রেসিডেন্ট কেবল অনুমতি দিয়েছেন, এটা কোনো আদেশ নয়। আমি তাকে সমর্থন করে বলেছিলাম, "আপনাদের গণভাবে অর্থাৎ সমগ্র রণাঙ্গন জুড়ে আত্মসমর্পণ করা উচিত হবে না। আপনারা অনুমতি পেয়েছেন, এই অনুমতিটি ডিভিশনাল কম্যান্ডারদের কাছে পাঠিয়ে দিন। যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া হোক এবং কখন যুদ্ধ বন্ধ করতে হবে সে ব্যাপারে ব্যক্তিগতভাবে ডিভিশনাল কম্যান্ডারদের সিদ্ধান্ত নিতে দিন।" নিয়াজী শুনলেন এবং বললেন, "আমি সি ও এস আর্মির সঙ্গে যোগাযোগ করে ব্যাখ্যা জেনে নেবো।"

বিকেল পাঁচটার দিকে নিয়াজী আমাদের জানালেন যে, তিনি জিএইচ কিউ-এর কাছ থেকে খোঁজ নিয়ে জেনেছেন এবং তারা চান তিনি আত্মসমর্পণ করুন। এরপর তিনি আমাদের বললেন, কত অসুবিধার মধ্য দিয়ে তিনি যোগাযোগ করেছেন এবং টেলিফোনে তিনি হামিদ অথবা ইয়াহিয়ার সঙ্গে কথা বলতে চেয়েছিলেন। কিন্তু একমাত্র যাঁর সঙ্গে কথা বলা সম্ভব হয়েছে তিনি হলেন এয়ার মার্শাল রহিম, যিনি মাতাল অবস্থায় ছিলেন এবং প্রেসিডেন্টের বার্তা পৌঁছে দিতে গিয়ে তিনি বলেছেন যে, পশ্চিম পাকিস্তানের পরিস্থিতি

খারাপ এবং নিয়াজীকে আত্মসমর্পণ করতে হবে। বার্তাটির কথা আমাদের জানিয়ে নিয়াজী আমাকে তাঁর সঙ্গে ইউ এস-এর কনসাল জেনারেলের কাছে যেতে বললেন। উদ্দেশ্য, আত্মসমর্পণের আয়োজন করতে তার সাহায্য চাওয়া। আমি বললাম, "আমি আপনার সঙ্গে যাচ্ছি না, কারণ আমি আত্মসমর্পণ করার বিরুদ্ধে। আমি একটি রাজনৈতিক মীমাংসার পক্ষে ছিলাম, কিন্তু তার সময় পার হয়ে গেছে।" তিনি অনুনয় করলেন। তিনি এখন যা-ই বলুন এবং নিজেকে যত বলিষ্ঠ হিসেবেই দেখাতে চান না কেন, ঐ সময় তাঁর অবস্থা ছিল অত্যন্ত করুণ। যাকেই সাহায্য করার যোগ্য মনে করেছেন তার কাছ থেকেই তিনি সে সময় অসহায়ভাবে সাহায্য চাচ্ছিলেন। আমি মুহূর্তের জন্য চিন্তা করলাম। ৪৫, ০০০ সশস্ত্র বাহিনী সদস্যের এবং লাখ লাখ পাকিস্তানপন্থী অসামরিক মানুষের জীবন ও ভাগ্য এখানে জড়িত রয়েছে। আমি সম্ভবত সাহায্য করতে পারি। আমি হয়তো একটি সম্মানজনক মীমাংসার ব্যাপারে আলাপ-আলোচনা চালাতে পারি; একজন প্রায়শই নিজের সম্পর্কে অতিরঞ্জিত ধারণা পোষণ করতে পারে। আমি নিয়াজীর সঙ্গে যেতে রাজি হলাম। কিন্তু আমরা যখন কনসাল জেনারেলের অফিসে পৌঁছলাম, নিয়াজী তখন আমাকে ও তাঁর এডিসি-কে বাইরে রেখে একাই ভেতরে ঢুকলেন। যা-ই হোক, দরজা খোলা থাকায় ইউ,এস-এর কনসাল জেনারেলের কাছে তাঁর অনুনয়-অনুরোধ আমরা শুনতে পাচ্ছিলাম। নিয়াজী একজন বন্ধু হিসেবে তাঁর সাহায্য চাইলেন, জবাবে কনসাল জেনারেল বললেন, "আপনারা কেন যুদ্ধ শুরু করেছিলেন? ইউ এস আপনাদের সাহায্য করতে পারবে না। আমি বড়জোর যা করতে পারি তা হলো, আপনার বার্তাটি ভারতীয়দের কাছে পৌঁছে দিতে পারি। আমি বার্তা প্রেরকের কাজ করবো, যোগাযোগকারীর কাজ নয়। আমাদের বিশ্বব্যাপী যোগযোগ ব্যবস্থা আছে এবং যেখানে যার কাছে বার্তা পাঠাতে চান আপনি পাঠাতে পারেন। আপনি আমাকে একটি লিখিত বার্তা দিন।"

বার্তাটি তৈরি করা হল এবং নিয়াজীর স্বাক্ষরসহ কনসাল জেনারেলের হাতে দেয়া হলো। ইউ এস- এর নিয়ম অনুসারে একজনের স্বাক্ষরের সত্যায়ন একটি প্রয়োজনীয় শর্ত। সে কারণে কনসাল জেনারেল আমাকে নিয়াজীর স্বাক্ষরকে সত্যায়িত করতে বললেন। আমি সত্যায়িত করলাম। এটা কোনো যৌথ বা সম্মত বার্তা ছিল না। বৃটিশ নিয়মানুসারে, যেটা পাকিস্তানেরও নিয়ম, একজন কম্যান্ডারের স্বাক্ষর সত্যায়নের প্রয়োজন পড়ে না এবং তাঁর সকল সিদ্ধান্ত, আদেশ ও যোগাযোগের জন্য তিনিই এককভাবে ও সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকেন। কিন্তু আন্তর্জাতিক সংবাদ মাধ্যমগুলো বার্তাটিকে সামরিক ও অসামরিক কর্তৃপক্ষের যৌথ সিদ্ধান্ত হিসেবে প্রচার করায় বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছিল। পরবর্তীকালের চিন্তা থেকে আমি একথা বলতে পারি যে, নিয়াজী বিষয়টিকে এভাবেই দেখাতে ও প্রচার করতে চেয়েছিলেন। সে সময়ে কোনো অসামরিক কর্তৃপক্ষ বিদ্যমান ছিল না। গভর্নর ১৩ ডিসেম্বর

পদত্যাগ করেছিলেন। ফলে গভর্নরের একজন স্টাফ অফিসার হিসেবে আমারও সকল কর্তৃত্বের অবসান ঘটেছিল। আমাদের পরিভাষায় আমার স্বাক্ষরের অর্থ ছিল নিয়াজীর স্বাক্ষরের সাক্ষী হওয়া। বার্তার মূল কথাগুলো ছিল ঃ (ক) যুদ্ধ বিরতি, (খ) নিশ্চিত কয়েকটি এলাকায় পাকিস্তান আর্মিকে একত্র হতে দেয়ার ব্যাপারে আলোচনা, (গ) পাকিস্তান আর্মির পশ্চিম পাকিস্তানী সদস্যদেরকে তাদের অস্ত্রসহ পশ্চিম পাকিস্তানে প্রত্যাবাসন করতে দেয়া। কোনো আত্মসমর্পণের কথা বলা হয়নি। একটি যোগাযোগকারী দলকে ঢাকায় আসার জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছিল।

আমরা সেনানিবাসে ফিরে এসেছিলাম। আমাকে বলা হয়েছিল যে, আমার উপস্থিতির আর প্রয়োজন নেই এবং কোর-এর সি ও এস পরবর্তী ঘটনাবলী দেখাশোনা করবেন।

১৬ ডিসেম্বর সকাল সাড়ে আটটার দিকে আমি কোর এইচ কিউ-তে গিয়েছিলাম। আমাকে বলা হল যে, জেনারেল মানেকশ'র কাছ থেকে একটি বার্তা পাওয়া গেছে। এতে তিনি একটি বিশেষ সময় পর্যন্ত শর্তসাপেক্ষ যুদ্ধ বিরতির প্রস্তাব দিয়ে বলেছেন যে, ঐ সময়ের পর ভারতীয় আর্মি আবার তাদের আক্রমণ শুরু করবে। পাকিস্তান আর্মিকে অগ্রসরমান ভারতীয় আর্মির কাছে আত্মসমর্পণ করতে হবে। ঠিক তখনই ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীর একটি আক্রমণ কম্যান্ড হেডকোয়ার্টার্সের ওপর পরিচালিত হল। সেখানে আলোড়ন উঠল। "ভারতীয়রা যুদ্ধ বিরতি চুক্তি লংঘন করছে", বললেন কোর এইচ কিউ-এর অফিসাররা। তাঁরা আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, আমি এ ব্যাপারে কিছু করতে পারবো কি না। সৌভাগ্যক্রমে একজন ইউ এন অফিসার কোথাও থেকে সেখানে উপস্থিত হলেন। আমি তাঁকে কোথায় ভুল বা গোলমাল হয়েছে তা দেখতে এবং যুদ্ধ বিরতির সময় সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত বাড়ানো যায় কিনা তার চেষ্টা করতে বললাম। তিনি দিল্লীর সঙ্গে যোগাযোগ করলেন এবং নতুন আয়োজনটি নিশ্চিত করলেন।

এটা ১৬ ডিসেম্বর সকাল সাড়ে ৯ টার দিকের ঘটনা। একটি চিরকুট এল। এটা ছিল জেনারেল নিয়াজীর প্রতি জনৈক ভারতীয় জেনারেল নাগরার একটি বার্তা। এতে তিনি লিখেছিলেন যে, তিনি মীরপুর সেতুতে অর্থাৎ ঢাকার এক প্রান্তে রয়েছেন। তিনি চেয়েছিলেন কর্তৃত্বপূর্ণ কেউ গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করুন। নাগরা কিভাবে ঢাকায় এলেন তা ভেবে সকালে হতবিহ্বল হয়ে পড়লেন, কিন্তু ঘটনাটি একই সঙ্গে ঢাকার প্রতিরক্ষার অবস্থাও যথেষ্ট উন্মোচিত করেছিল।

কাগজের এই ছোট্ট টুকরোটি ব্রিগেডিয়ার বকর নিয়াজীর হাতে দিলেন, যিনি সেটা পড়ার পর একটি শব্দও উচ্চারণ না করে আমার হাতে তুলে দিয়েছিলেন। আমি ও অ্যাডমিরাল শরীফ পড়লাম। আমি নিয়াজীকে প্রশ্ন করলাম, "তিনি-ই কি নিগোশিয়েটিং টিম?" আমি তখনো ভাবছিলাম, মানেকশ'র কাছে পাঠানো আমাদের টেলেক্স বার্তায়

বর্ণিত মূল প্রস্তাবনার ধারাক্রম হয়তো অনুসৃত হচ্ছে যাতে প্রথমে যুদ্ধ বিরতির পর আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে এমন একটি সমঝোতার আসার কথা বলা হয়েছিল যার ফলে সম্মত কিছু এলাকায় পাকিস্তান আর্মিকে একত্র হতে দেয়া হবে। সে কারণেই আমি জানতে চেয়েছিলাম যে, এই জেনারেলই নিগোশিয়েটিং টিমের নেতৃত্ব করছেন কিনা। কেউ জানত না, কিভাবে নাগরা তাঁর ট্রুপসসহ ঢাকার এত কাছে চলে এসেছিলেন। স্পষ্টতই তিনি আলোচনাকারী ছিলেন না। আমি তখন নিয়াজীকে প্রশ্ন করলাম, "আপনার প্রতিরক্ষা শক্তি কতটুকু রয়েছে?" আমি যেহেতু কম্যান্ড চ্যানেলে ছিলাম না, সেজন্য ঢাকার প্রতিরক্ষার শক্তি সম্পর্কে আমার কোনো ধারণা ছিল না। আলোচনা ও দরকষাকষির দৃষ্টিকোণ থেকে নিশ্চিতভাবেই এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। আলোচনা চলাকালে যদি প্রতিরোধ চালানো যায়, তাহলে একজনের পক্ষে বেশি সুবিধাজনক শর্ত আদায় করা সম্ভব হয়। জেনারেল নিয়াজী নীরব থাকলেন, যেমনটি গত তিনদিন ধরে তিনি রয়েছেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, "আপনি কতক্ষণ প্রতিরোধ করতে পারবেন?" এ প্রসঙ্গে অ্যাডমিরাল শরীফ পাঞ্জাবীতে জানতে চাইলেন, "আপনার কি কিছু রয়েছে?" নিয়াজী ঢাকার কম্যান্ডার জামশেদের দিকে তাকালেন, যিনি না-সূচকভাবে মাথা নাড়ালেন। এরপর আমি বললাম, "আমি কোনো পরামর্শ দিতে পারবো না। যান এবং আপনার যা ইচ্ছা তাই করুন।" জেনারেল নিয়াজী জামশেদকে গিয়ে ভারতীয় জেনারেলের সঙ্গে দেখা করতে বললেন। জামশেদ মাথায় ক্যাপ পরলেন এবং চলে গেলেন।

সেদিনই কোলকাতা থেকে আগত এক বার্তায় জানানো হল যে, জেনারেল জ্যাকবের নেতৃত্বে দুপুর ১২টার দিকে একটি নিগোশিয়েটিং টিম ঢাকায় আসবে। আমাদেরকে ঐ সময় আবার মিলিত হওয়ার কথা বলে বিদায় দেয়া হল এবং জানানো হল যে, কোর এইচ কিউ তাদের স্বাগত জানানোর বিষয়গুলো দেখাশুনা করবে। আমি যেহেতু কোনো দায়িত্বে বা অফিসে ছিলাম না, সেজন্য আমার ঘরে ফিরে গেলাম। দুপুর ১২টার দিকে কোর কম্যান্ড পোস্টে আবার এসে আমি দেখলাম স্থানটি পরিত্যক্ত হয়ে গেছে। কি ঘটেছে ভেবে আমি অবাক হয়ে গেলাম। ভাবলাম হয়তো নিগোশিয়টিং টিমের আসতে কিছুটা বিলম্ব হবে। আমি তাই বসলাম এবং অপেক্ষা করতে থাকলাম। কিছুক্ষণ পর একজন অফিসার এলেন। তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, কম্যান্ডার এবং অন্যারা সবাই কোথায় গেছেন? শ্লেষাত্মক ও বৈরীভাবে তিনি বললেন, 'ভারতীয়দেরকে তারা কোর এইচ কিউ-এর পর্দা এবং আসবাবপত্র দেখাচ্ছেন।'

সুতরাং আমি কোর হেডকোয়াটার্সের শান্তিকালীন ভবনে গেলাম। কোর হেডকোয়ার্টার্সের বাইরে ভারতীয় সেনাবাহিনীর একটি ডিটাচমেন্টকে দেখে আমি বিস্মিত হলাম। এর ফলে বোঝা গেল যে, জেনারেল জামশেদ তাদেরকে ঢাকায় প্রবেশ করতে

দিয়েছেন। আমি ভাবলাম, ভারতীয়দের সঙ্গে একটি অর্থবহ আলোচনার এটাই সমাপ্তি; শত্রুবাহিনী চারদিকে থাকার পর কারো পক্ষে কিভাবে আলোচনা চালানো সম্ভব ? প্রকৃতপক্ষে এর অর্থ ছিল ঢাকা গ্যারিসন ইতিমধ্যেই আত্মসমর্পণ করেছে।

জেনারেল নিয়াজীর অফিসে প্রবেশ করে যে দৃশ্য দেখলাম তা আমাকে ভীতিবিহ্বল করে তুললো। জেনারেল নিয়াজী তার চেয়ারে বসে আছেন, তার সামনে জেনারেল নাগরা রয়েছেন এবং একজন জেনারেলের পোশাকে রয়েছেন মুক্তিবাহিনীর টাইগার সিদ্দিকীও। নিয়াজী খুব আমুদে মেজাজে ছিলেন এবং তিনি উর্দু কবিতার শ্লোক আবৃত্তি করছিলেন। আমি স্যালুট করলাম এবং অ্যাডমিরাল শরীফের পাশের চেয়ারে বসলাম, যিনি আগেই সেখানে এসেছিলেন। শুনলাম নিয়াজী নাগরাকে জিজ্ঞেস করছেন তিনি উর্দূ কবিতা বোঝেন কিনা। জবাবে নাগরা জানালেন যে, তিনি লাহোর সরকারি কলেজ থেকে ফার্সীতে এম. এ. পাশ করেছেন। নাগরা যেহেতু নিয়াজীর চাইতে বেশি শিক্ষিত ছিলেন, নিয়াজী তাই পাঞ্জাবীতে রসিকতা করতে শুরু করলেন। নিয়াজী তার আগের চরিত্রে ফিরে গিয়েছিলেন। বিগত ১০ দিন ধরে তিনি ভগ্নহৃদয়, গোমড়া ও শান্ত ছিলেন। কিন্তু এখন মনে হল সকল চাপ নেমে গেছে। আমার মতে তিনি অত্যন্ত লজ্জাকর রীতিতে আচরণ করছিলেন। শত্রুর সঙ্গে যখন আত্মসমর্পণের শর্তাবলী নিয়ে আলোচনা করতে হবে তখন তাঁর গম্ভীর ও সম্মানিত ব্যক্তির মতো থাকা প্রয়োজন ছিল। পরিবর্তে তিনি অমার্জিত ও উল্লাসময় আচরণ করছিলেন- ভারতীয়দের বলছিলেন অশ্লীল রসিকতার গল্প, যেন তারা তাঁর হারানো অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিল।

ব্রিগেডিয়ার সিদ্দিকী ও একজন শিখ কর্নেল ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে কোনো বিষয়ে আলোচনা করছিলেন। আমি বসার পর আমার হাতে একটি কাগজ দিয়ে বকর বললেন, "এগুলো আত্মসমর্পণের শর্ত।" আমি সেটা পড়লাম এবং দেখলাম যে, যে বাহিনীর কাছে পাকিস্তান আর্মিকে আত্মসমর্পণ করতে হবে, সেখানে ভারতীয় সেনাবাহিনীর সঙ্গে মুক্তিবাহিনীকেও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। আমি বকরকে বললাম, "এটা আমার কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। আমরা আত্মসমর্পণ করছি না, আমরা আলোচনা করছি। ঘটনা যা-ই হোক না কেন, দয়া করে মুক্তিবাহিনী শব্দ দু'টি মুছে ফেলুন।" এ সময় পাইপ মুখে নিয়ে জেনারেল জ্যাকব প্রবেশ করলেন এবং বললেন, "এটা এভাবেই দিল্লী থেকে এসেছে। আপনি এটা মেনে নিন অথবা ছেড়ে দিন।" আমি বললাম. "এটা কম্যান্ডারের ব্যাপার, তিনি সিদ্ধান্ত নেবেন।" নিয়াজী আত্মসমর্পণের শর্তাবলী অনুমোদন করে মাথা নাড়ালেন।

অ্যাডমিরাল শরীফ ও আমি উঠে দাঁড়ালাম এবং বাইরে চলে এলাম। আমরা লক্ষ্য করলাম, ভারতীয়রা কিছু চেয়ার ও একটি টেবিলের খোঁজ করছে। আমরা বুঝলাম, তারা কোনো অনুষ্ঠান আয়োজন করতে চাচ্ছে। আমরা দু'জনই নিয়াজীর কাছে গেলাম এবং

তাঁকে বললাম যে, ভারতীয়রা একটি আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি নিচ্ছে। আমরা বললাম, "আপনার এতে যোগ দেয়া উচিত হবে না, আত্মসমর্পণ করা হয়ে গেছে। তারা আমাদের বন্দী হিসেবে নিতে পারে, আমাদের পেটাতে বা হত্যা করতে পারে। তাদের যা ইচ্ছা করুক। দয়া করে কোনো অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন না।" কিন্তু তিনি যোগ দিয়েছেন এবং আত্মসমর্পণের দলিলে স্বাক্ষর করেছেন।

ফলে আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠিত হয়েছিল, এমন একটি আত্মসমর্পণ যা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে রাজনৈতিক পদক্ষেপের মাধ্যমে এড়ানো যেত।

বন্ধু ও শত্রু

১৯৭১ সালে পূর্ব পাকিস্তানে যা ঘটেছিল তার সঙ্গে ভারত, সোভিয়েট ইউনিয়ন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও চীন–এই চারটি দেশ জড়িত ছিল, কেউ ঘনিষ্ঠভাবে এবং অন্যরা পরোক্ষভাবে। প্রথমোক্ত দেশ দুটি পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছিল, পাকিস্তানের বন্ধু হিসেবে পরিচিত বাকি দুটি দেশ আমাদের শীর্ষ নেতৃত্বের অপটু পরিচালনার কারণে নিরপেক্ষ অবস্থান নিয়েছিল।

ভারতীয় নেতৃত্ব অত্যন্ত অনীহার সঙ্গে পাকিস্তানের সৃষ্টিতে সম্মত হয়েছিলেন এই আশায় যে, নতুন দেশটি ছয় মাসের বেশি টিকে থাকতে পারবে না। তারা এর ভাঙনকে ত্বরান্বিত করার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করেছিলেন। রাজনৈতিকভাবে তারা মাউন্টব্যাটেনকে দিয়ে যতটা সম্ভব পাকিস্তানকে ছেঁটে ছোট করেছিলেন। অর্থনৈতিক দিক থেকে পঞ্চাশ কোটি রুপীর হিস্যা তারা যতদিন সম্ভব আটকে রেখেছিলেন যাতে দেশটির অর্থনৈতিক পতন ঘটে। মিলিটারি ফ্রন্টে তাঁরা সেই সব লোকজনকে ভারত, সিঙ্গাপুর ও ইন্দোনেশিয়ায় যতদিন সম্ভব আটকে রেখেছেন, যাদের দিয়ে পাকিস্তান আর্মি গঠিত হওয়ার কথা ছিল। পরে তাদের মুক্তি দেয়া হলেও খণ্ডিতভাবে বা ভাগে ভাগে ছাড়া হয়েছিল। শরণার্থীদের এক বিরাট বোঝা চাপানো হয়েছিল পাকিস্তানের ওপর। অর্থনৈতিক বিপর্যয় ঘটানোর উদ্দেশ্যে দেশত্যাগী হিন্দুরা তাদের সঙ্গে সকল অর্থ নিয়ে গেছে। পাকিস্তানের টিকে যাওয়াটা এর সৃষ্টির মতোই ছিল এক অলৌকিক ঘটনা।

পাকিস্তানকে ধ্বংস করার লক্ষ্যে সকল ফ্রন্টেই ভারতীয় আক্রমণ চলেছে। উপমহাদেশের বিভক্তির গৃহীত নীতিমালার বিরুদ্ধে গিয়ে কাশ্মীর দখলের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণরূপে একটিই ছিল– পাকিস্তানের আদর্শগত ভিত্তি এবং তার নিরাপত্তাকে নিশ্চিত করার সকল সম্ভাবনাকে ধ্বংস করে দেয়া। বাহওয়ালপুর ও পাঞ্জাবে খালের পানি বন্ধ করাও ছিল একই কৌশলের অংশ। আন্তর্জাতিকভাবে পাকিস্তানকে সাম্রাজ্যবাদের সৃষ্টি ইত্যাদি গালাগালের মাধ্যমে ভারত পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার চেষ্টা চালিয়েছে। পাকিস্তান অবশ্য নিজের অস্তিত্ব ও উন্নয়ন উভয়ের জন্যই আন্তর্জাতিক সমর্থন অর্জনে সমর্থ হয়েছিল। ভারতীয়রা শেষ পর্যন্ত সশস্ত্র যুদ্ধের চূড়ান্ত

অস্ত্রটিকে অবলম্বন করেছে এবং লাহোর অঞ্চলে আর্ন্তজাতিক সীমান্ত অতিক্রম করে ১৯৬৫ সালের যুদ্ধ আরম্ভ করেছে। পাকিস্তান আর্মি জনগণের সমর্থন নিয়ে ভারতীয় পরিকল্পনা ব্যর্থ করে দিতে সক্ষম হয়েছিল।

পাকিস্তানের প্রতি ভারতীয় মানসিকতা সম্পর্কে একটি যথার্থ বর্ণনা দিয়েছেন পাশ্চাত্যের একজন ঐতিহাসিক-কিভাবে ভারতীয়রা পাকিস্তানের সমাপ্তি ঘটাতে চেয়েছিল। ''ইন্ডিয়া, পাকিস্তান অ্যান্ড বিগ পাওয়ার' গ্রন্থে বিষয়টির ওপর লিখতে গিয়ে উইলিয়াম জে বার্নডস ভারতীয় নেতৃবৃন্দের চিন্তাধারা বিশ্লেষণ করেছেন এভাবে : "ভারতীয় নেতারা নিশ্চিত ছিলেন যে, পাকিস্তান একটি জাতি হিসেবে টিকে থাকতে পারবে না। দেশের দুই প্রদেশের মধ্যে দূরত্ব ও পার্থক্য, শিক্ষিত প্রতিভাবানদের স্বল্পতা এবং প্রাকৃতিক সম্পদে দেশটির ভবিষ্যতের ব্যাপারে আস্থার প্রেরণা যোগায় নি। উপরন্তু ভারতীয় নেতারা বিশ্বাস করতেন যে, এটা টিকে থাকতে পারবে না, কারণ এর টিকে থাকা উচিত নয়।" বার্নডস-এর ভাষায় নেহরু পাকিস্তানকে 'একটি অসম্ভব মোল্লাতান্ত্রিক ধারণাভিত্তিক এক মধ্যযুগীয় রাষ্ট্র' হিসেবে বর্ণনা করে ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেনঃ "পাকিস্তানের সঙ্গে যতটা ঘনিষ্ঠভাবে সম্ভব সহযোগিতা রাখা অত্যন্ত স্বাভাবিক হবে এবং একদিন অঙ্গীভূতকরণ ঘটবে। এটা চার, পাঁচ কিংবা দশ বছরে ঘটবে কিনা আমি জানি না।" নেহরুর উপরোক্ত বক্তব্য উদ্ধৃত করতে গিয়ে বার্নডস প্রশ্ন করছেন. "ভারতীয় অফিসিয়ালরা কিভাবে দু'দেশের পুনর্মিলনের ছবি এঁকেছিলেন সেকথা পরিষ্কার নয়।"

আর্ন্তজাতিক সম্প্রদায়কে কেবল নয়, নিজের দেশের জনগণকেও নেহরু প্রতারিত করার চেষ্টা করেছিলেন। 'পাকিস্তানের সঙ্গে যতটা ঘনিষ্ঠভাবে সম্ভব সহযোগিতা রাখা' নেহরুর কর্মসূচী ছিল না, বরং পাকিস্তানকে মাথা নত করতে বাধ্য করা এবং সমগ্র পৃথিবী থেকে যত বেশি সম্ভব শক্তি সংগ্রহ করে সেই শক্তি পাকিস্তানের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করাই ছিল নেহরুর পরিকল্পনা। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে শক্তি প্রয়োগের কর্মসূচীর সূচনা হয়েছিল দেশ দুটি সৃষ্টি হওয়ার অব্যবহিত পরেই এবং ১৯৪৭ সালে জম্মু ও কাশ্মীরের মুখ্য মন্ত্রী এবং পরবর্তীকালে ভারতের প্রধান বিচারপতি মেহের চান্দ মহাজনের ভাষায়'জেনারেল বলবন্ত সিং-এর হেডকোয়ার্টার্সে ১৯৪৭ সালেই সরদার প্যাটেলের উদ্যোগে অমন একটি সিদ্ধান্ত (পাকিস্তান আক্রমণ) নেয়া হয়েছিল। এই সভায় যোগ দিয়েছিলেন ভারতের প্রতিরক্ষামন্ত্রী সরদার বলদেব সিং, জেনারেল কে এস থিমাইয়া, পাটিয়ালার মহারাজা, নওয়ানগরের জাম সাহেব, প্রয়াত মহারাজা হরি সিং, বকশি গোলাম মুহাম্মদ, কাশ্মীরের এনার্জি প্রশাসনের উপপ্রধান এবং কিছু সংখ্যক উচ্চ পদস্থ মিলিটারি অফিসার। গেরিলাদের রিক্রুট করার ও প্রশিক্ষণ দেয়ার জন্য জেনারেল থিমাইয়াকে এবং গ্রহণীয় পদক্ষেপের পরিকল্পনা করার জন্য মিলিটারি হেড কোয়ার্টার্সকে অনুরোধ করা হয়েছিল।'

ভারতীয়রা অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও মিলিটারি কৌশলের প্রায় সকল ক্ষেত্রেই ব্যর্থ হয়েছিল এবং সে কারণে তারা মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধের দিকে তাদের কৌশলের দিক পরিবর্তন করেছিল। এই উদ্দেশ্যে যে অঞ্চলটিকে বেছে নেয়া হয়, তা ছিল পূর্ব পাকিস্তান।

এ ব্যাপারে তারা সেখানে বসবাসরত হিন্দুদের সহযোগিতা নিয়েছিল, বিশেষ করে শিক্ষা ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রসহ নির্দিষ্ট কতগুলো ক্ষেত্রে নিজেদের অশুভ প্রভাব বিস্তার করার মতো অবস্থানে ঘটনাক্রমে এই হিন্দুরা ছিল। তাদের মাধ্যমে ভারতীয়রা পূর্ব পাকিস্তানীদের মনকে পশ্চিম পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বিষিয়ে তুলতে শুরু করেছিল। এটাই ছিল সেই এলাকা যেখানে ভারতীয়রা সাফল্য অর্জন করতে পেরেছিল। পূর্ব পাকিস্তানের বিশেষ কতিপয় নেতা এ ধরনের প্রচারণা গ্রহণে উন্মুখ হয়ে উঠেছিলেন এই আশায় যে, এটা ক্ষমতা অর্জনে তাঁদের সাহায্য করবে। এর ফলাফল ছিল আন্দোলনের জন্ম, ভাষা দাঙ্গা, পশ্চিম পাকিস্তানীদের হত্যাকাণ্ড এবং শেষ পর্যন্ত বল প্রয়োগের মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তান দখল করার ষড়যন্ত্রকে এগিয়ে নেয়া। পাকিস্তানের শাসকরা কোনোদিনই পরিস্থিতির ভয়াবহতা উপলব্ধি করতে পারেন নি, তারা বরং ক্ষমতায় পূর্ব পাকিস্তানীদের ন্যায়সঙ্গত হিস্যাকে অস্বীকার করার মধ্য দিয়ে আগুনে আরো ইন্ধন যুগিয়েছেন।

১৯৬৫ সালের যুদ্ধের সময় ভারতীয়রা কোনভাবেই পূর্ব পাকিস্তানকে আক্রমণ চালানোর মতো অবস্থায় ছিল না। কারণ পাকিস্তান আর্মির এক ডিভিশন (১৪ ডিভিশন)-এর বিরুদ্ধে হামলা চালানোর জন্য তার কাছে মাত্র একটি ডিভিশন (৯ম ডিভিশন) তৈরি ছিল। তারপরও আমাদের কিছু কিছু নেতা পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিরক্ষার জন্য চীনকে কৃতিত্ব দিয়েছিলেন। এই বিষয়টিকে পুরোপুরি সদ্ব্যবহার করে ভারতীয়রা পূর্ব পাকিস্তানীদের বুঝিয়েছিল যে, পাকিস্তানের সঙ্গে তাদের থাকাটা অর্থহীন।

১৯৭০-এর নির্বাচনের পর জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত করা হয়, যার পরিণতি ছিল মিলিটারি অ্যাকশন। আওয়ামী লীগ নেতৃত্ব স্বাধীন বাংলাদেশের ঘোষণা দেন এবং কোলকাতা চলে যান। ভারতীয়রা তাদেরকে সকল সুযোগ-সুবিধার যোগান দেয়। তারা হিন্দুদেরকে পূর্ব পাকিস্তান থেকে বেরিয়ে আসতে এবং সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে চলে যেতে বলে, যেখানে আগে থেকেই তাদের স্বাগত জানানোর এবং থাকার আয়োজন করা হয়েছিল। এর পরপর অনতিবিলম্বে অন্তত তিন ডজন প্রশিক্ষণ শিবিরে বিপুল সংখ্যায় মুক্তিবাহিনীর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়, যার দায়িত্বে ছিলেন নিয়মিত আর্মির একজন মেজর জেনারেল। এমন কি নিয়মিত আর্মি অফিসারদের ট্রেনিং স্কুলগুলোকেও পূর্ব পাকিস্তানের বিদ্রোহী অফিসারদের প্রশিক্ষণের জন্য ব্যবহার করা হয়েছিল।

এটাকে একটি প্রতিবেশী দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ হিসেবে বিবেচনা করা হয়নি। ভারত উল্টো এই বলে শোরগোল তুলেছিল যে, শরণার্থীদের বোঝা তার অর্থনীতিকে বিপর্যস্ত করছে এবং দর কষাকষির পর্যায়ে সে তার অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বিলিয়ন ডলারের সাহায্য পেয়ে গেছে। ভারতীয় সরকার ভারতের অভ্যন্তরে এবং বিশ্বব্যাপী পাকিস্তানকে নিন্দিত করার উদ্দেশ্যে নৃশংসতার মনগড়া কাহিনী প্রচার করতে থাকে এবং পাকিস্তানকে একটি দুষ্কৃতকারী ও অসভ্য, বরং বর্বর একটি জাতি হিসেবে চিত্রিত করে। তথ্য মাধ্যমের ওপর নিয়ন্ত্রণ থাকায় ইহুদীরা সর্বাত্মকভাবে ভারতকে প্রচারণায় সহযোগিতা করেছিল।

পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ব্যাপারে সক্রিয় সোভিয়েট সমর্থন জয় করার পর ভারতের গৃহীত অবস্থানের ন্যায্যতা সম্পর্কে অন্য জাতিদেরকে বোঝানোর উদ্দেশ্যে মিসেস ইন্দিরা গান্ধী বিশ্ব সফরে বেরিয়েছিলেন। তিনি এত বেশি ধূর্ত ও প্রতারণাপূর্ণ ছিলেন যে, মার্কিন প্রেসিডেন্ট নিক্সনকে তিনি যখন তার শান্তিপূর্ণ পরিকল্পনার ব্যাপারে আশ্বস্ত করছিলেন, তাঁর সেনাবাহিনী তখন এমন এক প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে আক্রমণ পরিচালনার উদ্দেশ্যে পূর্ব পাকিস্তানের চারদিকে সমাবেশ ঘটিয়েছিল, যে প্রতিবেশীটি দুর্ভাগ্যক্রমে তখন অভ্যন্তরীণ সমস্যায় জর্জরিত এবং ইতিহাসের ঐ বিশেষ সময়টিতে যে দুর্বল ছিল।

মিস্টার সুব্রামনিয়মের নেতৃত্বে ভারতীয় কৌশলবিদরা অম্লানবদনে ভারত সরকারকে 'শতাব্দীর সুযোগটিকে কাজে লাগানো'র উপদেশ দিয়েছিলেন। অবশ্য কিছু সংখ্যক ব্যক্তি উপ-জাতীয়তাবাদকে সমর্থনের বিপদ সম্পর্কেও সতর্ক করে দিয়েছিলেন। কারণ সে ক্ষেত্রে ভারতের জাতিগুলোও স্বাধীন মর্যাদার দাবি উপস্থাপন করবে এবং যার ফলে ভেতর থেকে অন্তত এক ডজন রাষ্ট্রের সৃষ্টি ঘটবে। কিন্তু মিসেস গান্ধী ১৯৭২ সালে অনুষ্ঠেয় সাধারণ নির্বাচনে জয় লাভ করতে চেয়েছিলেন এবং পূর্ব পাকিস্তানে একটি সহজ বিজয় অর্জন করা তার দরকার ছিল, যা তিনি দেখতে পাচ্ছিলেন এবং যার প্রলোভন কোনো রাজনীতিবিদের পক্ষেই হাতছাড়া করা সম্ভব নয়।

ভারতীয়দের বিশ্বশক্তিতে পরিণত হওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে। হিন্দুকুশ থেকে ইন্দোনেশিয়ার বালি পর্যন্ত ভূমি নিয়ন্ত্রণ করার এবং আফ্রিকার পূর্বাঞ্চলীয় উপকূলসহ সমগ্র ভারত মহাসাগরের ওপর প্রভাব বিস্তার করার জন্য তাদের স্বপ্ন রয়েছে। তারা নিজেদেরকে বৃটিশ সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারী হিসেবে বিবেচনা করে এবং মনে করে যে, সমরকন্দ ও বুখারার প্রাক্তন এশিয়াটিক রাজ্যসহ মধ্যপ্রাচ্য, বিশেষ করে ইরান–ইরাকের ওপর প্রভাব খাটানোর অধিকার তাদের রয়েছে। তারা মনে করত যে, পূর্ব দিকে প্রভাব বিস্তারের পথে পূর্ব পাকিস্তান এবং পশ্চিমে অগ্রসর হওয়ার ক্ষেত্রে পশ্চিম পাকিস্তান তাদের জন্য প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে। পাকিস্তানকে উচ্ছেদ করারই তাদের চূড়ান্ত লক্ষ্য। তাদের হাতিয়ার হবে মনস্তাত্ত্বিকঃ অভ্যন্তরীণ সংঘাত ও গণআন্দোলনের মাধ্যমে তারা পাকিস্তানকে দুর্বল করবে এবং তারপর বিদ্রোহী লোকজনদের সমর্থন দেয়ার জন্য পাঠাবে তাদের সেনাবাহিনীকে।

ভারতীয়রা পাকিস্তানকে আত্তীভূত করার ব্যাপারে আগ্রহী নাও হতে পারে। তারা হয়তো দক্ষিণ এশিয়ার শ্রেষ্ঠতম শক্তি হিসেবে বিবেচিত ও গৃহীত হতে চায় এবং চায় যে, এই অঞ্চলের সকল দেশ তাদের আধিপত্যের অধীনে আসুক। তারা চারটি দুর্বল ও ক্ষুদ্র মুসলিম রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাকে স্বাগত জানাবে। এ রকম ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের সংখ্যা যত বেশি হবে, তত দুর্বল হবে মুসলমানদের প্রভাব ও শক্তি।

এ সব কিছুর পেছনে যে বিবেচনাটি সর্বোচ্চ হিসেবে ছিল এবং রয়েছেও, তা হল পাকিস্তানকে দুর্বল করে ফেলা, একে ছোট ছোট টুকরো করা। এর সূচনা হয়েছিল কাশ্মীরকে

দখল করার মধ্য দিয়ে এবং দ্বিতীয় পর্যায়টি চূড়ান্ত করা হয়েছিল ১৯৭১ সালের ডিসেম্বরে, বল প্রয়োগ করে পূর্ব পাকিস্তানকে তার পশ্চিমের অংশ থেকে বিচ্ছিন্ন করার মাধ্যমে। প্রকাশ্য দিবালোকে প্রকাশ্যে ডাকাতির মতো এই কাজ করার পাশাপাশি ভারতীয় লেখক ও বিশ্লেষকরা অচিরেই একে বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছিলেন, "এটা ভারতের দ্বিতীয় স্বাধীনতা, ২৫ বছর আগে অর্জিত স্বাধীনতাকে আরো এক ধাপ সামনের দিকে এগিয়ে নেয়া।" বাংলাদেশের সৃষ্টিতে নিজেদের ভূমিকা স্বীকার করতে গিয়ে ভারতীয়রা তাদের লজ্জার মুখোশকে গোপন করেন নি, বরং জোর দিয়ে বলেছেন, "এ ভাবে যুদ্ধ জয়ের মাধ্যমে ভারত অতীতের যে কোন সময়ের তুলনায় নিজেকে অনেক বেশি নিরাপদ করেছে।" সময় সম্ভবত একে ভিন্ন চেহারা দেবে।

পাকিস্তানকে তারাই 'পঙ্গু' হিসেবে বিবেচনা করত, যারা একে একটি অসম্ভবে পরিণত করার জন্য কঠোর সংগ্রাম করেছে, বিশেষ করে হিন্দু ও ইংরেজরা ছিল এ ব্যাপারে বেশি সক্রিয়। উপমহাদেশকে ভারত ও পাকিস্তানে বিভাগকালে পাকিস্তানকে অরক্ষিত বা আক্রম্য করার উদ্দেশ্যে সকল প্রচেষ্টাই চালানো হয়েছিল। এর অরক্ষণীয়তা ও জনসংখ্যার ভিত্তিতে যে অঞ্চল নিয়ে গঠিত হওয়ার কথা ছিল তার তুলনায় ক্ষুদ্রতা সত্ত্বেও পাকিস্তানকে উপেক্ষা করা সম্ভব হয়নি। যে প্রক্রিয়ার ফলে পাকিস্তান সৃষ্টি হয়েছিল এবং যে স্বপ্ন- কল্পনা দক্ষিণ এশিয়ার মুসলমানদের পৃথক আবাসভূমি সৃষ্টির সংগ্রামে অনুপ্রাণিত করেছিল তা ছিল সে যুগের এক নতুন ঘটনা- যে যুগটি সংকীর্ণ ভৌগোলিক ধারণার ভেতরে নতুন নতুন জাতি রাষ্ট্রের অভ্যুদয় প্রত্যক্ষ করছিল। পাকিস্তান গঠিত হয়েছিল ধর্ম, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও ইতিহাসের ভিত্তিতে জাতীয়তার মতবাদের ওপর এবং তার ফলে একটি নতুন বিস্ময়কর বিষয় হিসেবে বিবেচিত হয়েছিল। এ কারণেই কোনো শক্তিই এমন একটি দেশের জন্মকে উপেক্ষা করতে পারেনি। যে দেশটি পৃথিবীর বুকে একটি প্রজাতি হিসেবে মানুষের অগ্রগতির ক্ষেত্রে নিজের অবদানের ব্যাপারে পেছনের দিকে তাকানোর মতো যোগ্যতা রাখতো। স্পষ্টত এ জন্যই ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট সংখ্যা লন্ডনের 'দ্য টাইম' তার সম্পাদকীয়তে পাকিস্তানের জন্মের প্রশংসা করেছিল। পত্রিকাটি লেখে, "সৃষ্টিকালে পাকিস্তান মুসলিম বিশ্বের নেতৃস্থানীয় দেশ হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। তুর্কী সাম্রাজ্যের পতনের পর মরক্কো থেকে ইন্দোনেশিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত এই মুসলিম বিশ্বে এমন কোনো দেশ অন্তর্ভুক্ত হয়নি, যার সংখ্যা, প্রাকৃতিক সম্পদ ও ইতিহাসের অবস্থান তাকে অবিসংবাদিত শ্রেষ্ঠতা দেবে। সেই শূন্যতা এবার পূর্ণ হল। আজ থেকে করাচী মুসলিম ঐক্যের নতুন কেন্দ্রের অবস্থান গ্রহণ করেছে এবং মুসলিম ধ্যান-ধারণা ও আকাঙ্ক্ষার মিলন স্থলে পরিণত হচ্ছে।"

এটা ছিল পাকিস্তানের সেই 'ইতিহাসের স্থান' যা বৃহৎ শক্তিবর্গকে নতুন এই বিষয় ও ঘটনার প্রতি গুরুত্বসহকারে দৃষ্টি ফেরাতে বাধ্য করেছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়ন উভয়ই পাকিস্তানকে নিজেদের সান্নিধ্যে নিতে অথবা সম্ভব হলে তৎকালীন ভাষায় ও অর্থে নিজেদের কক্ষপথে নিতে চেয়েছিল। পাশ্চাত্যের উন্নত ও মুক্ত সমাজের নেতা থাকায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষেত্রে কোনো জটিলতার বিষয় ছিল না। পাকিস্তান তার নিজের নিরাপত্তা ও

অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য উদ্বিগ্ন ছিল এবং সে কারণে আমেরিকার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হওয়ার ব্যাপারে তার কোনো বাধা বা অনীহার কারণ ছিল না। প্রকৃত সমস্যা ছিল সোভিয়েত ইউনিয়ন, যে কোনো এক বা অন্য দেশের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার ক্ষেত্রে আদর্শকে প্রধান মাপকাঠি হিসেবে বিবেচনা করত। সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে পাকিস্তান ও ভারত যখন জন্ম নিচ্ছিল, তখনো সে লৌহ যবনিকা ক্রিয়াশীল ছিল।

এই সব আদর্শগত অসুবিধা সত্ত্বেও বিদেশ সফরের আয়োজনকালে প্রধান মন্ত্রী লিয়াকত আলী খান মস্কোকে অগ্রাধিকার দিতে চেয়েছিলেন। মস্কো সফরের বিষয়টি এগিয়ে নিয়েছিলেন রাজা গজনফর আলী খান। কমনওয়েলথ প্রধান মন্ত্রীদের সম্মেলন থেকে প্রত্যাবর্তনকালে লিয়াকত আলী খান তেহরানে যাত্রা বিরতি করেন। তাঁর সম্মানে আয়োজিত ভোজসভায় রাজা গজনফর আলী খান সোভিয়েট চার্জ ডি অ্যাফেয়ার্সকেও আমন্ত্রণ জানান। এখানেই প্রধান মন্ত্রী তাঁর মস্কো সফরের আগ্রহ ব্যক্ত করে ইঙ্গিত দেন যে, একটি আনুষ্ঠানিক আমন্ত্রণ পেলে তিনি মস্কো যাবেন। এই আমন্ত্রণটি জুন মাসে পাওয়া যায়। তারিখ চূড়ান্ত করা হয় এবং সোভিয়েট সরকারের ব্যক্ত ইচ্ছানুসারে মিঃ শোয়েব কোরেশীকে মস্কোতে পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত নিয়োগ করা হয়। কিন্তু কোথাও কোনো গোলমাল হয়ে যায় এবং তারিখগুলোকে রুশরা পাকাভাবে নিশ্চিত করেনি। ১৯৪৯ সালের অক্টোবরে করাচী ও মস্কোর মধ্যকার যোগাযোগ চ্যানেলকে আকস্মিকভাবে তেহরান থেকে নতুন দিল্লীতে স্থানান্তরিত করা হয়। এবার নতুন দিল্লীস্থ সোভিয়েট দূতাবাস থেকে আরো এক দফা মুলতবির খবর করাচীকে জানানো হয়। এর ফলে এমন সন্দেহের সৃষ্টি হয় যে, লিয়াকত আলী খানের মস্কো সফরের বিষয়টির মধ্যে আরো কোনো পক্ষ নাক গলিয়েছে। সেই অন্য পক্ষটি স্পষ্টত ছিল ভারত। এবারের মুলতবির পর লিয়াকত আলীকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দিকে অগ্রসর হতে হয়েছিল। বাগদাদ চুক্তির পরবর্তীকালে যা সেন্টো হয়, তার সদস্যপদ গ্রহণ ছিল এর পরিষ্কার পরিণতি।

সেই থেকে মস্কো পাকিস্তানের প্রতি বৈরীভাবাপন্ন, এমন কি অধিকৃত কাশ্মীরকে সে ভারতের অংশ হিসেবেও বর্ণনা করেছে। আইউব খান ক্ষমতায় আসার পর মস্কোর সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক করার সিদ্ধান্ত নেন। তিনি তাঁর বিবেচিত নীতির ভিত্তিতে মস্কো সফরে যান এবং কেবল তখনই সোভিয়েট মনোভাব পরিবর্তিত হতে শুরু করে। তাসখন্দে আইউব ও শাস্ত্রীর মধ্যে বৈঠকের আয়োজন ছিল পাকিস্তানের প্রতি সোভিয়েট মনোভাবের নরম হওয়ার একটি অনুক্রম। ভারত অবশ্য মস্কোর সঙ্গে ব্যাপকভিত্তিক সম্পর্ক বজায় রাখতে থাকে এবং ১৯৭১ সালের যুদ্ধে পাকিস্তানকে পরাজিত করার লক্ষ্যে সোভিয়েট ইউনিয়ন ভারতকে সম্ভাব্য সকল সাহায্য করে। এর কারণ শুধু ভারত ও ইউ এস এস আর-এর পুরনো সম্পর্ক ছিল না, মূল কারণটি ছিল আমেরিকা ও চীনের মধ্যে সম্পর্ক মধুর করার এবং দুই বৃহৎ শক্তির নতুন পর্যায়ে স্বাভাবিক সম্পর্কে আসার পথ খুলে দেয়ার ব্যাপারে ইয়াহিয়া খানের পালিত অসাধারণ ভূমিকা। এভাবেই ঘটনা প্রবাহ ঘটেছিল।

১৯৭০ সালের অক্টোবরে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সফর করেন এবং ২৫ অক্টোবর প্রেসিডেন্ট নিক্সনের সঙ্গে এক ঘণ্টাস্থায়ী একান্ত বৈঠকে মিলিত হন। তিন সপ্তাহ পর ইয়াহিয়ার চীন সফরের কথা ছিল। নিক্সন ইয়াহিয়াকে চীনের নেতৃবৃন্দের কাছে তাঁর চীন সফরের ইচ্ছার কথা পৌছে দিতে বলেছিলেন। নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহে ইয়াহিয়া ঢাকায় আসেন এবং একদিন অবস্থান করার পর সেখানে থেকে তিনি বেইজিং যান। বেইজিং এ তিনি চৌ এন-লাই-এর সঙ্গে নিক্সনের প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা করেন। নিক্সন ও চৌ এন-লাই-এর মধ্যে যোগাযোগের একটি কূটনৈতিক মাধ্যম হিসেবে ইয়াহিয়া দায়িত্ব পালন করতে থাকেন। নিক্সনকে পৌছে দেয়ার জন্য ইয়াহিয়া একটি চীনা বার্তা পান এবং দ্রুত সেটা নিক্সনের কাছে পৌছে দেয়া হয়। ১৯৭১ সালের ৮ জুলাই হেনরি কিসিঞ্জার রাওয়ালপিন্ডি আসার আগে পর্যন্ত এসব যোগাযোগ ও তৎপরতার সকল বিষয়কে সম্পূর্ণরূপে গোপন রাখা হয়েছিল।

৯ জুলাই খুব সকালে সর্বোচ্চ সতর্ক গোপনীয়তায় কিসিঞ্জার চীন গিয়েছিলেন, কিন্তু প্রচার করা হয়েছিল যে, তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েছেন এবং চিকিৎসা ও বিশ্রামের জন্য তাঁকে নাথিয়াগলিতে নেয়া হয়েছে। ১১ জুলাই দুপুর একটায় কিসিঞ্জার ইসলামাবাদ বিমান বন্দরে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন। চারদিন পর নিক্সন এক সাংবাদিক সম্মেলনে নিচের বিবৃতিটি পাঠ করেছিলেনঃ 'প্রধান মন্ত্রী চৌ এন-লাই ও প্রেসিডেন্ট নিক্সনের জাতীয় নিরাপত্তা বিষয়ক বিষয়ক সহকারী মিঃ হেনরি কিসিঞ্জার ১৯৭১ সালের ৯ থেকে ১১ জুলাই পর্যন্ত পিকিং-এ আলাপ-আলোচনা করেছেন। গণপ্রজাতন্ত্রী চীন সফরের জন্য প্রেসিডেন্ট নিক্সনের ব্যক্ত ইচ্ছার কথা জানতে পেরে গণপ্রজাতন্ত্রী চীনের পক্ষে প্রধান মন্ত্রী চৌ এন-লাই ১৯৭২ সালের মে মাসের আগে একটি উপযুক্ত সময়ে চীন সফরের জন্য প্রেসিডেন্ট নিক্সনকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। প্রেসিডেন্ট নিক্সন আমন্ত্রণটি গ্রহণ করেছেন।'

'চীন ও যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃবৃন্দের এই বৈঠকের উদ্দেশ্য হলো দু'দেশের সম্পর্ককে স্বাভাবিক করা এবং উভয়ের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো নিয়ে মত বিনিময় করা।' যোগাযোগের ঘটনাটি প্রকাশ করার সময় নিক্সন পাকিস্তানের ভূমিকার ব্যাপারে, এমন কি সামান্য উল্লেখ পর্যন্ত করেন নি, সবচেয়ে তিক্ত দুই শত্রুর মধ্যে সর্বোচ্চ পর্যায়ে চমৎকার কূটনীতি পরিচালনার জন্য তিনি প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার প্রতিও কোনো ধন্যবাদ জানান নি।

এই গোপন কূটনীতির ফলাফল বিশ্ব শান্তির অগ্রগতি ঘটানোর ক্ষেত্রে একটি প্রধান অবদান রেখেছিল, কিন্তু পাকিস্তানকে তার ভূমিকার জন্য অব্যবহিত অশুভ ফল ভোগ করতে হয়েছিল। সংবাদটি শোনার পর ভারত ও সোভিয়েট ইউনিয়ন উভয়ই ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে, বিশেষ করে সোভিয়েট ইউনিয়ন ক্ষিপ্ত হয় বেশি। অচিরেই মস্কো ও নতুন দিল্লীর মধ্যে সফর বিনিয়ম হতে থাকে। ১৯৭১ সালের আগস্টে ঘোষিত হয় তাদের মধ্যে স্বাক্ষরিত 'সুদূরপ্রসারী শান্তি ও মৈত্রী চুক্তি'র কথা যাতে ভারতের ওপর আক্রমণের সময় সোভিয়েট ইউনিয়নের জন্য হস্তক্ষেপের সুযোগ যোগানো হয়। এতে পারস্পরিক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে এমনভাবে সম্প্রসারণ করা হয় যে,

'একজনের ওপর আক্রমণকে। অন্য জনের ওপর আক্রমণ' হিসেবে বিবেচনা করার কথা সংযোজিত হয়। অক্টোবরের শেষদিকে যখন ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে প্রকৃত শত্রুতার শুরু হয় সোভিয়েট ইউনিয়ন তখন পাকিস্তানের অবস্থান নির্ধারণের জন্য স্যাটেলাইট ব্যবহার করার সুযোগসহ ভারতকে সকল প্রকার সামরিক সাহায্যের যোগান দিয়েছিল।

আমেরিকা ছিল যথারীতি অনির্ভরযোগ্য। ১৯৬২ সালে সংঘটিত চীন-ভারত যুদ্ধকালে আমেরিকা ভারতকে বিপুল পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ করেছিল, যদিও প্রেসিডেন্ট আইউব খান এর প্রতিবাদ জানিয়ে বলেছিলেন যে, সরবরাহকৃত সমরাস্ত্র পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হবে। আইউবের প্রতিবাদ সত্ত্বেও আমেরিকা ভারতকে অস্ত্র দিয়েছিল। ১৯৬৫ সালের মাঝামাঝি চীনের সঙ্গে পাকিস্তানের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের ব্যাপারে আমেরিকা তার অসন্তোষ প্রকাশ করে এবং বিশ্ব ব্যাংকের কনসোর্টিয়াম বৈঠক স্থগিত করিয়ে দেয়। দু'মাস পর যখন ভারত পাকিস্তানকে আক্রমণ করে তখন আমেরিকা পাকিস্তানে সকল সরবরাহ বন্ধ করে দেয়, এমন কি খুচরো যন্ত্রাংশ বহনকারী জাহাজগুলোকে গভীর সমুদ্র থেকে দিক পরিবর্তন করে সে অন্য দেশে নিয়ে যায়। এ সব কিছুর পরও চীন ও আমেরিকার মধ্যে সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ করার ক্ষেত্রে ইয়াহিয়া ১৯৭০ সালে অবদান রাখেন, কিন্তু তথাপি পাকিস্তানের কাছে অস্ত্র বিক্রি বা হস্তান্তরের ওপর মার্কিন কংগ্রেস নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে, এমন কি ১৯৭১ সালেও অন্যান্য উৎসের কাছে সামরিক সরঞ্জামাদি চাইতে আমাদের বাধ্য করা হয়েছিল। কিন্তু মার্কিন সূত্র থেকে সরবরাহ না থাকায়, বিশেষ করে খুচরো যন্ত্রাংশের অভাব পূরণ করা সম্ভব হয়নি। পাকিস্তান সশস্ত্র বাহিনীর বেশির ভাগ অস্ত্রশস্ত্র ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তৈরী। ফলে যন্ত্রাংশ ও সরঞ্জামাদির অভাবে সেগুলো ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে পড়েছিল। চীনের সঙ্গে আমাদের বন্ধুত্বের সুযোগ কাজে লাগিয়ে যুক্তরাষ্ট্র চীনের সঙ্গে তার যোগাযোগ স্থাপনে পাকিস্তানকে সহযোগিতা করতে বলেছিল। ইয়াহিয়া সর্বান্তকরণে এ ব্যাপারে সহযোগিতা করেছেন। তিনি শুধু বৈঠকই আয়োজন করে দেননি, হেনরি কিসিঞ্জারের পিকিং সফরের জন্য বিমান এবং অন্যান্য সকল সুবিধা যুগিয়েছেন। আমরা আশা করেছিলাম যে, বিনিময়ে অন্তত খুচরো যন্ত্রাংশের ওপর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে নেয়া হবে। কিন্তু নিক্সনের ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও কংগ্রেস অস্বীকৃতি জানিয়েছিল।

আমাদের অবশ্যই স্মরণ রাখতে হবে যে, যুদ্ধের ব্যাপারে সাধারণত কংগ্রেস সিদ্ধান্তপ্রণেতা হয়ে থাকে, প্রেসিডেন্ট নন। হেনরি কিসিঞ্জারের সাফল্যের প্রতিদানে আমরা কিছুই পেলাম না। অন্য দিকে রাশিয়ার শত্রুতা বৃদ্ধি পেল। ভারতীয়রা পরিস্থিতির সুযোগকে কাজে লাগাল এবং সোভিয়েট ইউনিয়নের সঙ্গে শান্তি, মৈত্রী ও সহযোগিতার চুক্তি সম্পাদন করল। এই চুক্তির মাধ্যমে ভারতীয়রা সম্ভাব্য চীনা আক্রমণের কবল থেকে নিজেদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করেছিল। পাকিস্তান বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল এবং পূর্ণ স্বাধীনতাসহ ভারতীয়রা পূর্ব পাকিস্তানে তাদের বাহিনী পাঠিয়েছিল, এমন কি প্রকাশ্যে আক্রমণের বিরুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কিছুই করেনি, কেবল পাকিস্তানের প্রতি তথাকথিত 'কাত হওয়া' ছাড়া। হেনরি কিসিঞ্জারের গ্রন্থ থেকে এ কথাটি

পরিষ্কার হয়েছে যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও বাঙালী জাতীয়তাবাদীদের অনুকূলে একটি রাজনৈতিক সমাধানের পক্ষে ছিল। আমরা যেভাবে আমাদের ধর্মে বিশ্বাস করি, যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসও ঠিক একইভাবে গণতন্ত্রে বিশ্বাস করে। কোনো একনায়কের অধীনে থাকলে যুক্তরাষ্ট্র গণতান্ত্রিক ভারতের বিরুদ্ধে কোনোদিনই পাকিস্তানকে সাহায্য করবে না। একথা পাকিস্তানকে অবশ্যই স্মরণ রাখতে হবে। বাকি সবই স্বপ্নচারিতা। বহুল আলোচিত সপ্তম নৌবহর পূর্ব পাকিস্তানে পাকিস্তানকে সাহয্য করতে আসছিল না, এটা অগ্রসর হচ্ছিল পশ্চিম পাকিস্তানকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে।

পাকিস্তান যখন সিয়্যাটো-র সদস্য ছিল তখনও চীন ও পাকিস্তানের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ছিল। ১৯৬৫ সালের যুদ্ধের সময় চীন প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে পাকিস্তানকে সাহায্য করেছিল। চীন তার ট্রুপসকে ভারতীয় সীমান্তে পাঠিয়েছে এবং ভারতীয়দের উদ্দেশ্যে এক ধরনের চরমপত্র জারি করেছে। পাকিস্তানও চীনের সমর্থনে ভূমিকা রেখেছে- প্রথমবার আইউবের শাসনকালে, যিনি ১৯৬১ সালে আমেরিকা সফরকালে প্রকাশে চীনের পক্ষে ওকালতি করেছিলেন। তারপর ইয়াহিয়া খান চীন ও আমেরিকার মধ্যে সেতু বন্ধন হিসেবে ভূমিকা রেখেছিলেন। ১৯৭০-৭১ সালে দু'টি কারণে চীনের মনোভাব সতর্ক ছিল। পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ এতে জড়িত ছিল এবং তাদের মতামত ও অনুভূতিকে চীনারা উপেক্ষা করতে পারেনি। পূর্ব পাকিস্তানে ইয়াহিয়া অভ্যন্তরীণ নীতির প্রতি প্রকাশ্যে সমর্থনের ফলে ঐ প্রদেশের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ চীনের দিক থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ত। ভারতের পূর্ব ও উত্তর-পূর্বাঞ্চলের ব্যাপারে নিজেদের সুদূরপ্রসারী লক্ষ্যের প্রেক্ষিতে চীনারা ঐ অঞ্চলের জনগণের সঙ্গে অবন্ধুসুলভ সম্পর্ক ও মনোভাব সৃষ্টি করতে চায়নি। দ্বিতীয় কারণটি ছিল চীন ও ভারতের প্রতি রাশিয়ার মনোভাব। ভারতের সঙ্গে মৈত্রীর সামরিক চুক্তি সম্পাদনের পর চীন সীমান্তে চল্লিশ ডিভিশন সৈন্যের বিশাল সমাবেশ ঘটানোর মাধ্যমে রুশরা চীনের নিরপেক্ষতাকে নিশ্চিত করেছিল। চীন যদি ভারতের বিরুদ্ধে ট্রুপস পাঠাতো তাহলে রুশরা চীনকে আক্রমণ করত। অমন একটি নিশ্চিত নিশ্চয়তার পরই কেবল ভারতীয়রা পূর্ব পাকিস্তানকে আক্রমণ করতে পেরেছিল।

জনাব ভুট্টো ও অন্যরা, অবশ্য অস্পষ্ট ও পরোক্ষভাবে, বলে আসছিলেন যে, চীনারা সাহায্য করবে। যদিও তার প্রতিনিধিদলের সফরকালে চীনারা পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিয়েছিল যে, রুশ হুমকির সুস্পষ্ট কারণে তাদের পক্ষে আমাদেরকে সাহায্য করা সম্ভব নয়।

জেনারেল গুল হাসান, এয়ার মার্শাল রহিম খান ও ভাইস অ্যাডমিরাল রশিদ জনাব ভুট্টোর সঙ্গে চীন গিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে তাঁদের সকলেই এ ধারণাটি দিয়েছেন যে, চীনা প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে জাতিকে সত্য কথাটি বলা হয়নি। চীনারা ইতিমধ্যেই ভারতের সঙ্গে যুদ্ধের ক্ষেত্রে পাকিস্তানকে সাহায্য করার অপারগতার কথা জানিয়ে দিয়েছিল, কিন্তু জনাব ভুট্টো এই ধারণাই দিয়েছিলেন যে, অমন একটি সাহায্য পাওয়া যাবে। ইয়াহিয়াকে উৎসাহিত করার উদ্দেশ্যে ৪ নভেম্বর তিনি (ভুট্টো) বলেছিলেন যে, ভারত যদি আক্রমণ চালায় তাহলে গঙ্গার পানির রং পাল্টে

যাবে। সামগ্রিক রাজনৈতিক, মনস্তাত্ত্বিক ও সামরিক পরিস্থিতি কিন্তু অমন একটি আশাবাদী বিশ্লেষণের কোনো কারণ উপস্থিত করেনি। এর একমাত্র কারণটি হতে পারে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে যুদ্ধের শুরুকে নিশ্চিত করা। যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর জি এইচ কিউ সম্ভাব্য চীনা হস্তক্ষেপের মিথ্যা তথ্য দিয়ে ঢাকাকে আশ্বস্ত রাখতে চেয়েছে। গভর্নর তাঁর টেলেক্স বার্তায় বলেছিলেন, "যদি কোনো বন্ধুর সাহায্যের আশা থেকে থাকে তাহলে তার অ্যাকশন আগামী ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে প্রভাব সৃষ্টি করতে পারে। অন্যথায় শান্তিপূর্ণ ক্ষমতা হস্তান্তরের উদ্দেশ্যে আলাপ-আলোচনা শুরু করা উচিত...।" এর জবাবে হাই কম্যান্ড গভর্নরকে আশ্বাস দিয়েছিল যে, 'চীনাদের তৎপরতা শুরু হয়ে গেছে।'

১৪ ডিসেম্বর জেনারেল হেডকোয়ার্টার্স থেকে টেলিফোনে নিয়াজী এই মর্মে একটি বার্তা পেয়েছিলেন যে, উত্তর দিক থেকে হলদেরা এবং দক্ষিণ দিক থেকে শাদারা আসছে। এই বার্তায় অনুপ্রাণিত হয়েই নিয়াজী এক বিবৃতিতে বলেছিলেন, এমন কি ট্যাংকও যদি তার শরীরের ওপর দিয়ে যায়, তাহলে তিনি সে ট্যাংকগুলোকেও থামিয়ে দেবেন। বিস্তারিত জানার জন্য এবং সমন্বয় আয়োজনের উদ্দেশ্যে আমি চীনের কনসাল জেনারেলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গিয়েছিলাম। কনসাল জেনারেল এ ব্যাপারে কিছুই জানতেন না। তিনি পিকিং থেকে কোনো বার্তাই পাননি, যদিও তাঁদের সঙ্গে তিনি ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রাখছিলেন। অন্যদিকে বারবার তিনি আমাকে বলে চলছিলেন, "জনগণকে আপনাদের পক্ষে আনুন, জনগণকে আপনাদের পক্ষে আনুন।" আমি তাঁকে বলতে পারিনি যে, সেটাই ছিল প্রধান সমস্যা এবং জনগণই আমাদের বিরুদ্ধে।

ভারতে

জেনারেল অফিসারদের ঢাকার বাইরে পাঠিয়ে দেয়ার আয়োজন করা হয়েছিল। প্রত্যেককে তাঁর সঙ্গে একজন এডিসি নেয়ার অনুমতি দেয়া হয়। আমার পদের কারণে কোন এডিসি বা ব্যক্তিগত স্টাফ অফিসার আমার ছিল না। আমি সিদ্দিক সালিকের কথা চিন্তা করলাম, যে মুক্তিবাহিনীর সম্ভাব্য টার্গেট ছিল। আমি তাকে আমার সঙ্গে কোলকাতা নেয়ার ব্যবস্থা করলাম, যেখানে সে একজন ভালো সহচর হিসেবে নিজের প্রমাণ দিয়েছিল।

জেনারেল নিয়াজী, অ্যাডমিরাল শরীফ, এভিএম ইনামুল হক, মেজর জেনারেল জামশেদ, নজর, আনসারী, কাজী মজিদ এবং আমি প্রত্যেকে একজন করে এডিসিসহ ২০ ডিসেম্বর বিমানযোগে কোলকাতা পৌঁছেছিলাম। আমরা যখন টারম্যাকে অবতরণ করলাম তখন অ্যাডমিরাল শরীফ জেনারেল নিয়াজীর দিকে ঘুরে দাঁড়ালেন এবং পাঞ্জাবীতে বললেন,"আপনি বলতেন আমি কোলকাতা যাবো। এখন আপনি সেখানে পৌঁছে গেছেন।''

কথাটি এসেছিল জেনারেল নিয়াজীর এই দাম্ভিক বক্তব্যের প্রেক্ষিতে যে, তিনি কোলকাতা আক্রমণ করবেন এবং দখল করে নেবেন। এমন কি আত্মরক্ষা করার মতো যথেষ্ট সম্পদবিহীন অবস্থায় এ ধরনের অভিলাষ ছিল সামরিক উদ্দেশ্যের দৃষ্টিকোণ থেকে সম্পূর্ণ অসম্ভব বিষয়।

একেবারে প্রাথমিক দিনগুলো থেকেই পাকিস্তান আর্মিতে দু'ধরনের অফিসার ছিল। একদিকে ছিল সৈনিক ধরনের এবং অন্য দিকে ছিল যারা নিজেদেরকে স্টাফ ধরনের হিসেবে অভিহিত করত। সৈনিক ধরনের অফিসাররা নিজেদেরকে যোদ্ধা হিসেবে তুলে ধরত- কিন্তু অনেকেই কেবলই দম্ভপূর্ণ, বাস্তবতাবিবর্জিত, যুক্তিহীন ছিল এবং সবচেয়ে খারাপ বিষয়টি হল, যুদ্ধে তারা ছিল ব্যর্থ। এর কারণ ছিল আধুনিক যুদ্ধ সাফল্যের সঙ্গে সেই কম্যান্ডাররাই পরিচালনা করতে পারেন, যাদের যুদ্ধ শিল্প সম্পর্কে জ্ঞান ও চিন্তাশক্তি রয়েছে।

আমরা কোলকাতায় থাকাকালে ভারতীয়রা আকস্মিকভাবে আমাদের জিনিসপত্র তল্লাশী করে এবং কাগজপত্র, নোটবই, দামী জিনিস ও টাকা-পয়সা নিয়ে যায়। তারা আমাদেরকে পৃথক পৃথকভাবে জিজ্ঞাসাবাদও করেছিল। আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছিলেন মেজর জেনারেল জ্যাকব (যিনি পরবর্তীকালে একটি রাজনৈতিক দলে যোগ দিয়েছেন এবং নাম থেকে মনে হয় তিনি একজন ইহুদী)। তিনি মিলিটারি অ্যাকশন, পরিকল্পনা ও পরিচালনা সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিলেন। আমি তাঁকে বলেছি, আমি যেহেতু ট্রুপস কম্যান্ড করার সঙ্গে যুক্ত ছিলাম না, তাই আমার পক্ষে কোনো মন্তব্য করা সম্ভব নয়। একজন মিলিটারি অফিসার হিসেবে আমার মতামত জানার জন্য তিনি পীড়াপীড়ি করছিলেন। আমি বলেছি,“আপনাদের ভাগ্য ভালো যে, আমি ট্রুপস কম্যান্ড করিনি।” তিনি বিস্মিত হয়ে গেছেন এবং বিষয়টি ব্যাখা করতে বলেছেন। আমি তাঁকে মূল পরিকল্পনা তথা চলমান যুদ্ধ চালানোর সময় প্রাণহানি ঘটতে থাকলে পশ্চাদপসরণ করে নদীর তীর ধরে মধ্যবর্তী বৃত্ত দখলে রাখার পরিকল্পনার কথা জানিয়েছি। তিনি ভারতীয় অ্যাকশন সম্পর্কে আমার মতামত জানতে চেয়েছেন। আমি বলেছি,“আপনারা ক্যান্সার কিনে এনেছেন।” তিনি বলেছেন, “আপনি কি বলতে চান?” আমি বলেছি, “আপনারা যে প্রাদেশিকতা, আঞ্চলিকতা ও বর্ণবাদী জাতীয়তাবাদকে উস্কে দিয়েছেন এবং সমর্থন করেছেন, তা একদিন ভারতের অভ্যন্তরেও ছড়িয়ে পড়বে?” তিনি একমত হননি এবং বলেছেন, “আমরা জানি কিভাবে এ ধরনের পরিস্থিতি সামাল দিতে হয়।”

তিনি এরপর আমাকে জিজ্ঞেস করেছেন,“পূর্ব পাকিস্তানকে একটি টিকে থাকার মতো সমর্থ দেশ বানাতে কি পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন পড়বে?” আমি বলেছি, “একদিনের জন্য সাত কোটি রূপী এবং তাদের প্রতিদিনের কথা বাদ দিন। সাত কোটি লোক একে খেয়ে ফেলবে।”

এরপর তিনি আশু সমস্যাগুলো সম্পর্কে জানতে চেয়েছেন, যেসবের দিকে দৃষ্টি দেয়া দরকার। আমি যোগাযোগ প্রতিষ্ঠার এবং খাদ্য চলাচলের কথা বলেছি, না হলে, আমি বলেছি, পূর্ব পাকিস্তাননে দুর্ভিক্ষ আঘাত হানবে।

সাক্ষাতকারটি রেকর্ড করা হয়েছিল। আমি জানি, ভারতীয় ব্যবস্থার নিয়মানুসারে একদিন এটা প্রকাশ করা হবে। সত্যকে তাই নিশ্চিত করা হয়েছে।

কোলকাতায় প্রায় এক মাস অবস্থান করার পর আমাদেরকে জব্বলপুরে স্থানান্তরিত করা হয়েছিল, যেখানে ভারতীয় আর্মির একজন অফিসার তথা সেকেন্ড লেফটেন্যান্ট হিসেবে ১৯৪৩ সালে আমি কয়েক মাস কাটিয়েছিলাম।

সমগ্র যাত্রাপথেই ভারতীয় আর্মির অফিসাররা আমাদের প্রহরায় রেখেছিলেন। আমি দেখে বিস্মিত হয়েছিলাম যে, অন্য জেনারেল অফিসারদের যেখানে লেঃ কর্নেলরা দেখাশোনা করছিলেন, সেখানে আমার প্রহরায় ছিলেন একজন ফুল কর্নেল। আমি

অফিসারটিকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, তাদের কোনো ভুল হচ্ছে কি না। কারণ আমি ছিলাম ষষ্ঠ র‍্যাংকের অফিসার। এই অফিসারটির কারণ জানা ছিল না। তবে আমার ধারণা, ভারতীয় আর্মি একটি ভুল তথ্যের শিকার হয়েছিল- যে তথ্যটি তাদের বিবিসি সরবরাহ করেছিল। যা ঘটেছিল তার বর্ণনা নিচে দেয়া হল।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, ৭ ডিসেম্বর গভর্নর হাউসে নিয়াজী ভেঙে পড়েছিলেন। তারপর থেকে তাঁকে আর ঢাকায় দেখা যায়নি।

বিবিসি ভুল তথ্য পায় এবং তাদের একটি অনুষ্ঠানে প্রচার করে যে, নিয়াজী পশ্চিম পাকিস্তানে পালিয়ে গেছেন এবং ফরমান দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। এর ফলে আমি 'কম্যান্ডার অফ পাকিস্তান ফোর্সেস ইন ইস্ট পাকিস্তান' হিসেবে পরিচিতি পেয়েছিলাম, এমন কি জেনারেল মানেকশও অল ইন্ডিয়া রেডিওতে প্রচারিত বার্তায় আমাকেই কম্যান্ডার হিসেবে সম্বোধন করতে শুরু করেছিলেন। আমার কোনো রেডিও সেট ছিল না, সুতরাং নিজ কানে আমি তা শুনিনি। এটা আমি প্রথম দেখি ১৪ ডিসেম্বর আত্মসমর্পণের আহ্বান জানিয়ে ঢাকার ওপর ছড়ানো প্রচারপত্রে। এতে আমাকে 'কম্যান্ডার অফ পাকিস্তান ফোর্সেস' হিসেবে সম্বোধন করা হয়েছিল। নিয়াজী পুরো সময়টিতেই ঢাকায় ছিলেন এবং সর্বতোভাবে কম্যান্ডেও ছিলেন। এই সম্পূর্ণ ভুল তথ্যটি পরবর্তীকালে আমার জন্য অনেক সমস্যার সৃষ্টি করেছিল, এমন কি পশ্চিম পাকিস্তানের লোকজনেরও ধারণা ছিল যে, আমি অন্তত নিয়াজীর পর সেকেন্ড ইন কম্যান্ড ছিলাম (এই ভুল ধারণাটি এখনো বিশেষ কিছু মহলে রয়েছে)। আমি এমন কি দূরবর্তী অবস্থান থেকেও কম্যান্ড কাঠামোর সঙ্গে যুক্ত ছিলাম না এবং যা কিছু সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছিল তার সবই ছিল নিয়াজীর। বিবিসি-র ঐ সংবাদটি পাঠিয়েছিলেন তাদের বাঙালী প্রতিনিধি। কোর হেডকোয়ার্টার্স তাঁকে গ্রেফতার করতে চেয়েছিলেন। আমি তাঁকে টেলিফোন করলাম এবং বন্ধুসুলভ উপদেশ দিয়ে কোর কম্যান্ডার সম্পর্কে এ ধরনের সংবাদ পাঠাতে নিষেধ করে জানালাম, অন্যথায় তাঁর ক্ষতি হতে পারে। আমি জানতাম না যে, তিনি আমাদের কথোপকথন রেকর্ড করছিলেন। ভদ্রলোকটি অন্যান্য বাঙালী বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে ১৬ ডিসেম্বর নিহত হয়েছিলেন। রেকর্ডটি পাওয়া যাওয়ায় এই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে আমার নাম জড়ানো হয়েছিল।

আমি সব সময় অসামরিক নাগরিকদের বাঁচানোর চেষ্টা করেছি এবং মুষ্টিমেয় কিছু লোকের বাড়াবাড়ির বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করেছি– যাদের ছিল বিপুল ক্ষমতা। আর্মির ওপর গভর্নরের কোনো নিয়ন্ত্রণ ছিল না, তারা নিজেদের আলাদা কারাগার ও আদালত তৈরি করেছিল। যোগাযোগ ও আলোচনার জন্য সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে আমি জনাব আতাউর রহমান, জনাব মসিউর রহমান, জনাব জহিরুল ইসলাম এবং আরো কিছু সংখ্যক নেতার মুক্তির ব্যবস্থা করেছিলাম। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের

বর্তমান গভর্নর ও তখনকার ব্রিগেডিয়ার জানজুয়ার উপস্থিতিতে সি ও এস জেনারেল হামিদের কাছে পেশকৃত এক প্রতিবেদনে উল্লেখ করেছিলাম যে, এফ আই ইউ এবং অন্যান্য গোয়েন্দা সংস্থা কিছু বাড়াবাড়ি করেছে। এতে আমি ন্যাপ নেতা জনাব সাঈদুল হাসানের হত্যাকাণ্ডের তদন্ত করার জন্য অনুরোধ জানিয়েছিলাম।

বাংগালীদের প্রতি আমার মনোভাব পশ্চিম পাকিস্তানীরা অনুধাবন করতে পারেনি। কিন্তু এখনো আমি মনে করি যে, কেবল শক্তির বলে কেউ কোনো জনগোষ্ঠীর ওপর শাসন চালাতে পারে না। একটি সংবিধান হলো সমমর্যাদায় সমান অধিকার ও দায়িত্বসহ একত্রে বসবাস করার এক চুক্তি। পশ্চিম পাকিস্তানের মনোভাব ছিল অসমর্থনীয় এবং সে জন্য একটি জাতি হিসেবে আমাদেরকে ফলভোগ করতে হয়েছে।

ক্ষতি বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে হামুদুর রহমান কমিশনের সামনে আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলে নিয়াজী বলেছেন যে, জেনারেল মানকশ'র সঙ্গে আমার যোগাযোগ ছিল। তাঁর অন্তর্ধানের পরই সমগ্র নাটকের শুরু হয়েছিল। নিজের কাপুরুষোচিত কার্যক্রমকে আড়াল করার উদ্দেশ্যে তিনি এই তত্ত্বটি তৈরি করেছিলেন। কমিশন বিষয়টি সম্পর্কে তদন্ত করেছে এবং অমন একটি অভিযোগের কোনো ভিত্তি খুঁজে পায়নি।

আমাদের নতুন আবাসস্থল জব্বলপুর ছিল ভেতর ও বাইরের দিকে যথাযথভাবে কাঁটাতারের বেড়া ঘেরা একটি পি ও ডব্লিউ ক্যাম্প। আমাদের বন্দীদের জন্য বাড়তি প্রহরার জন্য সার্চ লাইট এবং কুকুরের আয়োজন করা হয়েছিল।

ক্যাম্পে আটজন অর্ডারলিসহ মাত্র আটজন সিনিয়র অফিসার ছিলেন। জেনারেল নিয়াজী, জামশেদ, নজর, আনসারী, মজিদ এবং অ্যাডমিরাল শরীফ ও কমোডর ইনামুল হকের সঙ্গে আমি ছিলাম একত্র বসবাসকারীদের একজন। ঘরটিকে মনে হয়েছে একজন একক অফিসারের বসবাসের জন্য নির্মিত। মেসটি ছিল একটি রাস্তার বিপরীত দিকে, যেখান থেকে আমাদের খাবার আনতে হত। অবশ্য যুদ্ধবন্দী হিসেবে একজন আলাদা র‍্যাংক ও রেশন পেয়ে থাকে। মেস থেকে সকালের নাশতা দেয়ার কোনো ব্যবস্থা ছিল না, আমাদের প্রত্যেককে এজন্য প্রতিদিন এক রূপী করে ব্যয় করতে হত।

কোলকাতার দিনগুলো থেকে সিনিয়রিটি অনুযায়ী জেনারেল নিয়াজীকে টেবিলের শীর্ষে রেখে আমরা ডাইনিং টেবিলে খেতে বসতাম। সিনিয়রিটির দিক থেকে আমি ছিলাম ষষ্ঠ। নিয়াজী ডোঙ্গার অর্ধেকটাই নিয়ে নিতেন এবং আমার কাছে আসতে আসতে ওতে একটি বা দুটি হাড় অবশিষ্ট থাকতো। ঐ সময় থেকে মাংসের প্রতি আমি বিতৃষ্ণ হয়ে পড়ি।

পাকিস্তানী মানের তুলনায় খাবার ছিল খুবই সাদামাটা, সাধারণত পানিতে রান্না করা। এতে খুব কমই ঘি ব্যবহার করা হতো যা স্বাস্থ্যের দৃষ্টিকোণ থেকে ভালো ছিল। আমরা দেখেছি বেশির ভাগ ভারতীয় অফিসারই হাল্কা পাতলা ছিলেন। আলোচনায় জানা গেছে যে,

১৯৬২ সালে চীনের বিরুদ্ধে বিপর্যয়ের পর ভারতীয় সরকার একটি কমিশন গঠন করেছিল। এই কমিশন অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে অফিসার শ্রেণীর জন্য অত্যন্ত কঠোর শৃংখলার শাসন সুপারিশ করেছিল- সাদামাটা জীবন এবং খুবই উঁচু মানের শারীরিক সচলতা। কমিশনের সুপারিশমালাকে কার্যকরভাবে প্রয়োগ করা হয়েছিল। আমাদের ক্ষেত্রে কমিশনের রির্পোটগুলোকে, এমন কি প্রকাশই করা হয় না, ফলে কোনো প্রতিরক্ষামূলক পদক্ষেপও গৃহীত হয় না।

জব্বলপুরের প্রথম দিনটি ছিল অত্যন্ত মর্মবিদারক। আমাদেরকে পৃথক পৃথক কক্ষ বরাদ্দ দেয়া হয়েছিল। ভেতরে প্রবেশ করে আমরা দেখেছিলাম যে, দরজার বোল্টগুলিকে খুলে নেয়া হয়েছিল। উদ্দেশ্য ছিল যাতে আমরা ভেতরে থেকে দরজা বন্ধ করতে না পারি এবং ভারতীয়রা যাতে সর্বক্ষণ আমাদের গতিবিধি দেখতে পারে। দু'জন তরুণ অফিসার এসে আমাকে সম্পূর্ণরূপে তল্লাশি করলো। আমার কাছে পাকিস্তানী দু'শ' রূপীর নোট ছিল। এগুলো তারা নিয়ে গেল যাতে ক্যাম্প থেকে আমরা পালিয়ে যেতে না পারি তা নিশ্চিত করার জন্য। রাত্রি নামার সঙ্গে সঙ্গে আমাকে আরো একবার নিজের অবস্থা বুঝতে হল। আমার কক্ষের ওপর উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন সার্চ লাইট নিক্ষেপ করা হল এবং আমার গতি বিধি লক্ষ্য রাখার জন্য একজন সেন্ট্রিকে মোতায়েন করা হল। দরজা বন্ধ না করে ঘুমোনো যে কারো জন্যই বিরক্তিকর। সারা রাত বাতাস বয়ে চলল এবং দরজা খোলা ও বন্ধ হওয়ার শব্দ আমাকে পীড়িত করল। ছোট স্থান হওয়ায় এবং দুই পর্যায়ে কাঁটাতারের বেড়া থাকায় এখান থেকে পালানো ছিল অসম্ভব ব্যাপার, যদিও বহুবার আমরা বিষয়টির সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা করেছিলাম।

অফিসারদের আবাসিক ব্যবস্থার স্বাভাবিক রীতি অনুসারে এখানেও কাঁটাতারের ঘেরের ভেতরে একটি খোলা জায়গা ছিল, যেখানে আমরা একত্রে বসতাম। আলোচনা স্বাভাবিকভাবেই আবর্তিত হত যা ঘটে গেছে তা নিয়ে। প্রথম দিককার এ ধরনের আলোচনার সময় আমি প্রায়ই বলতাম যে, আমাদের পরাজয়ের কারণ 'আমরা এক জাতিতে পরিণত হইনি'। কঠোর ভাষায় আমার মন্তব্যের অস্বীকৃতি শুনে আমি বিস্মিত হতাম। আমি অবশ্য এখানেই প্রথমবারের মতো জাতীয় সমস্যা ও ইস্যু সম্পর্কে আমাদের সিনিয়র অফিসারদের অজ্ঞতা সম্পর্কে অবহিত হয়েছিলাম। সময় অতিক্রান্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এক উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন সংঘটিত হচ্ছিল এবং আমি সেই একই সিনিয়র অফিসারকে বলতে শুনতাম, নিজেদের অভিমত হিসেবে তারা আমাকে সে কথাগুলোই বলেছেন, যেগুলো আমি তাদেরকে বলেছিলাম। আমি সব সময় বলে এসেছি যে, কোনো দেশের প্রতিরক্ষার জন্য একটি জাতির মধ্যে ঐক্য থাকা দরকার, যেখানে মানুষ ভাবাবেগ ও মনস্তাত্ত্বিকভাবে এক আত্মা ও এক মনের মানুষে পরিণত হবে।

পক্ষকাল পরে ভারতীয় আর্মির জেনারেল বেরার আমাদের দেখতে এলেন। তিনি দক্ষিণাঞ্চলীয় কম্যান্ডের কম্যান্ডার ছিলেন। একজন সাহসী যোদ্ধা হিসেবে আমরা সবাই তাঁকে চিনতাম। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ইরিত্রিয়ায় (সোমালিয়া) ইতালীয়দের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য তাঁকে খেতাবে ভূষিত করা হয়েছিল। তিনি একজন মোনা বা দাড়ি কামানো শিখ এবং মুসলমানদের প্রতি মনোভাবের ক্ষেত্রে উদার ছিলেন। বিভাগ-পূর্ব দিনগুলোতে শিখ ও মুসলমানদের সম্পর্ক ভালো ছিল এবং তারা হিন্দুদের চাইতে নিজেদের মধ্যে বেশি ঘনিষ্ঠ থাকত। দেশ বিভাগের মাত্র কয়েক বছর আগে মাস্টার তারা সিং (জন্মাগতভাবে হিন্দু) শিখদের মন বিষিয়ে দিয়েছিলেন, যার জন্য এখন তারা ভুগছে। মতামতের ক্ষেত্রে জেনারেল বেরার খুব মুক্ত ছিলেন। তিনি বলেছিলেন, "আপনাদেরকে এক অসম্ভব পরিস্থিতিতে রাখা হয়েছিল। যে কেউই আপনাদের মতো যুদ্ধ পরিত্যাগ করত। কিন্তু এ সবই ঘটেছে, কারণ আপনারা নাগাল্যান্ড এবং অন্যান্য পাহাড়ী উপজাতীয়দের মধ্যে আমাদের জন্য সমস্যার সৃষ্টি করছিলেন।

নিয়াজী অচিরেই নোংরা গল্প বলার লোক হিসেবে নিজের খ্যাতি প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। মেজর ইকবাল সিং নামের একজন শিখ প্রশাসনিক অফিসার জাতীয় পদে ছিলেন। ছেলেবেলা থেকেই তিনি যুক্তপ্রদেশে মানুষ হয়েছেন এবং তিনি পাঞ্জাবী বলতে পারতেন না। এ কথা ভাবতে পারা অসম্ভব ছিল যে, শিখ হয়েও একজন পাঞ্জাবী বলতে পারেন না। এই মেজর শিখদের গল্প সম্পর্কে শুনেছেন। আর নিয়াজীর সে সব গল্প জানা ছিল। ফলে দু'জনের ঘনিষ্ঠতা খুব জমে উঠেছিল।

নিয়াজী শালীনতার কোনো সীমা জানতেন না, রুচিহীনতার ব্যাপারেও তিনি কিছু মনে করতেন না। একদিন আমরা যখন খাচ্ছিলাম তখন নিয়াজীর নিজের শহর মিয়ানওয়ালীর সন্তান খুররানা নামের এক ব্রিগেডিয়ার আমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসেছিলেন। নিয়াজী তার স্বভাবসিদ্ধ মেজাজে অশ্লীল কথাবার্তা শুরু করে দিয়েছিলেন। আমি বলেছি, "স্যার, আমাদের পাকিস্তানীদের এরই মাঝে অনেক দুর্নাম হয়ে গেছে। দয়া করে আপনার কথাবার্তার মাধ্যমে ঐ অভিযোগকে বাড়তি শক্তি যোগাবেন না।" তিনি এই বলে আমার অনুরোধ গ্রহণ করেছিলেন, যা কিছু বলেছেন সে ব্যাপারে তিনি সিরিয়াস ছিলেন না। যা হোক, এটা ছিল প্রতিদিনকার ঘটনা।

আমাদের বন্দীদশার কিছু শুভ দিকও ছিল। এমন কাহিনী শোনা গেছে যে, বন্দী থাকাকালে অনেকে মানসিক ভারসাম্য হারিয়েছেন, অনেকে এমন কি শত্রুর প্রচারণাও বিশ্বাস করেছেন। আমরা দেখেছি ইসলাম আমাদের সকল প্রতিকূল পরিস্থিতি মোকাবিলা করার শক্তি যুগিয়েছে। আমাদের ধর্মে আমরা সান্ত্বনা ও স্বস্তি পেয়েছিলাম। আমরা মেনে নিয়েছিলাম যে, সব কিছুই আল্লাহ্‌র তরফ থেকে আসে এবং আমাদেরকে তাঁর দিকেই

প্রত্যাবর্তন করতে হবে। আমরা বাজার থেকে কুরআনের কপি সংগ্রহ করেছিলাম, আবৃত্তি ও নামাজ পড়তে শুরু করেছিলাম এবং প্রকৃতপক্ষে সারা দিনই আমরা কুরআনের অনুবাদ পড়তাম এবং আলোচনা করতাম। আমরা আমাদের ধর্ম সম্পর্কে যথেষ্ট জ্ঞান অর্জন করেছিলাম যা যুদ্ধবন্দীদের বেশির ভাগই এমন কি মুক্তি লাভের পরও নিয়মিতভাবে অনুরসণ করেছিল।

আমাদের অবস্থানের একটা উজ্জ্বল দিকও ছিল। আমরা একটি ঘরকে মসজিদ হিসেব ব্যবহারের জন্য সংরক্ষিত রেখেছিলাম। ঘরটি ছিল নিয়াজির শোবার ঘরের ঠিক নিচে। সাধারণত জেনারেল আনসারী (যিনি পরে জে ইউ পি-তে যোগ দেন এবং এম এন এ নির্বাচিত হন) নামাজে ইমামতি করতেন। ফজরের নামাজের প্রথম রাকাতে যেহেতু একটু দীর্ঘ সূরা পড়া হয়, নিয়াজী তাই রুকুতে যাওয়ার সময়ের জন্য অপেক্ষা করতেন। এর ফলে তিনি কিছুটা বাড়তি ঘুমিয়ে নিতে পারতেন। একদিন অ্যাডমিরাল শরীফ, যাঁর বেশ রসবোধ ছিল, আনসারীকে বললেন যে, তিনি সেদিন নামাজ পড়াবেন। তিনি অপেক্ষাকৃত ছোট একটি সূরা তেলেওয়াত করলেন এবং রুকুতে গেলেন। নিয়াজী যোগ দেয়ার আগেই প্রায় শেষ করে আনলেন। সালাম ফেরানোর পর নিয়াজীকে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তার বিশ্রামটা কেমন লেগেছে। নিয়াজী তার খেলায় ধরা পড়ে গেলেন এবং লজ্জিত হলেন।

সকালে ভ্রমণের সময় কমোডর ইনামুল হক নিয়াজীকে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে পূর্ণ ব্রিফিং দিতেন। পাকিস্তানে প্রত্যাবর্তনের পর প্রদত্ত বিভিন্ন সাক্ষাতকারের প্রেক্ষিতে মনে হয়, এই ব্রিফিং নিয়াজীর ওপর প্রত্যাশিত প্রভাব ফেলেছিল। আমার যতদূর মনে পড়ে বন্ধু ও আইনজ্ঞদের কাছ থেকে ব্রিফিং লাভের আগে বিভিন্ন বিষয়ে নিয়াজীর মতামত ছিল সম্পূর্ণ অন্যরকম–যেমনটি এখন তিনি বলেন, তেমনটি তখন ছিল না। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, এখন তিনি বলেন যে, পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আক্রমণ পরিচালনার তিনি বিরোধী ছিলেন। কিন্তু যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগে পাঠানো তার বার্তা ও সিগন্যালগুলো তাঁর দাবিকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে।

আমাদেরকে নিজেদের রেডিও রাখতে দেয়া হয়েছিল। আমরা নিয়মিতভাবে পাকিস্তানের অনুষ্ঠানমালা শুনতাম। রির্পোটগুলো ছিল খুবই হৃদয়গ্রাহী। আমরা জেনে উৎসাহিত হতাম যে, জনাব ভুট্টোর গতিশীল নেতৃত্বে অর্থনৈতিক ও শিল্পোন্নয়নের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিরাট অগ্রগতি ঘটছে। রেডিও শুনে যে কারো মনে হত যে, দেশের সর্বত্র শিল্প কারখানা গড়ে উঠছে। ক্ষেতের দু'ধার ধরে গাছের সারির মাঝে সবুজ শস্যক্ষেত ফসলে পল্লবিত হচ্ছে। ১৯৭৩ সালের সংবিধান ঘোষিত হওয়ার পর কল্পনায় আমরা গণতন্ত্র দেখেছি এবং ভেবেছি যে, সমগ্র জাতির ওপর গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের সদয় ছাতা মেলে ধরছে। 'আমরা ঘাস খাবো' এই বলিষ্ঠ উচ্চারণ থেকে আমাদের মনে হয়েছে যুদ্ধে পরাজিত জাতি জার্মান

ও জাপানীদের মতো আমরাও হয়তো শক্তিশালী জাতি হিসেবে মাথা তুলে দাঁড়াব। কিন্তু ১৯৭৪ সালের এপ্রিলে দেশে ফেরার পর আমরা হতাশ হয়েছিলাম। জাতির স্বাস্থ্য ছিল ১৯৭১ সালের চাইতেও খারাপ এবং ব্যক্তি- স্বাধীনতা এত সহিংসভাবে হরণ করা হয়েছিল যা কোনো সামরিক শাসনামলেও আগে কখনো করা হয়নি।

নিয়াজী আমাদের বলেছিলেন যে, ভারতীয়দের সঙ্গে সম্পন্ন আয়োজন অনুযায়ী আমরা দেশে ফেরার মাঝ পথে রয়েছি। আমরা তিন মাসের মধ্যে পাকিস্তানে ফিরে যেতে পারব। ভারতীয়দের মনোভাবও সে রকমই মনে হত। কাঠের খামে লাগানো কাঁটাতারের বেড়ার মধ্যে অবস্থিত আমাদের ক্যাম্পগুলোকেও অস্থায়ী ব্যবস্থা বলে মনে হত।

কয়েক মাস পর আমাদেরকে কিছু ফরম পূরণ করতে এবং ঘোষণা প্রদান করতে বলা হয়েছিল। আমাদেরকে পশ্চিম পাকিস্তানে প্রত্যাবাসন করার প্রস্তুতি নেয়া হয়েছিল। যাহোক, সিমলা চুক্তির পর আমরা কিছু পরিবর্তন লক্ষ্য করলাম। আমাদের ঠিক সামনেই লোহার খুঁটি ও ওয়েল্ডিং করা তার দিয়ে যথোচিতভাবে ঘেরা একটি নতুন ক্যাম্প তৈরি করতে দেখা গেল। বারান্দায় দাঁড়িয়ে যে কেউ দেখতে পেত যে, ভবিষ্যতের কারাগার তৈরি হচ্ছে, যেখানে তাকে কাটাতে হবে হয়তো সারা জীবন। মনে হত যেন একটি পাখি তার জন্য খাঁচা তৈরি করা দেখছে। কেউ শুধু মোনাজাত করে বলতে পারত, "আনি মাসনিয়াদ দুমরু ওয়া আনতা আর হামার রাহিমিন।"

ভারতীয় আর্মির এক লেঃ কর্নেল রানধাওয়া মাঝে মাঝেই আমাদের দেখতে আসতেন। তিনিও আমার মতো আর্টিলারির অফিসার ছিলেন এবং আমার জেলা মন্টোগোমারি, বর্তমানে শাহীওয়াল থেকে আগত ছিলেন। বিভিন্ন বিষয়ে আমরা ব্যাপক আলোচনা করতাম। অন্য যেসব শিখের সঙ্গে আমাদের দেখা হয়েছে, তাদের মতো রানধাওয়া হিন্দুবিরোধী ছিলেন। সে সময়ে ভারতীয় আর্মিতে প্রায় ৪৯ জন শিখ মেজর জেনারেল এবং প্রচুর সংখ্যক শিখ অফিসার ছিলেন। তিনি যখন অভিযোগ জানিয়ে বলতেন যে, ভারত সরকার কোনোদিনই কোনো শিখকে সি ও এ এস বানাবে না, তখন আমি পরামর্শ দিয়ে বলেছি, তারা যেহেতু সংখ্যায় বেশি সুতরাং তাদের ক্ষমতা দখল করা উচিত। তিনি এর সম্ভাবনার ব্যাপারে সন্দিগ্ধচিত্ত ছিলেন। তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী সত্য প্রমাণিত হয়েছিল। যিনি ভারতীয় সেনা বাহিনীকে বিজয়ী করেছিলেন এবং যিনি ছিলেন সবচেয়ে সিনিয়র জেনারেল সেই লেঃ জেনারেল অরোরা উপেক্ষিত হয়েছিলেন এবং একজন হিন্দুকে পদোন্নতি দেয়া হয়েছিল। শিখদেরকে হিন্দুরা কখনোই পুরোপুরি বিশ্বাস করেনি, এমন কি যখন তারা কাশ্মীর যুদ্ধে এবং ১৯৬৫ সালের যুদ্ধে ত্রাণকর্তার ভূমিকা পালন করেছিল, তখনো নয়। ভবিষ্যতে হিন্দুরা সশস্ত্র বাহিনীতে ক্রমান্বয়ে শিখদের সংখ্যা কমিয়ে আনবে এবং তাদেরকে অবদমিত রাখবে।

রানধাওয়া আমাদের বলেছেন, সিমলায় আলোচনাকালে জনাব ভুট্টো যুদ্ধবন্দীদের ভারতে রেখে দেয়ার জন্য অনুরোধ জানিয়েছেন। রানধাওয়ার মতে তাঁর যুক্তি ছিল, "আমরা সাম্প্রতিককালে গণতন্ত্র ফিরিয়ে এনেছি। গণতন্ত্র এখনো জন্ম বা বিকাশকালে রয়েছে। আমাদের অনেক সমস্যার সমাধান আমাকে করতে হবে। পাকিস্তানের একনায়করা ভারতের সঙ্গে যুদ্ধ করেছেন। ভারতের স্বার্থেই পাকিস্তানে গণতন্ত্রকে বিকশিত হতে দেয়া উচিত। গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে শক্তিশালী করা পর্যন্ত যুদ্ধবন্দীদের ভারতে রেখে আমাকে সাহায্য করুন।" রানধাওয়ার মতে জনাব ভুট্টোর হাত ধরতে মিসেস ইন্দিরা গান্ধী রাজি হয়েছেন। সুতরাং আমাদেরকে আরো কয়েকটি বছর ভারতে থাকতে হবে।

অন্যান্য র‍্যাংকের শিখরাও যথেষ্ট স্পষ্টভাষী ছিল। একদিন কর্তব্য পালনকালে তাদের একজন আমার ব্যাটম্যান আহমদ দীনের সঙ্গে আলাপের সময় বলেছে, "আমরা পাঞ্জাবীরা পাকিস্তানের দিক থেকেও যুদ্ধ করি, ভারতের দিক থেকেও যুদ্ধ করি। আমরা কখনো যদি পুনর্মিলিত হতে পারি তাহলে ভারতীয় ও পাকিস্তানীদের উভয়কেই শিক্ষা দেব।" এটা ছিল ভারতীয়দের মধ্যে আঞ্চলিকতা বিকশিত হওয়ার একটি ইঙ্গিত।

আমরা জীবন সম্পর্কে এক সত্য উপলব্ধি অর্জন করেছিলাম। ১৯৭১ সালের ১৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত আমরা ছিলাম সর্বময়, আমাদের আদেশ প্রতিপালিত হত, আমরা ছিলাম সম্মানিত এবং সম্ভবত আমাদেরকে সবাই ভয়ও পেত। ১৬ ডিসেম্বর ভারতীয় আর্মির একজন সাধারণ সৈনিকও আমাদের সুপেরিয়র হয়ে গিয়েছিল। কী এক পরিবর্তন! কুকুরগুলো দুই স্তরবিশিষ্ট কাঁটাতারের বেড়ার ভেতরে লক্ষ্যহীনভাবে ঘুরে বেড়িয়েছে

ভারতীয় আর্মির শিক্ষার মান দেখে আমরা বিস্মিত হয়েছিলাম। এমন কি হাবিলদার ধরনের জুনিয়র ব্যক্তিরাও তাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা উন্নীত করার ইচ্ছা পোষণ করত। এমন বেশ কিছু সংখ্যকের সঙ্গে আমাদের দেখা হয়েছে যারা আইনে গ্রাজুয়েশনের জন্য রাতের বেলায় ক্লাশ করছিল। ভারতীয় আর্মি বৃটিশ আমলের বিধি-বিধানেরও কোনো পরিবর্তন করেনি। বৃটিশদের রেখে যাওয়া মিলিটারি ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিস ও স্টেশন হেলথ অর্গানাইজেশন ব্যবস্থাও তারা বজায় রেখেছে। তাদেরকে আমরা পরিদর্শন করতে ও রির্পোট পেশ করতে দেখেছি, যেমনটি করা হতো ১৯৪৭ সালের আগেও। দুর্ভাগ্যক্রমে পাকিস্তানে আমরা বেশির ভাগ বিধানেরই পরিবর্তন করেছি কিংবা সেগুলোর বাস্তবায়ন স্থগিত রেখেছি।

আমাদের একটি রান্না ঘরও ছিল, সেখানে নাশতা তৈরি করা হত এবং প্রয়োজনে খাবার গরম করা হত। জ্বালানি হিসেবে সিলিন্ডার গ্যাস (এলপিজি) সরবরাহ করা হয়েছিল। সেটাও রেশনে দেয়া হতঃ প্রতি মাসে মাত্র একটি। এই একটি দিয়েই আমাদের সব কাজ সারতে হত অথবা করতে হত অন্য ব্যবস্থা। সুই থেকে করাচী-লাহোর-পেশোয়ার পর্যন্ত

সুই গ্যাসের বিলাসিতা কৃচ্ছ্র ও সাদামাটা জীবন যাপনকারী ভারতীয়দের কাছে ছিল কল্পনাতীত ব্যাপার। দুষ্প্রাপ্যতা বা নিয়মিত সরবরাহ না থাকার কারণে তারা সরকারের কাছে কোনো অভিযোগ জানায় না, সরকারের সমালোচনাও করে না।

জব্বলপুরে কয়েক সপ্তাহ কাটানোর পর থেকে আমাদেরকে দেশের বাড়িতে চিঠি পাঠানোর অনুমতি দেয়া হয়েছিল। পাকিস্তানে অবস্থানরত আমাদের পরিবার সদস্যদের যত বেশি সম্ভব মনস্তাত্ত্বিকভাবে কষ্ট দেয়ার উদ্দেশ্যে ভারতীয়রা খুবই জঘন্য কায়দায় ব্যাপকভাবে চিঠিগুলোকে সেন্সর করত। যেমন একটি চিঠিতে হয়তো লেখা রয়েছে, 'অমুক ও অমুক অমুক-অমুক তারিখে মৃত্যুবরণ করেছে। সেন্সর করার সময় কাঁচি দিয়ে মৃতদের নামগুলো কেটে দেয়া হত। এর ফলে প্রাপকরা কারা মারা গেছে তা জানতে না পেরে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ত। আমরা বিষয়টি নিয়ে ইন্টারন্যাশনাল রেডক্রসের কাছে অভিযোগ জানিয়েছি, কিন্তু ভারতীয়দের সেন্সর করার নোংরা চাতুরী সংশোধিত হয়নি। এর ফলে চিঠি যেতে এবং তার জবাব আসতেও অন্তত দু'মাস বিলম্ব হত। যাহোক কিছু চমকপ্রদ ঘটনাও এ কারণে ঘটেছিল। মেজর জেনারেল কাজী মজিদ আবেগপ্রবণ ধরনের ছিলেন। ভারতীয়দের সেন্সর আচরণে বিরক্ত হয়ে তিনি ভারতের সর্বোচ্চ নেতৃত্ব সম্পর্কে লিখতে এবং তার সম্পর্কে অবমাননাকর মন্তব্য করতে শুরু করেছিলেন। ভারতীয়রা সরাসরি এর প্রতিক্রিয়া দেখায় নি, কিন্তু একবার যখন তিনি দাঁতের ব্যথায় আক্রান্ত হলেন তখন তারা আসল দাঁতটি না তুলে তার পাশের সুস্থ একটি দাঁত উঠিয়ে ফেলেছিল। এরপরও মজিদ পীড়াপীড়ি করতে থাকেন, ডেন্টাল সার্জনও কম দেখান নি। এই প্রক্রিয়ায় মজিদকে বেশ ক'টি ভালো ও সুস্থ দাঁত হারাতে হয়েছিল।

অন্য কাহিনীটি নিয়াজীকে নিয়ে। তার সাধারণ ব্যবহারের কারণে মানুষ মনে করতো তিনি অ্যালকোহল পান করতেন, যেটা তিনি করেন না। যাহোক দুর্নাম খারাপ কাজের চাইতেও খারাপ। এমন একটি কাজের জন্য তিনি পরিচিতি পেয়েছিলেন, যেটা তিনি কখনো করেন নি এবং বিষয়টি পশ্চিম পাকিস্তানে ও সেন্সর অফিসে ছড়িয়ে পড়েছিল। তার একটি চিঠিতে উর্দুতে তিনি যা লিখেছিলেন, সে কথাটির দ্বিবিধ অর্থ ছিল। নিয়াজী বুঝিয়েছিলেন কফি, কিন্তু নিন্দুকরা এর অর্থ করেছিল 'যথেষ্ট'। সব মিলিয়ে এমন একটি অর্থ করা হয়েছিল,'যথেষ্ট পরিমাণে পানীয় এখানে পাওয়া যায় এবং আমি প্রতিরাতে তা পান করি।' কথাটি লাহোরে দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়েছিল এবং তার পরিবারের জন্য মানসিক অশান্তির কারণ ঘটিয়েছিল।

চিঠি আমাদের সন্তানদের জ্ঞান দেয়ার উৎস হিসেবে প্রমাণিত হয়েছিল এবং আমাদেরকেও জ্ঞানার্জনে বাধ্য করেছিল। আমাদের হাতে যেহেতু প্রচুর সময় ছিল, যা বন্দীদশায় সকলেরই থাকে, আমরা ব্যাপকভাবে পড়াশোনা করেছি যেমনটি আগে কখনো

করিনি। আমার মেয়ে শাহীন তার একটি চিঠিতে আমাকে প্রশ্ন করেছিল,"কুরআন অনুযায়ী শেষ দিবস (কেয়ামত) কবে হবে?" ওলামাদের সহযোগিতা ছাড়াই আমি পেয়েছিলাম যে, প্রচলিত এবং বহুল প্রচারিত ব্যাখ্যা সঠিক নয়। কুরআন ১৪শ শতাব্দীকে শেষ শতাব্দী হিসেবে চিহ্নিত করে নি। আমি তিনটি স্থানে বিভিন্ন শব্দযোগে কুরআনের এ সম্পর্কে আয়াত পেয়েছিলামঃ ইয়াসূলাউনাকা আনিসসা আতিআইয়ানা মুরছাহা কুল ইন্নাল্লাহু ইন্দাহু হে মুলিমুসসাআতি। ১৪ শতাব্দী পার হয়ে গেছে। আরো অনেক শতাব্দীও এভাবে যাবে। কুরআন পাঠ না করে এবং না বুঝে যদি সাধারণ বিশ্বাস নিয়ে চলা হয় তাহলে আমরা ইসলামকে অবিশ্বাস করতে শুরু করে দিতে পারি।

আমার মেয়ে ইতিহাসে এম. এ. পড়ছিল। আমি ইতিহাসের প্রধান অধ্যায়গুলো পড়ে সেগুলো সম্পর্কে জানিয়েছি। আমার উৎস ছিল টয়েনবির হিস্ট্রি অফ দ্য ওয়ার্ল্ড-এর দশটি খণ্ড। যদিও বিশ্বব্যাপী মুসলমান শাসন সম্পর্কে তাঁর বিশ্লেষণ ছিল অসঙ্গতভাবে পক্ষপাতপূর্ণ, ক্ষতিকর ও সমালোচনাপূর্ণ, তিনি তাঁর উপসংহার টানতে গিয়ে বলেছেন, ইসলাম হবে আগামী পৃথিবীর ধর্ম। এর সারল্য ও শক্তির জন্য ইসলাম বিজয় অর্জন করবে।

আন্তর্জাতিক রেডক্রস সম্পর্কে বলতে গেলে তাদের কাজ ও মনোভাবের প্রশংসা করতে হবে। সবচেয়ে প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও তারা যতটা সম্ভব যুদ্ধবন্দীদের সাহায্য করেছে। তাদের প্রতিনিধিদল প্রায়ই আমাদের খোঁজ-খবর নিতে এসেছে। সেটা ছিল তাদের দ্বিতীয় পরিদর্শন– তারিখটি আমার মনে নেই। বাংলাদেশ সরকার ৯০ জন অফিসার ও সৈনিকের বিচার করবে- এই মর্মে ভারতীয়রা ঘোষণা দেয়ার পরের ঘটনা এটা। সে তালিকায় আমার নামও ছিল। আমি আমার নির্দোষত্ব সম্পর্কে এতটা নিশ্চিত ছিলাম যে, আইসিআরসি প্রতিনিধি দলকে আমি নিরপেক্ষ কোনো দেশে আমার বিচারের আয়োজন করতে বলেছিলাম'। "কিন্তু তার আগে আমাকে ঢাকায় নিয়ে চলুন এবং মুজিবের সঙ্গে আমাকে দেখা করতে দিন। পাঁচ মিনিট কথা বলার পর তিনি যদি আমাকে জড়িয়ে না ধরেন তাহলে আপনারা আমাকে ফাঁসিতে ঝোলাতে পারেন।" আমার অনুরোধে অন্য সকলে ভীতিবিহ্বল হয়ে পড়েছিল, কারণ কারোই বিশ্বাস ছিল না যে, সুষ্ঠু ও ন্যায় বিচার করা হবে।

আমার কার্যক্রম সম্পর্কে মুজিবকে তাঁর স্ত্রী ভুল তথ্য দিয়েছিলেন। মুজিবের গ্রেফতারের পর তাঁর স্ত্রী তাঁদের ধানমণ্ডির বাসভবন ত্যাগ করে চলে যান এবং আর্মির ভয়ে ছদ্মবেশে তাঁর আত্মীয়দের সঙ্গে বাস করতে থাকেন। একদিন এক স্টাফ সদস্য আমাকে জানায় যে, তাঁর খোঁজ পাওয়া গেছে এবং তিনি অত্যন্ত দরিদ্র পারিপার্শ্বিক অবস্থায় বাস করছেন। আমি একজন অফিসারকে বার্তাসহ পাঠিয়ে তাকে জানালাম যে, তিনি তাঁর বাসায় ফিরে আসতে চাইলে আমরা স্বাগত জানাবো এবং তাঁর কোনে ক্ষতি করা হবে না। তিনি সে আমন্ত্রণ

প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। যা হোক, কয়েক মাস পর বাসায় ফিরে যাওয়ার অনুমতি চেয়ে তিনি আবার আমার কাছে বার্তা পাঠিয়েছিলেন। ততদিনে পরিস্থিতি অনেক বদলে গিয়েছিল। আর্মি ইন্টেলিজেন্স জানতে পেরেছিল যে, তাঁর উদ্দেশ্যের পেছনে অশুভ পরিকল্পনা রয়েছে। তিনি একটি বিদেশী দূতাবাসের কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করতে চান যা তাঁর বাসার কাছাকাছি অবস্থিত। এজন্য তার অনুরোধটিকে মার্শাল ল অ্যাডমিনিস্ট্রেটর বাতিল করে দিয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর দৃষ্টিতে অপরাধী হয়েছিলাম আমি। শেখ মুজিবের প্রত্যাবর্তনের পর তিনি নিশ্চয় এমন সব কাহিনী তাঁকে শুনিয়েছেন যার ফলে আমার ব্যাপারে মুজিবের মন বিষিয়ে উঠেছিল। অবশ্য নিহত হওয়ার আগে আবুধাবিতে সরকারি সফরকালে ইন্টেলিজেন্স ব্যুরোর কর্নেল রিয়াজের মাধ্যমে শেখ মুজিব আমার কাছে দুঃখ প্রকাশ করেছিলেন। কর্নেল রিয়াজ আমাদের দু'জনেরই খুব পরিচিত ছিলেন, তিনি পরবর্তীকালে আবুধাবিতে নিয়োজিত হয়েছিলেন।

যুদ্ধবন্দী শিবিরে থাকাকালে একজনের ভেতরে জীবনের বিশেষ কিছু দিক সম্পর্কে দার্শনিক মনোভাবের বিকাশ ঘটে। স্বাভাবিক অবস্থায় এসব দিকে তার দৃষ্টি পড়ে না। একটি অনুন্নত দেশে একজন আর্মি অফিসার সুবিধাভোগী শ্রেণীর সদস্য হয়ে থাকে এবং আমরাও এর ব্যতিক্রম ছিলাম না। আর্মিতে আমাদের চাকরির মেয়াদ বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আমরা আরামের জীবনে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিলাম। কষ্ট থেকে আরামে উত্তরণ একটি আনন্দজনক বিষয়, কিন্তু আরাম থেকে কষ্টে যাওয়াটা এক অরুচিকর অভিজ্ঞতা। আমাদেরকে এর মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছিল। একদিন আমি উপলব্ধি করলাম মানুষ কত সহজে জীবন কাটাতে পারে। আমার দু'জোড়া কাপড় ছিল, আমরা প্রকৃতপক্ষে গ্রামীণ জীবনে ফিরে গিয়েছিলাম। দিনের পর দিন কাপড় ধুয়ে পরার মধ্যে এবং পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে আমার কোনো অসুবিধে হয়নি। ফল ছিল এই যে, আমি যখন দেশে ফিরি তখন এর চাইতেও খারাপ কিছু ঘটলে তারও মোকাবিলা করার মতো বিশ্বাস আমার জন্মে গিয়েছিল। আমাকে যদি আমার ভবিষ্যত পরিকল্পনা সম্পর্কে কঠোরভাবে কোনো প্রশ্নের উত্তর দিতে হত তাহলে আমি বলতাম, "আমি আমার গ্রামে ফিরে যাব।"

আমার জীবনে অনেক উত্থান-পতন ঘটেছে। কারো যদি অবস্থা খারাপ হয়ে যায় তাহলে তার সে অবস্থা মেনে নেয়া উচিত এবং সাব-মেরিনের মতো নিমজ্জিত অবস্থায় থাকা উচিত। তার দুর্যোগ কেটে গেলে অবস্থা পুনরুদ্ধার করা উচিত।

ভারতীয়দের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে আমি জেনে বিস্মিত হয়েছি যে, আমাদের ধারণার বিপরীতে তাদের বুদ্ধিজীবীদের ভাবনা ছিল– পাকিস্তানের সৃষ্টির ফলে তারা 'গোলমালের সৃষ্টিকারী মুসলমানদের কবল থেকে নিষ্কৃতি পেয়েছিল।' তারা পাকিস্তানকে পুনরায় ভারতের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করার ব্যাপারে আগ্রহী ছিল না। পরিবর্তে তারা চারটি দুর্বল

মুসলিম রাষ্ট্রে সৃষ্টির পরিকল্পনা করছিল, যাতে তারা সেগুলোর ওপর আধিপত্য বিস্তার করতে পারে। তাদের মতে এক নতুন পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটেছিল। মুসলিম–অমুসলিম ভারতের বিভক্তি হয়েছিল। ভারত যদিও একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র হিসেবে সৃষ্টি হয়েছিল, তথাপি স্বাধীনতার পর ভারত সাম্প্রদায়িক উত্তেজনায় আক্রান্ত হয়েছে। সবচেয়ে আগে বিকশিত হয়েছিল তফসিলী সম্প্রদায়ের (অস্পৃশ্য হরিজন) বিরুদ্ধে কুসংস্কার- বর্ণহিন্দুদের মতে এদেরকে সমপর্যায়ের মানুষ হিসেবে গণ্য করা যায় না। তফসিলী সম্প্রদায় অহিংস পন্থায় নিজেদের অধিকারসমূহ প্রতিষ্ঠিত করেছে, এবং উল্লেখযোগ্যভাবে শক্তিশালী পক্ষ হিসেবে পরিণত হয়েছে। এরপর এসেছে শিখদের সঙ্গে সংঘাত, যার ফলে শিখদের জন্য পৃথক আবাসভূমির দাবি উঠেছে। নাগাল্যান্ড এবং সংলগ্ন অঞ্চলসমূহের খৃষ্টান ও উপজাতীয় জনগোষ্ঠীর সঙ্গে হিন্দুদের পার্থক্য রয়েছে। মুসলিম নেতৃবৃন্দের ভবিষ্যদ্বাণীকে সত্য প্রমাণিত করে সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুরা তাদের সত্যিকার রং দেখাতে শুরু করে। ধর্ম নিরপেক্ষতার আলখেল্লা ঝেড়ে ফেলে এবং নিজেদেরকে হিন্দু পুনর্জাগরণের সঙ্গে জড়িত করার মাধ্যমে পক্ষপতদুষ্ট মনোভাবের প্রদর্শন করে। সুতরাং ভারতের পরিস্থিতি এখন ১৯৪৭ সালের তুলনায় সম্পূর্ণ ভিন্ন রকম। ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলিম জনসংখ্যা শতকরা ৩.২ ভাগ হারে অতি দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে। যদি উপমহাদেশের সকল মুসলমান ঐক্যবদ্ধ হতে পারে এবং তফসিলী সম্প্রদায়, শিখ ও খৃষ্টান তথা অহিন্দুদের সহানুভূতি জয় করতে পারে তাহলে তারা উল্লেখযোগ্য শক্তি সঞ্চয় করতে, এমন কি সরকারও গঠন করতে সক্ষম হতে পারে– যদি ভুট্টোর মতো কোনো প্রতিভাবান ব্যক্তি থাকেন। আর সেটাই ছিল জনাব ভুট্টোর স্বপ্ন।

আমি মিঃ কারাকার লেখা একটি নিবন্ধ পড়েছিলাম, যিনি বোম্বের সাপ্তাহিক ব্লিট্জ-এর সম্পাদক ছিলেন। ১৯৭১ সালের পর তিনি পাকিস্তান সফর করেন এবং জনাব ভুট্টোর একটি সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন। রেকর্ডকৃত সাক্ষাৎকারে জনাব ভুট্টো দুটি তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় বলেছিলেনঃ

ক. ভারত ও পাকিস্তানের রাজনীতি হল রাজার রাজনীতি। আপনি প্রকাশ্যে যা বলেন তা অফিসিয়াল ক্ষমতায় করেন না।

খ. আমি ভারতের প্রধান মন্ত্রী হতে পারব না। কিন্তু আমি এর পররাষ্ট্রমন্ত্রী হতে পারব। এর পররাষ্ট্রমন্ত্রী হলে আমি বিশ্বকে দেখিয়ে দেব যে, কিভাবে একটি বিরাট দেশের পররাষ্ট্রনীতি পরিচালনা করতে হয়।

জনাব ভূট্টোর ধীশক্তি ও বুদ্ধিমত্তার পাশাপাশি ভারতের সামরিক ও কৌশলগত শক্তির ভিত্তিতে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, তিনি অযথা দম্ভ দেখান নি।

একদিন খ্যাতনামা ঐতিহাসিক মিঃ পিয়ারে লাল, যিনি ইন্ডিয়ান ডিফেন্স কলেজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, আমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এলেন। আমার সঙ্গে তিনি দীর্ঘ আলোচনা

করলেন। তিনি ভারতীয় পরিকল্পনার ব্যাপারে আমার মতামত জানতে চাইলেন। আমি বললাম, "এতে কোনো পরিকল্পনাই ছিল না। আপনারা তিন দিক থেকে নয় ডিভিশন সৈন্যের সুবিশাল বাহিনী নিয়ে আক্রমণ করেছিলেন– যে বাহিনীটিকে বড় জোর পুলিশ বাহিনী বলা যায়। আমি সম্পূর্ণরূপে সামরিক বিশ্লেষকের দৃষ্টিকোণ থেকে বলছি। পরিকল্পনাটি চিত্তাকর্ষক হতে পারত যদি আপনারা চার বা পাঁচ ডিভিশন সৈন্য নিয়ে পূর্ব পাকিস্তানকে জয় করতে পারতেন। সে ক্ষেত্রে গৃহীত বিভিন্ন মনোভাব প্রশংসিত হতে পারত এবং কৌশলের সূক্ষ্মতা মূল্যায়িত হত। তিন দিকের সকল দিক থেকে অগ্রসর হওয়ার এবং ঢাকার দিকে যাওয়ার উদ্দেশ্যে পরিকল্পনা করার জন্য কোনো প্রতিভার প্রয়োজন পড়ে না। সকল বাহিনীকে সীমান্তে সন্নিবেশিত করে এমন কি বর্ডার সিকিউটিরি ফোর্সকে দিয়েও পূর্ব পাকিস্তান বাহিনীকে পরাভূত করা সম্ভব ছিল এবং তারপর যেমনটি ঘটেছে সেভাবে মধ্যভাগ ভেঙে তার মধ্য দিয়ে এক ডিভিশন সৈন্য ঢাকায় পৌঁছাতে পারত। সেটাই হত স্টাফ কলেজের শিক্ষানুযায়ী মেধাবী পরিকল্পনা, হয়তো হত ১৯৩৯ সালে গুডেরিয়ার ওয়ারশ অভিযানের সমমানের একটি পদক্ষেপ। ভারতীয় পরিকল্পনা একটি মধ্যমানের পরিকল্পনা ছিল-এ ব্যাপারে পিয়ারে লাল আমার সঙ্গে একমত হলেন না। আমার মতে পরিকল্পনাটি সফল হয়েছিল এ কারণে যে, এটা ছিল একটি ত্রুটিপূর্ণ আত্মরক্ষামূলক পরিকল্পনা। অন্যথায় এটা উপযুক্ত ছিল ঢাকার চারপাশে নদীর তীর ধরে পশ্চাদপসরণসহ সকল ফ্রন্ট থেকে পর্যায়ক্রমিক পশ্চাদপসরণর আত্মরক্ষামূলক কৌশল হিসেবে।

আমার সংবেদনশীলতাকে কাজে লাগিয়ে একজন রাজপুত হিসেবে তিনি বললেন, "আপনি বুদ্ধিমান, কারণ আপনার ভেতরে রয়েছে হিন্দু রক্ত।" কিছু অজানা কারণে তিনি যোগ করে বললেন, "আপনার প্রেসিডেন্টেরও একই রক্ত রয়েছে।" প্রেসিডেন্টের পূর্বপুরুষদের সম্পর্কে আমার জানা ছিল না, আমি তাই কোনো মন্তব্য করিনি। কিন্তু সেই সাথে মুসলমানদের তুলনায় হিন্দুদের বুদ্ধিমত্তার শ্রেষ্ঠতার মতামতের সঙ্গেও আমি একমত হতে পারিনি। এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই যে, হিন্দুরা বেশি বিদ্বান, ভালো শিক্ষিত, তাঁদের মধ্যে রয়েছে আন্তর্জাতিক মানের শিক্ষাবিদ, বিজ্ঞানী, দার্শনিক ও বুদ্ধিজীবী। কিন্তু তাঁরা হলেন তাঁদের মনোভাব এবং কঠোর পরিশ্রম ও শিক্ষার ব্যাপারে অধ্যবসায়ের সৃষ্টি, এ ক্ষেত্রে ধর্মীয় কারণের কোনো অবদান নেই। হিন্দু ছেলেমেয়েরা লেখাপড়ায় অনেক বেশি আত্মনিবেদিত হয়ে থাকে। মুসলিম ছেলেরা সময় নষ্ট করে। হিন্দুদের তুলনায় তাদের আইকিউ অনেক উঁচু- যার প্রমাণ মেলে উপমহাদেশের বাইরে বিভিন্ন দেশে মুসলিম ছেলেদের কৃতিত্ব থেকে। পাকিস্তান সৃষ্টি করতে হয়েছিল, কারণ শিক্ষায় আমরা মূলত পেছনে পড়েছিলাম। আমাদের তরুণ প্রজন্ম যদি শিক্ষা ক্ষেত্রে এগিয়ে যেতে না পারে তাহলে পাকিস্তানের টিকে থাকার উদ্দেশ্যটিও অস্বীকৃত হবে।

যুদ্ধবন্দী শিবিরের চার দেয়াল তথা স্তরবিশিষ্ট কাঁটাতারের বেড়ার ভেতরে থাকলেও চারদিকের ভারতীয় জীবনকে দেখা যেত। আমাদের শিবিরের খুব কাছে সামরিক দালান কোঠার নির্মাণ কাজ আমরা দেখতে পেতাম। প্রতিদিন সকালে একদল শ্রমিক এসে এ সব প্রতিষ্ঠানের প্রবেশদ্বারে সমবেত হত, ঠিকাদাররা তাদের মধ্য থেকে প্রয়োজনীয় সংখ্যক শ্রমিককে বাছাই করত এবং বাকিদেরকে জোরপূর্বক তাড়িয়ে দিত, তারা হাত জোড় করে কাজের জন্য আবেদন জানাত। একজন পুরুষকে দৈনিক ৬ রুপী এবং একজন নারীকে ৩ রুপী দেয়া হত। ঠিকাদাররা পুরুষের তুলনায় নারী শ্রমিককে অগ্রাধিকার দিত। কারণ অর্ধেক অর্থে এদেরকে দিয়ে অনেক বেশি সময় পর্যন্ত কাজ করিয়ে নেয়া যেত। নারী শ্রমিকরা ক্লান্ত হয়ে পড়লে এবং একটু বিশ্রাম করতে থাকলে ঠিকাদাররা তাদের লাঠি দিয়ে পেটাত। পাকিস্তানে এ রকমটি ঘটার কথা কল্পনাও করা যায় না। ঐ এলাকায় শ্রমিকদের শারীরিক অবস্থা ছিল শোচনীয়। তাদের অধিকাংশকেই মনে হত অভুক্ত। মধ্যভারতে পুরুষদের অনেকগুলো স্ত্রী রয়েছে, যারা তাদের স্বামীদের জন্য কাজ করে। মুসলমানদের মধ্যে চারটি পর্যন্ত স্ত্রী রাখার বিধান থাকায় পাশ্চাত্য ব্যস্তবাগীশ হয়ে পড়ে। কিন্তু তারা সমান ব্যবহার এবং এতিম ও বিধবাদের দিকে সবিশেষ যত্নের প্রেক্ষাপটের কোনো উল্লেখ পর্যন্ত করে না। তারা কখনো হিন্দু ধর্মের ব্যাপারে উচ্চবাক্য করে না– যেখানে কোনো নিষেধাজ্ঞা নেই– চার স্ত্রীর কথা বাদ দিন, এতে এমন কি একজন পুরুষের দাসত্বের জন্য এবং তার কাজ করার জন্য ২০ জন পর্যন্ত নারী থাকার ও অসংখ্য ঘটনা রয়েছে।

পাকিস্তানের ভাঙনে রাজনীতিবিদদের দায়িত্ব

প্রতি বছর ১৬ ডিসম্বরকে ঘিরে পূর্ব পাকিস্তান ট্রাজেডিকে বাতাসে ভাসিয়ে দেয়া এখন একটি নিয়মে পরিণত হয়েছে। এ ক্ষেত্রে ষড়যন্ত্রমূলক বিষয়টি হলো, ১৯৭১ সালের ঘটনা প্রবাহের সমগ্র দায়-দায়িত্ব পাকিস্তানের সশস্ত্র বাহিনীর ওপর চাপিয়ে দেয়া হয়। উদ্দেশ্য, জাতি ও বিশ্বের চোখে তাদেরকে অসম্মানিত করা। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান তথা উভয় প্রদেশের রাজনৈতিক দলসমূহ ও নেতৃবৃন্দের পালিত ভূমিকা সম্পর্কে খুব সামান্যই প্রকাশ করা হয়।

নিজেদের তেমন কোনো বক্তব্য না দিয়ে পূর্ব পাকিস্তানের ট্রাজেডিতে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের ভূমিকা আমরা জাতির সামনে উপস্থিত করছি। আসুন, আমরা দেখি জনাব ভুট্টো তার 'দ্য গ্রেট ট্রাজেডি'-তে কি বলেছেন। নিচে প্রাসঙ্গিক অংশবিশেষই শুধু উদ্ধৃত করা হয়েছে ঃ

পৃ - ২: নেতারা জনগণের সঙ্গে ব্যর্থ ঃ সংকটটি হঠাৎ করে আমাদের ওপর নেমে আসেনি। পাকিস্তানের পর্যায়ক্রমিক সরকারগুলো রাষ্ট্রের কার্যকলাপ এত নিকৃষ্টভাবে পরিচালনা করেছে যে, একজন নিরপেক্ষ পর্যবেক্ষককে উপসংহার টানতে গিয়ে এ কথা অবশ্যই বলতে হবে ,পাকিস্তানের নেতৃত্ব ভুল করার ক্ষেত্রে একজন অন্যজনকে ছাড়িয়ে গেছেন।

'দেশ বিভাগের কিছু দিন পরই ভাষা বিতর্কের সূচনা হয় এবং দেশের দু'অঞ্চলের মধ্যে তিক্ততার শুরু হয়।'

'পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতা ১৯৪৮ সালের সেপ্টেম্বরে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর মৃত্যুর পর লিয়াকত আলী খানের ওপর নেতৃত্বের দায়িত্ব পড়ে, যাঁকে তিন বছর পর হত্যা করা হয়। পরবর্তীকালে প্রাধান্যে আগত মুসলিম লীগের অন্য নেতাদের মধ্যে পাকিস্তানকে গতিশীল ও প্রগতিশীল রাষ্ট্র হিসেবে পরিণত করার সাহস ও কল্পণাশক্তির অভাব ছিল। মোহভঙ্গের

প্রথম লক্ষণ দেখা দেয় স্বাধীনতার বছর পাঁচেক পর। জনগণ নিজেদের বিচ্ছিন্ন এবং প্রকৃতপক্ষে প্রতারিত ভাবতে শুরু করে। সংকীর্ণমনা রাজনীতিকরা পাকিস্তানকে তাঁদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি হিসেবে বিবেচনা করতে থাকেন এবং ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য সংবিধান প্রণয়ন ও নির্বাচন স্থগিত রাখেন। এজন্য পাকিস্তানকে তখন থেকে ব্যর্থতার বিরাট মূল্য দিতে হয়েছে।'

পৃ-৭ ঃ পূর্ব পাকিস্তানের চরমপন্থী নেতৃবৃন্দ পূর্ব পাকিস্তানে তাদের জনগণকে বলার উদ্দেশ্যে ইচ্ছাকৃতভাবে চীনের চরমপত্রের ভুল অর্থ করেন এবং জনগণকে বোঝান যে, পাকিস্তানের সশস্ত্র বাহিনী নয়, বরং চীনের চরমপত্রই পূর্ব পাকিস্তানকে রক্ষা করেছে (১৯৬৬ সালের মার্চে ঢাকায় অনুষ্ঠিত জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে জনাব ভুট্টো নিজেই আসলে তাঁর ভাষণে কথাটি বলেছিলেন, যা তিনি পূর্ব পাকিস্তানের নেতৃবৃন্দের ওপর চাপিয়ে দিয়েছেন)। চীনের চরমপত্র ভারতকে পূর্ব পাকিস্তান আক্রমণ করা থেকে বিরত রেখেছিল, কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, ভারতের তেমন কোনো আগ্রাসন প্রতিহত করার যোগ্যতা আমাদের সশস্ত্র বাহিনীর ছিল না।

পৃ-৮ ঃ 'শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর ছয় দফা ফর্মুলা উপস্থাপিত করেন।'

পৃ-১১ঃ 'সামগ্রিকভাবে ফর্মুলাটি ছিল একটি কনফেডারেশনের গোপন সনদ, যার মধ্যে সাংবিধানিক বিচ্ছিন্নতার বীজ নিহিত ছিল।'

পৃ-৯ ঃ 'কয়েক শতাব্দী আগে মেকিয়াভেলির পর্যবেক্ষণ ছিল এই যে, ভুল রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত হল যক্ষ্মা রোগের মতো- যা সূচনাকালে সনাক্ত করা কঠিন কিন্তু সারিয়ে তোলা সহজ এবং সময় পেরিয়ে যাওয়ার পর সনাক্ত করা সহজ কিন্তু সারানো কঠিন হয়ে থাকে।'

পৃ-১৪ ঃ 'পশ্চিম পাকিস্তানের স্বল্প সংখ্যক রাজনীতিবিদ শুরু থেকেই উৎসাহের সঙ্গে শেখ মুজিবুর রহমানকে সমর্থন দিয়েছিলেন। কারণ তারাও পশ্চিম প্রদেশে তাদের নিজেদের প্রদেশগুলোর বিচ্ছিন্নতা চেয়েছিলেন। ছয় দফার মধ্যে তারা পাকিস্তানকে ধ্বংস করায় তাদের সুযোগের সন্ধান পেয়েছিলেন।' (এর মধ্যে রয়েছেন পশ্চিম পাকিস্তানের রাজনীতিকরা, যারা পাকিস্তানকে ধ্বংস করতে চেয়েছিলেন।)

পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা জুড়ে জনাব ভুট্টো সংকট সৃষ্টির জন্য শেখ মুজিবুর রহমানকে দোষারোপ করেছেন। আমি নিশ্চিত যে, শেখ মুজিবও একই কারণে ভুট্টোকে দোষারোপ করেছেন। ৪৮ পৃষ্ঠায় জনাব ভুট্টো বলেছেন, "এটা জানতে পারা ভয়ঙ্কর যে, তিন জোড়া হাতের মধ্যে রয়েছে আমাদের দেশবাসীর ভাগ্য ও ভবিষ্যত এবং আল্লাহ তাঁর প্রাজ্ঞতা দিয়ে আমার হাতকেও এগুলোর মধ্যে রেখেছিলেন।"

এবার দেখা যাক ৩৬ জন পাকিস্তানী, ৪৯ জন ভারতীয়, ১২ জন বাংলাদেশী এবং ৯ জন মার্কিনী উচ্চ পদস্থ সামরিক ও রাজনৈতিক নেতার সাক্ষাৎকার এবং আট বছরব্যাপী

গবেষণার পর প্রকাশিত 'ওয়ার অ্যান্ড সিসেশন- পাকিস্তান ইন্ডিয়া অ্যান্ড দ্য ক্রিয়েশন অফ বাংলাদেশ' গ্রন্থে লেখকদ্বয় মিঃ সিশন ও রোজ কি বলেছেন।

পূর্ব পাকিস্তানের সংকট ছিল সি এম এল এ-র উদার সাংবিধানিক আদেশ সৃষ্টির এবং ক্ষমতা থেকে সরে আসার আয়োজনের আশু/ সাম্প্রতিক/ ১৯৭০ সালের ফলাফল। ১৯৬৯ সালের ২৬ মার্চ ক্ষমতা গ্রহণকালে জেনারেল ইয়াহিয়া ইঙ্গিত দিয়েছিলেন যে, তার উদ্দেশ্য হল ক্ষমতা থেকে সরে যাওয়ার আয়োজন করা। একই দিন তিনি আরো ইঙ্গিত দিয়েছিলেন যে, 'প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোটে স্বাধীন ও নিরপেক্ষভাবে নির্বাচিত জনগণের প্রতিনিধিদের' প্রণীত সংবিধানসহ প্রতিনিধিত্বশীল সরকারের কাছে ক্ষমতা ফিরিয়ে দেয়ার আয়োজন করাই ছিল তার উদ্দেশ্য। ১৯৭০ সালের ৩০ মার্চ ১৯৭০ সালের লিগ্যাল ফ্রেম ওয়ার্ক অর্ডার বা আইনগত কাঠামো আদেশ ঘোষিত হয়েছিল। এর ঘোষণা দানকালে সে বছরের অক্টোবরে জাতীয় ও প্রাদেশিক পর্যায়ে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের আহ্বান জানানো হয়েছিল। এরপর নব নির্বাচিত জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহ্বান করা হবে এবং এই পরিষদ একটি সংবিধান প্রণয়ন সংস্থা হিসেবে তার প্রথম অধিবেশনের ১২০ দিনের মধ্যে একটি খসড়া সংবিধান প্রণয়ন করবে।

'১৯৭০ সালের ৭ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত ৩০০ আসনের জাতীয় পরিষদের নির্বাচনে শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বাধীন আঞ্চলিকতাবাদী আওয়ামী লীগ পূর্ব পাকিস্তানের দুটি ছাড়া সকল আসনে জয় লাভের মাধ্যমে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেছিল। জেড এ ভুট্টোর নেতৃত্বাধীন পিপিপি পশ্চিম পাকিস্তানের চারটি প্রদেশে সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনে জয় লাভ করে। তিনি পূর্ব পাকিস্তানের একটি আসনের জন্যও প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন নি।'

'নির্বাচনের মধ্য দিয়ে দুটি প্রভাবশালী আঞ্চলিক দলের অভ্যুদয়ের ফলে রাজনৈতিক যুদ্ধের সূচনা হয়েছিল। উভয়েই জাতীয় পর্যায়ে ক্ষমতা অর্জনের প্রচেষ্টা চালাতে থাকে। প্রথম দলটি সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন করার আইনগত আধিপত্য ও অধিকারের বলে নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে চায়, অন্য দলটি বৃহত্তর আঞ্চলিক প্রতিনিধিত্বের 'ঐকমত্যের সংখ্যাগরিষ্ঠতা'র ভিত্তিতে শাসনকাজে অংশ গ্রহণে নিজের দাবি প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চালায়। প্রতিটি দলই নিজের দাবির প্রতি সম্মান প্রদর্শিত না হলে শাসনকার্য পরিচালনাকে অসম্ভব না করলেও অসুবিধাজনক করে তোলার হুমকি দিতে থাকে।

'দুটি দলই মতাদর্শগতভাবে বিভক্ত থাকায়' অঞ্চলভিত্তিক দল হওয়ায় এবং নেতাদের ব্যক্তিত্বের সংঘাত ও পরস্পরের পরিকল্পনা সম্পর্কে ভীত থাকার কারণে দলীয় সংহতিকে বেশি গুরুত্ব দেয়া হতে থাকে, যা আপোসের পথ বন্ধ করে দেয়। নির্বাচনের পর সময় পেরিয়ে যাওয়ার সাথে সাথে স্বাভাবিক সন্দেহ ও অবিশ্বাস ঘনীভূত হয় এবং প্রতিটি দলের পক্ষেই দাবি অনমনীয় হয়ে ওঠে।

'আওয়ামী লীগ ছয় দফার প্রশ্নে অনমনীয় হয়ে ওঠে, যা প্রাথমিক পর্যায়ে 'ঈশ্বরের বাণী নয়'কারণে আলোচনাসাপেক্ষ ছিল। তারা সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসনের নীতির ব্যাপারে আপোসে সম্মত থাকেনি, যদিও পশ্চিম পাকিস্তানের ক্ষুদ্রতর দলগুলোকে তারা সরকারে অংশীদার হিসেবে গ্রহণ করতে রাজি ছিল।

'দলকে ঐক্যবদ্ধ রাখার পাকিস্তান পিপলস পার্টির নেতৃত্বের প্রধান উদ্দেশ্যটিকে জটিল করেছিল জাতীয় পর্যায়ে প্রাধান্যে আসার জন্য ভুট্টোর আকাঙ্ক্ষা। পিপিপির সর্বোচ্চ নেতৃবৃন্দ আগেই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে, সরকারগত ক্ষমতায় অংশীদারিত্বের নিশ্চয়তা ছাড়া তারা জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে অংশ নেবেন না।

'অন্যদিকে আওয়ামী লীগ তার 'ছয় দফাভিত্তিক' সংবিধানের বাগাড়ম্বরকে পরিবর্তিত করা তার বাস্তবায়নের অঙ্গীকারের দিকে এগোতে শুরু করেছিল। নির্বাচনকে ছয় দফার ওপর গণভোট হিসেবে আখ্যায়িত করা হচ্ছিল। এর বিরোধিতা করতে গিয়ে জাতীয় পরিষদে সংখ্যালঘিষ্ঠ অবস্থান সত্ত্বেও পিপিপি নিজেকে 'পাকিস্তানের দুই সংখ্যাগরিষ্ঠ দলে'র একটি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য প্রচারাভিযান শুরু করেছিল। মার্চের শেষ দিকে মিলিটারি ক্র্যাকডাউনের আগে পর্যন্ত একটি রাজনৈতিক মীমাংসার লক্ষ্যে সূচিত আলাপ-আলোচনার সমগ্র পর্যায়ে ভুট্টোও আক্রমণাত্মক ও সংঘাতমুখী ছিলেন। ২০ ডিসেম্বর লাহোরে তিনি ঘোষণা করেন যে, পিপিপি-র সহযোগিতা ছাড়া কোনো সংবিধান প্রণয়ন করা কিংবা জাতীয় পর্যায়ে কোনো সরকার গঠন করা যাবে না। তিনি স্পষ্ট ভাষায় উল্লেখ করেন যে, পিপলস পার্টি বিরোধী আসনে বসার জন্য প্রস্তুত নয় এবং ক্ষমতায় আসার জন্য আরো পাঁচ বছর অপেক্ষা করাও তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। পিপলস পার্টিকে এখনই ক্ষমতায় অংশীদার হতে হবে। (পাকিস্তান টাইমস, ২১ ডিসেম্বর '১৯৭০)

শেখ মুজিব তাঁর প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছিলেন ৩ জানুয়ারি (১৯৭১) এতে তিনি ঘোষণা করেন যে, সংবিধান ছয় দফার ভিত্তিতে প্রণয়ন করা হবে এবং কেউই তা প্রতিহত করতে পারবে না। তিনি সেই সাথে এ কথাও ঘোষণা করেন যে, সংবিধান প্রণয়নের প্রক্রিয়ায় তিনি পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণের স্বার্থ রক্ষার অনুকূল সাড়া দিতে প্রস্তুত রয়েছেন। তিনি স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন যে, আওয়ামী লীগ সমগ্র দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ দল- দেশে দুটি সংখ্যাগরিষ্ঠ দল থাকতে পারে না এবং প্রতিনিধিত্বশীল পদ্ধতির নিয়মানুসারে তাঁর দল কর্তৃত্ব ও দায়িত্ব নিয়ে ভূমিকা পালন করবে। আওয়ামী লীগ পশ্চিম পাকিস্তানের প্রতিনিধিদের সহযোগিতা নিয়ে সংবিধান প্রণয়ন করবে।

সংবিধানের বিভিন্ন প্রশ্নে আলোচনার মাধ্যমে সমঝোতায় আসার ক্ষেত্রে নেতৃবৃন্দের স্পষ্ট ব্যর্থতার প্রেক্ষিতে জানুয়ারির প্রথম দিকে ইয়াহিয়া আরো সরাসরি সংলাপের উদ্যোগ নিতে বাধ্য হয়েছিলেন। তিনি ১২ জানুয়ারি ঢাকা সফরে যান। ঢাকায় অবস্থানের শেষ পর্যায়ে

ইয়াহিয়া শেখ মুজিবকে পাকিস্তানের ভবিষ্যত প্রধান মন্ত্রী হিসেবে উল্লেখ করে বলেন যে, তিনি তাঁর নিজের দায়িত্ব শেষ করেছেন, তিনি এখন তাঁর অফিস ত্যাগ করার প্রস্তুতি নিচ্ছেন এবং অচিরেই ক্ষমতা হস্তান্তরের পালা সম্পন্ন হবে। উভয় নেতাই পৃথক পৃথকভাবে আলোচনায় সন্তুষ্টি প্রকাশ করে ভবিষ্যতের ব্যাপারে আশাবাদ ব্যক্ত করেছিলেন।

১৯৭১ সালের ১৭-১৮ জানুয়ারি ইয়াহিয়া জনাব ভুট্টোর অতিথি হয়েছিলেন। শেখ মুজিবকে অযথা এবং আগেই 'প্রধান মন্ত্রী বানানো'র কারণে কোন রকম লুকোচুরি না করে ভুট্টো ইয়াহিয়ার কাছে নিজের ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন। জবাবে ইয়াহিয়া বলেছিলেন যে, তিনি মুজিবকে প্রধান মন্ত্রী বানাননি, বানিয়েছে তার অর্জিত সংখ্যাগরিষ্ঠতা।

ভুট্টো তখন ইয়াহিয়াকে মুজিবের আনুগত্যের পরীক্ষা নিতে বলেছিলেন। মুজিব যদি 'খাঁটি পকিস্তানী' হয়ে থাকেন, তাহলে মুলতবির ঘটনা একটি পরীক্ষার কাজ করবে।

১৯৭১ সালের ২৭–৩০ জানুয়ারি পিপিপি প্রতিনিধি দল ঢাকা সফরে গিয়েছিলেন। নতুন সরকারে ভুট্টো তাঁর নিজের ও দলের অবস্থান নির্ধারণ করতে চেয়েছিলেন। তিনি প্রেসিডেন্ট হওয়ার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। কিন্তু মুজিব ক্ষমতা ভাগাভাগি করতে অস্বীকার করেছেন।

১৩ ফেব্রুয়ারি ইয়াহিয়া ঘোষণা করেন যে, ১৯৭১ সালের ৩ মার্চ ঢাকায় জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহ্বান করা হবে।

১৫ ফেব্রুয়ারী ভুট্টো ঘোষণা করেন যে, জাতীয় পরিষদের ৩ মার্চ অনুষ্ঠেয় অধিবেশনের উদ্বোধনীতে যোগ দিতে পিপলস পার্টি ঢাকায় যাবে না। তিনি তাঁর দলের সদস্যদেরকে 'দ্বৈত জিম্মি' হওয়ার জন্য ঢাকায় যেতে দিতে পারেন না বলেও ভুট্টো ঘোষণা করেছিলেন।

এমন কি পূর্ব পাকিস্তানের অন্য নেতৃবৃন্দও তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছিলেন। এঁদের মধ্যে ছিলেন নূরুল আমীন ও আতাউর রহমান খান। শেষোক্তজন ঘোষণা করেছিলেন যে, ভুট্টোর অবস্থান ছিল পাকিস্তানকে বিভক্ত করার উদ্দেশ্যে গৃহীত।

ভুট্টোর রাজনৈতিক আক্রমণ থেমে যায়নি। ১৭ ফেব্রুয়ারি তিনি ঘোষণা করেন,"ঢাকায় জাতীয় পরিষদের অধিবেশন হবে একটি কসাইখানা।" জবাবে মুজিবের প্রতিক্রিয়া ছিল, ঢাকা যদি ভুট্টোর জন্য কসাইখানা হয়, তাহলে পশ্চিম পাকিস্তানও তার জন্য অবশ্যই একই বিষয় হবে। তিনি শেষ পর্যন্ত প্রেসিডেন্টের সঙ্গে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে পশ্চিম পাকিস্তানে না যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন।

১৮ ফেব্রুয়ারি ভুট্টো প্রেসিডেন্টের সঙ্গে সাক্ষাত করেছিলেন। প্রেসিডেন্টের অফিসের প্রাধ্যান্য পুনঃপ্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে ইয়াহিয়া মুজিবের ওপর সিদ্ধান্ত চাপানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। ২৮ ফেব্রুয়ারি লাহোরে ভুট্টো এই মর্মে হুমকি উচ্চারণ করেন যে, রাজনৈতিক পরিস্থিতির ওপর তার নিয়ন্ত্রণ অস্বীকৃত হলে তিনি ব্যক্তিগত ও প্রকাশ্য ক্ষতি সাধন

করবেন। তিনি তাঁর স্বভাবজাত ভাষায় ও স্টাইলে অঙ্গীকার ঘোষণা করতে গিয়ে বলেন যে, তাঁর দলের কোনো সদস্য ঢাকায় যাওয়ার ঔদ্ধত্য দেখালে তার 'পা ভেঙে ফেলা হবে' এবং অন্য দলীয় সদস্যদেরকে একমুখী টিকেট করতে হবে অর্থাৎ তাঁদেরকে আর পশ্চিম পাকিস্তানে ফিরতে দেয়া হবে না। ভুট্টো আরো ঘোষণা দেন যে, তিনি সাধারণ ধর্মঘট আহ্বান করবেন এবং খাইবার থেকে করাচী পর্যন্ত রাজনৈতিক আন্দোলন শুরু করবেন।

পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলোতে আমি বর্ণনা করেছি, ছয় দফার ওপর ভিত্তি করে প্রচারণা চালাতে গিয়ে মুজিব ও তাঁর দল কিভাবে পশ্চিম পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ঘৃণার সৃষ্টি করেছিলেন, কিভাবে পশ্চিমের ভাইদের বিরুদ্ধে বাঙালীদের ভাবাবেগ ও অনুভূতিকে উস্কে দিয়েছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত কিভাবে সরকারের সকল কার্যক্রম দখল করে নিয়েছিলেন। এটা ছিল এক প্রকাশ্য বিদ্রোহ, যার বিরুদ্ধে আর্মিকে অ্যাকশনে যেতে হয়েছিল। এর পরপর ঘটেছিল ভারতীয় হস্তক্ষেপ, যার পরিণাম ছিল আমাদের দেশের ভাঙন।

ওপরে যা বলা হয়েছে তা সত্ত্বেও ইয়াহিয়ার দায়িত্বকে খাটো করার উপায় নেই। যা কিছু ঘটেছে তার সবকিছুর জন্যই সম্পূর্ণরূপে তিনি দায়ী ছিলেন, শুধু আর্মিকে সমালোচনা ও দোষারোপ করার প্রবণতাটুকু ছাড়া। একটি প্রতিষ্ঠান হিসেবে আর্মিকে সমালোচনা ও দোষারোপ করার অর্থ হল আমাদের শত্রুর অশুভ উদ্দেশ্যকে সাহায্য করা।

হামুদুর রহমান কমিশন

এই বইয়ের মূল খসড়া রূপরেখায় আমি হামুদুর রহমান কমিশনের কোনো উল্লেখ করিনি। কারণ বারবার আমাদের বলা হয়েছে যে, এর রিপোর্ট একটি গোপন দলিল। অবশ্য রাজনৈতিক ও সাহিত্য অঙ্গনের (সাংবাদিক) বিভিন্ন ব্যক্তিত্ব বিভিন্ন সময়ে এর ওপর মন্তব্য করেছেন। সাম্প্রতিককালে প্রাথমিক রিপোর্টের শুধু নির্বাচিত অংশ একাধিক সংবাদপত্রে প্রকাশিত হচ্ছে। সুতরাং কমিশনের ওপর এবং আমার সম্পর্কিত এর রিপোর্টের ওপর লেখার ব্যাপারে আমি মুক্ত বোধ করছি।

ভারতে ২ বছর ৪ মাস যুদ্ধবন্দী হিসেবে কাটানোর পর ১৯৭৪ সালের ২১ এপ্রিল আমি শেষ দলটির সঙ্গে পাকিস্তান প্রত্যাবর্তন করি। আমাদের আন্তরিকভাবেই অভ্যর্থনা জানানো হয়েছিল। কিন্তু এক ধরনের গোপনীয়তার ও গুরু গম্ভীর আচরণের পরিবেশ বিরাজমান ছিল। আমাদের প্রশ্ন করার জন্য সংবাদ মাধ্যমের কোনো লোকজন সেখানে ছিল না; সে ছিল এক অস্বাভাবিক পরিস্থিতি।

১৯৭১ সালের ঘটনাবলীর অব্যবহিত পরই আমাদের দেশে বিশাল আকারের পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল। জনাব ভুট্টো 'নতুন পাকিস্তান'-এর প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন এবং হয়তো আমাদের নিরাপত্তা বিধানের উদ্দেশ্যেই আমাদের বিচ্ছিন্ন রাখার ব্যবস্থা নেয়া হয়েছিল। আমরা কেবল সরকারিভাবে নিয়োজিত সংস্থাসমূহের কাছে আমাদের কাহিনী বলতে পারব এবং অফিসারদের একটি টিম আমাদের জিজ্ঞাসাবাদ করবে। প্রকৃতপক্ষে পূর্ব পাকিস্তানের বাহিনীর সকলেই আমার প্রত্যাবাসনের আগেই ফিরে এসেছিল এবং তাদেরকে যথোচিতভাবে জিজ্ঞাসাবাদও করা হয়েছিল। সুতরাং পরিস্থিতি সম্পর্কে আমরা ব্যক্তিগতভাবে যেমনটি ভেবেছিলাম, তার চাইতে অনেক পরিষ্কার চিত্র ছিল জিজ্ঞাসাবাদকারীদের সামনে। আমাদেরকে একটি প্রশ্নমালা দেয়া হয়েছিল এবং আমরা তা পূরণ করেছিলাম। পত্যেক ব্যক্তি সম্পর্কে রিপোর্ট জি এইচ কিউ-তে পাঠানো হয়েছিল,

যেখানে লেঃ জেনারেল আফতাব আহমেদ খানের নেতৃত্বে একটি বিশেষ কমিটি গঠন করা হয়েছিল। আর্মি, নেভি ও বিমান বাহিনী থেকে মেজর জেনারেল বা সমপদমর্যাদার তিনজন সিনিয়র অফিসার এই কমিটির সদস্য ছিলেন।

অন্য সিনিয়র অফিসারদের মতো আমিও এই কমিটির সামনে উপস্থিত হয়েছিলাম। আমি এখানে একটি বিষয়ের উল্লেখ করতে চাই। কোনো ব্যক্তি নিজেকে নির্দোষ দাবি করতে বা আত্মপক্ষ সমর্থন করতে চাইতে পারে, কিন্তু যখন কোনো কমিটি বা কমিশন গঠিত হয় এবং তার কাছে অন্যদের বিবৃতিও সংরক্ষিত থাকে, তখন সে কমিটি বা কমিশন কোনো সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার আগে সকল বিবৃতির মধ্যে তুলনা করে, মিলিয়ে দেখে সত্য তথ্য জেনে নেয়ার মতো অবস্থায় থাকে। ফলে যে সিদ্ধান্তটি নেয়া হয় তা নেয় একটি নিরপেক্ষ সংস্থা এবং বেশির ভাগ ক্ষেত্রে সেটা সঠিক হয়, যার আলোকে সে কমিটি সংশ্লিষ্ট অফিসারদের জন্য চাকরিতে রাখার, শাস্তিমূলক ব্যবস্থার কিংবা অবসর প্রদানের সুপারিশ করে থাকে। আমাকে সম্মানের সাথে অব্যাহতি দেয়া হয়েছিল। এর অব্যবহিত পরপর আমাদেরকে হামুদুর রহমান কমিশনের সামনে উপস্থিত হতে হয়েছিল। পূর্ব পাকিস্তানে সামরিক পরাজয়ের প্রেক্ষাপট সম্পর্কে তদন্ত পর্যালোচনার জন্য এই কমিশন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এটা ছিল একটি বিচার বিভাগীয় সংস্থা যার প্রধান ছিলেন পাকিস্তানের প্রধান বিচারপতি জনাব হামুদুর রহমান। কমিশনের অন্য সদস্যরা ছিলেন :

১. বিচারপতি জনাব তোফায়েল এ. রেহমান	প্রধান বিচারপতি সিন্ধু হাইকোর্ট
২. বিচারপতি জনাব আনোয়ার উল হক	প্রধান বিচারপতি লাহোর হাইকোর্ট
৩. লেঃ জেনারেল আলতাফ কাদির	সামরিক উপদেষ্টা
৪. জনাব হাসান	আইনগত উপদেষ্টা

আমাদের প্রত্যাবাসনের অনেক আগেই কমিশনটি গঠিত হয়েছিল এবং কমিশন তার প্রাথমিক সুপারিশমালা প্রণয়ন শেষ করেছিল। এতে মন্তব্য করতে গিয়ে কমিশন লেখে, "ভারতে যুদ্ধবন্দী হিসেবে অবস্থানরত মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলী, লেঃ জেনারেল নিয়াজী এবং অন্য কয়েকজন অফিসারকে যখন পাওয়া যাবে তখন এ সম্পর্কে আরো তদন্ত করে দেখা হবে যে, কোন্ পরিস্থিতিতে মিঃ পল মার্ক হেনরির মাধ্যমে জেনারেল ফরমান আলী জাতি সংঘের সেক্রেটারি জেনারেলের কাছে বার্তা পাঠিয়েছিলেন এবং যদি কেউ থেকে থাকেন তাহলে কে তাকে বার্তা পাঠানোর কর্তৃত্ব দিয়েছিলেন। ফরমানের প্রত্যাবর্তনের পর তাকে সিগন্যালটি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হোক...।' এই মন্তব্যটিকে এমন

বিকৃতভাবে প্রচার করা হয়েছিল যেন কমিশন আমাকে দোষী সাব্যস্ত করেছে। পৃথিবীর বুকে কিভাবে একজন এমন একটি মতামত তৈরি করতে পারে, যখন প্রকৃতপক্ষে প্রত্যাবর্তন করার পর আমরা কমিশনের সামনে উপস্থিত হয়েছিলাম? আমরা ফিরে আসার পর পুনরায় কমিশনকে সক্রিয় করা হয়েছিল এবং আমাদেরকে জেরা করার পর কমিশন তার চূড়ান্ত রিপোর্ট পেশ করেছিল। চূড়ান্ত রিপোর্টটিকে গোপন রাখা হয়েছে।

কেউই চূড়ান্ত রিপোর্ট সম্পর্কে কোনো আলোচনা করে না। কারণ কমিশন 'সামরিক পরাজয়ের প্রেক্ষাপট সম্পর্কে তদন্ত করার' সীমাবদ্ধ অধিকার ও সনদের বাইরে চলে গিয়েছিল এবং ট্রাজেডির ক্ষেত্রে রাজনীতিকদের অবদান সম্পর্কেও মন্তব্য করেছিল।

ব্যক্তিগতভাবে উপস্থিত হওয়ার আগে আমাদের প্রত্যেকেই কমিশনের কাছে লিখিত বিবৃতি পেশ করেছিলাম যার ভিত্তিতে কমিশনের সদস্যরা আমাদের জন্য প্রশ্ন তৈরি করেছিলেন। একজন অভিযুক্ত ব্যক্তি হিসেবে উপস্থিত হওয়ার এটাই ছিল আমার প্রথম অভিজ্ঞতা। তিন দিন মিলিয়ে আমি মোট ১৩ ঘণ্টা কমিশনের সামনে ছিলাম। প্রথম দিনে বিশেষ করে সূচনার সময়টুকু অসুবিধাজনক ছিল। কারণ আমার লিখিত বিবৃতিতে আমি জনাব একে ফজলুল হক ও জনাব সোহরাওয়ার্দী সম্পর্কে এবং পাকিস্তান সম্পর্কিত তাঁদের ধারণা সম্পর্কে মতামত প্রকাশ করেছিলাম। জনাব হামিদুর রহমান একজন বাংগালী ছিলেন। তিনি আমার পর্যবেক্ষণ পছন্দ করেন নি এবং তাঁর সূচনাকালীন মন্তব্যে বিরক্তি প্রদর্শন করেছিলেন। কমিশনকে আমার কাছে একটি বৈরী আদালত মনে হয়েছিল, কিন্তু আমি আমার মন্তব্য যেমন প্রত্যাহার করিনি, তেমনি সঠিক মনে করিনি প্রধান বিচারপতির সঙ্গে বিতর্ক করাকেও। জেরা এগিয়ে যাওয়ার সাথে সাথে পরিবেশ আমার অনুকূলে আসতে থাকে। দ্বিতীয় দিনে মাননীয় প্রধান বিচারপতির সঙ্গে আমাকে চা পানের আমন্ত্রণ জানানো হয়। সেখানে আনুষ্ঠানিক আলোচনাকালে আমি দেখতে পাই যে, ট্রাজেডি সংঘটনের ক্ষেত্রে রাজনীতিবিদদের ভূমিকা সম্পর্কে তাঁদের মধ্যে পূর্ণাঙ্গ ধারণা রয়েছে। তৃতীয় দিনটি ছিল আমার জন্য সবচেয়ে সন্তোষজনক দিন। প্রায় তিন ঘণ্টাব্যাপী জেরা শেষে বিচারপতি জনাব হামুদুর রহমানের বক্তব্য শুনে সত্যিই আমি বিস্মিত ও অনুপ্রাণিত হয়েছিলাম। তিনি বলেছিলেন, "জেনারেল ফরমান, আমাদের সামনে যাঁরা উপস্থিত হয়েছেন, তাঁদের মধ্যে আপনাকে আমরা সবচেয়ে বুদ্ধিমান ও সৎ অফিসার হিসেবে পেয়েছি। আমরা আজ আপনার কাছে একটি মিলিটারি প্ল্যান উপস্থিত করব- যেটা আমরা সরকারের কাছে সুপারিশ করতে যাচ্ছি এবং পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিরক্ষার জন্য যেটা আগেই গৃহীত হওয়া উচিত ছিল। আমরা আপনার কাছ থেকে মন্তব্য আশা করি।" একটি ভূদৃশ্য টাঙানো হলো এবং লেঃ জেনারেল আলতাফ কাদির আমার কাছে পরিকল্পনাটি উপস্থাপিত করলেন। অভিযুক্ত ব্যক্তি বিচারকে পরিণত হলো। আমি আমার মন্তব্য পেশ করলাম, সেগুলো গৃহীত হয়েছিল।

আমার ভূমিকা সম্পর্কে তাঁদের রায় নিচে দেয়া হল ঃ

মেজর জেনারেল ফরমান আলীর ভূমিকা সম্পর্কে হামুদুর রহমান কমিশনের অংশ বিশেষ

১৩. এই অধ্যায়ের উপসংহার টানার আগে মেজর জেনারেল ফরমান আলীর ভূমিকা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত মন্তব্য করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। কারণ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংবাদ মাধ্যমে পাশাপাশি বাংলাদেশের প্রধান মন্ত্রীও তার সম্পর্কে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন।

১৪. এই অফিসার একাদিক্রমে ৫ বছর পূর্ব পাকিস্তানে অবস্থান করেছেন।(বিভিন্ন পদে ও দায়িত্বে)।

১৫. ১৯৬৯ সালের ২৬ মার্চ জেনারেল ইয়াহিয়া খানের ঘোষিত মার্শাল ল'র পর থেকে তিনি যে পদগুলোতে নিয়োজিত ছিলেন, সেগুলোর কারণে বিভিন্ন পর্যায় ও স্তরের আর্মি অফিসার এবং মার্শাল ল অ্যাডমিনিস্ট্রেটরদের ছাড়াও তাকে স্বাভাবিকভাবেই সিভিল অফিসিয়াল ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সঙ্গে যোগাযোগে আসতে হয়েছিল। তিনি কমিশনের সামনে খোলামেলাভাবে স্বীকার করেছেন যে, ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের মিলিটারি অ্যাকশনের পরিকল্পনার সঙ্গে তিনি জড়িত ছিলেন। পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার উদ্দেশ্যে জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের আওয়ামী লীগ সদস্যদের বিরাট সংখ্যক অযোগ্য ঘোষিত হওয়ার প্রেক্ষিতে আয়োজিত উপনির্বাচনসহ সামরিক সরকারের গৃহীত পরবর্তীকালের রাজনৈতিক পদক্ষেপসমূহের সঙ্গে নিজের জড়িত থাকার কথাও তিনি স্বীকার করেছেন। তথাপি এই জেনারেলের পেশকৃত লিখিত বিবৃতির বিস্তারিত পর্যালোচনা, আমাদের সামনে উপস্থিতির পর তাঁকে করা দীর্ঘ জেরা এবং পূর্ব পাকিস্তান থেকে আগত অন্যান্য সাক্ষীদের সাক্ষ্যের ভিত্তিতে আমরা এই অভিমতে উপনীত হয়েছি যে, বিভিন্ন দায়িত্বে কাজ করার সময় মেজর জেনারেল ফরমান আলী কেবলই একজন বুদ্ধিমান, সতোদ্দেশ্যপ্রণোদিত ও সৎ স্টাফ অফিসার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন এবং কোনো পর্যায়েই তাঁকে জেনারেল ইয়াহিয়া খানকে ঘিরে থাকা এবং সমর্থনদানকারী ভেতরকার সামরিক জান্তার সদস্য হিসেবে গণ্য করা যায়নি। আমরা কোনো পর্যায়েই তাঁকে জনগণের নৈতিকতা, সুষ্ঠু রাজনৈতিক সুবুদ্ধি বা মানবাতবাদী বিবেচনার বিরুদ্ধে অ্যাকশনের ব্যাপারে বুদ্ধিদাতা হিসেবে কিংবা অংশগ্রহণ করতে দেখতে পাইনি। এই পরিপ্রেক্ষিতে এই রিপোর্টের পূর্ববর্তী একটি অধ্যায়ে জেনারেল ফরমান আলী 'পূর্ব পাকিস্তানের সবুজকে লাল রঙে রঞ্জিত করতে' চাচ্ছিলেন বলে আনীত শেখ মুজিবুর রহমানের অভিযোগ সম্পর্ক আমরা ইতিমধ্যেই কিছু মন্তব্য করেছি। আমরা দেখেছি, সমগ্র বিষয়টিই ইচ্ছাকৃতভাবে বিকৃত করা হয়েছে।

১৬. যুদ্ধের সংকটময় দিনগুলোতে মিলিটারি অপারেশনের ব্যাপারে এই অফিসারের প্রত্যক্ষ কোনো দায়িত্ব ছিল না। তিনি তথাপি পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর এবং সেই সাথে ইস্টার্ণ কম্যান্ডের কম্যান্ডারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। এই কারণেই তিনি 'ফরমান আলী ঘটনা' হিসেবে বর্ণিত ঘটনাবলীর সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়েছিলেন। পূর্ব পাকিস্তানে আত্মসমর্পণ সংক্রান্ত অধ্যায়ে বিস্তারিত পর্যালোচনাকালে আমরা দেখেছি যে, ১৯৭১ সালের ৯ ডিসেম্বর জাতি সংঘের কাছে প্রেরিত যে বার্তাটি মেজর জেনারেল ফরমান আলী সত্যায়িত করেছিলেন, সে বার্তাটি পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়া খানের কাছ থেকে পাওয়া পূর্ব কর্তৃত্ব এবং অনুমতির ভিত্তিতে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর কর্তৃক অনুমোদিত ছিল। এই বার্তার উদ্দেশ্য ছিল পূর্ব পাকিস্তানের বৈরিতার অবসান ঘটানোর এবং একটি মীমাংসার লক্ষ্যে প্রস্তাব প্রণয়ন করা। এ সব প্রেক্ষাপটের কারণে এর কর্তৃত্ব এবং প্রেরণের দায়-দায়িত্ব এই অফিসারের ওপর চাপানো যায় না। প্রকৃতপক্ষে তিনি সে সময়ে তাঁর অবস্থানকে সুস্পষ্ট করার জন্য কোর্ট মার্শালের মাধ্যমে বিচারের দাবি জানিয়েছিলেন। কমিশনের কাছে প্রকাশিত তথ্যাবলীর ভিত্তিতে এখন আর সে রকম কোনো তদন্ত বা বিচারের প্রয়োজন নেই।

১৭. ঘটনা প্রবাহের শেষ পর্যায়গুলোতে, যখন আত্মসমর্পণের ব্যাপারে বিস্তারিত আলাপ-আলোচনার জন্য ভারতীয় অফিসাররা লেঃ জেনারেল নিয়াজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসেছিলেন, তখন মেজর জেনারেল ফরমান আলী ইস্টার্ন কম্যান্ডের হেড কোয়ার্টার্সে উপস্থিত ছিলেন। এ দু'জন অফিসারের আচরণ ও মনোভাব সম্পর্কিত যে বিস্তারিত বিবরণী আমাদের কাছে এসেছে, তার ভিত্তিতে এই অভিমত রেকর্ড করায় আমাদের কোনো দ্বিধা নেই যে, প্রাসঙ্গিক সকল সময়েই মেজর জেনারেল ফরমান আলী সঠিক ধারায় লেঃ জেনারেল নিয়াজীকে উপদেশ দিয়েছেন এবং তার উপদেশ গ্রহণ করা হলে অসম্মানজনক উপাখ্যানগুলোর কয়েকটিকে এড়ানো সম্ভব হত।

১৮. ইন্ডিয়ান কম্যান্ডার-ইন-চিফ জেনারেল মানেকশ কয়েকটি প্রচারপত্রে কেন জেনারেল ফরমান আলীকে পাকিস্তান আর্মির কম্যান্ডার হিসেবে সম্বোধন করেছিলেন, সে কারণও আমরা পরীক্ষা করে দেখেছি। দেখা যায়, ১৯৭১ সালের ৮ অথবা ৯ ডিসেম্বর থেকে লেঃ জেনারেল এ এ কে নিয়াজীকে তার কম্যান্ড বাংকারের বাইরে কখনো দেখা যায়নি এবং বিবিসি-তে এই মর্মে একটি সংবাদ প্রচারিত হয়েছিল যে, তিনি পূর্ব পাকিস্তান ছেড়ে চলে গেছেন এবং জেনারেল ফরমান আলী পাকিস্তান আর্মির কম্যান্ড গ্রহণ করেছেন। সে কারণেই ইন্ডিয়ান

কম্যান্ডার জেনারেল ফরমান আলীকে সম্বোধন করে তাঁকে আত্মসমর্পণ করার আহ্বান জানিয়েছিলেন। আমারা এ ব্যপারে সন্তুষ্ট যে, কোনো পর্যায়েই জেনারেল ফরমান আলী ভারতীয় জেনারেলদের সঙ্গে কোনো যোগাযোগে যাননি।

১৯. কমিশনের কাছে এক অভিযোগে লেঃ জেনালের নিয়াজী জানিয়েছেন যে, জেনারেল ফরমান আলী তাঁর ভাস্তের মাধ্যেমে পূর্ব পাকিস্তান থেকে বিরাট অংকের, আনুমানিক ৬০,০০০/= রুপী পাচার করেছিলেন। তাঁর এই ভাস্তে আর্মির একজন হেলিকপ্টার পাইলট এবং ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর তিনি ঢাকা ত্যাগ করেছিলেন। এই অভিযোগ এবং আরো কিছু ব্যাপারে ব্যাখ্যা দেয়ার জন্য আমরা মেজর জেনারেল ফরমান আলীকে ডেকে আনি। তিনি যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন, তা হলোঃ

ইসলামীয়া প্রেসকে দিয়েছি ৪০০০ রুপী
পথে খরচের জন্য রহিমকে দিয়েছি ৫০০০ রুপী
গভর্নরের দেয়া ক্ষমতাবলে বাড়ি ভাড়ার জন্য বিয়েছেন ৫০০০ রুপী
ট্রেজারিতে চালানের মাধ্যমে জমা দিয়েছি ৪৬,৫০০ রুপী

২০. ওপরের বিবৃতির সত্যতা সহজেই যাচাই করা সম্ভব এবং সেজন্য গৃহীত হল।

২১ . যেহেতু তাঁর প্রদত্ত তথ্যসমূহের সত্যতা সহজেই যাচাই করা সম্ভব সে কারণে মেজর জেনারেল ফরমান আলীর ব্যাখ্যায় আমরা সন্তুষ্ট।

২২. পূর্ববর্তী কারণসমূহের প্রেক্ষিতে আমাদের অভিমত হল, পূর্ব পাকিস্তানে দায়িত্ব পালনের সমগ্র সময়ব্যাপী মেজর জেনারেল ফরমান আলীর ভূমিকা ও আচরণের ব্যাপারে কোনো নেতিবাচক মন্তব্যের দরকার হয় না।

আমার বিরুদ্ধে আনীত একটি বিশেষ অভিযোগ সম্পর্কে বিস্তারিত তদন্ত করার জন্য কমিশনকে বিশেষ দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল। ঢাকায় জনাব ভুট্টোর সরকারি সফরকালে জনাব মুজিব তাঁকে একটি ডায়রি দেখিয়েছিলেন, যাতে আমি লিখেছিলাম, "পূর্ব পাকিস্তানের সবুজকে লাল রঙে রঞ্জিত করা হবে।" মুজিব এটা সারা পৃথিবীকেই দেখাচ্ছিলেন এ কথা প্রমাণ করার জন্য যে, আমরা পূর্ব পাকিস্তানে গণহত্যা চালানোর 'পরিকল্পনা' করেছিলাম এবং ওপরোল্লিখিত বাক্যটিকে তারা তাদের বক্তব্যের সত্যতার পক্ষে ব্যবহার করেছিলেন। 'লাল' রঙে রঞ্জিত করার অর্থ করা হয়েছিল রক্তস্নান বা ব্যাপক হত্যাকাণ্ড।

অভিযোগটির মুখোমুখি হওয়ার পর আমি স্বীকার করেছিলাম যে, হাতের লেখাটি আমার কিন্তু কথাটি আমার নয়। এর পেছনের কাহিনী এরকম ঃ নির্বাচনী প্রচারণাকালে ১৯৭০ সালের জুন মাসে ন্যাপ (ভাসানী গ্রুপ) পল্টন ময়দানে এক জনসভার আয়োজন করেছিল। জনসভায় ভাষণ দানকালে যেমনটি ঘটে- কোনো নেতা যখন তার সামনে লক্ষ লক্ষ

মানুষকে দেখতে পান তখন তার মাথা নষ্ট হয়ে যায় এবং এমন অনেক কথাও বলে ফেলেন যা তিনি অন্য কখনোই বলেন না বা বলতেন না। ভাষণগুলোর বিশেষ কিছু অংশ গোয়েন্দা স্টাফ কোর কম্যান্ডারের কাছে রিপোর্ট আকারে পেশ করেছিল। আমি যেহেতু অসামরিক কার্যকলাপের দায়িত্বে ছিলাম, সেহেতু মার্শাল ল অ্যাডমিনিস্ট্রেটর জেনারেল ইয়াকুব আমাকে টেলিফোন করেন এবং বলেন, "ফরমান, তোয়াহাকে বলুন যাতে তিনি উত্তেজনাকর ভাষণ না দেন। অন্যথায় আমাদেরকে অ্যাকশন নিতে হতে পারে।" আমি জানতে চাইলাম, তোয়াহা কি বলেছেন। জেনারেল ইয়াকুব যা বলেছেন আমি তা আমার টেবিলে রক্ষিত টেবিল ডায়েরিতে লিখে রেখেছিলাম এবং এগুলো ছিল, 'পূর্ব পাকিস্তানের সবুজকে লাল রঙে রঞ্জিত করা হবে।'

আমি মোহাম্মদ তোয়াহাকে আমার সঙ্গে দেখা করতে বলি। তোয়াহা ছিলেন বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী গোঁড়া কমিউনিস্ট এবং একজন সিনিয়র রাজনৈতিক নেতা। তাঁর বিরুদ্ধে সে সময় অনেকগুলো মামলা ছিল। সে কারণে তিনি আত্মগোপনে চলে গিয়েছিলেন। আটজন লোকের সঙ্গে যোগাযোগের মাধ্যমে আমি তাঁকে পাই এবং তাঁকে আশ্বাস দেই যে, তিনি যদি গভর্নর হাউজে আমার সঙ্গে দেখা করতে আসেন তাহলে কেউ তাকে গ্রেফতার করবে না। তিনি এলেন। আমি লিখিত বাক্যটি পড়ে শোনালাম এবং জনতে চাইলাম, তিনি কেন এ কথা বলেছেন। তিনি আমাকে বললেন যে, এটা তাঁর ভাষণের অংশ নয়– কথাগুলো বলেছেন, কাজী জাফর আহমদ (যিনি পরবর্তীকালে বাংলাদেশের প্রধান মন্ত্রী হয়েছেন)। তিনি বললেন, এ কথার অর্থ হলো তারা পাকিস্তানের সবুজকে (ইসলামী রাষ্ট্রকে) লাল (কমিউনিস্ট) রাষ্ট্রে পরিণত করবেন- সারা বিশ্বেই কমিউনিজম বোঝাতে লাল ব্যবহার করা হয়। আমি তাঁর ব্যাখ্যা মেনে নিলাম, জেনারেল ইয়াকুবকে জানালাম এবং বিষয়টির ওখানেই সমাপ্তি ঘটলো। কমিশন এ ব্যাপারে বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে যোগাযোগের মাধ্যমে যাচাই করে দেখেছে, বাংলাদেশ সরকার মূল ডায়েরিটি পাঠিয়েছে এবং কমিশন তাদের রিপোর্টে উপসংহার টেনেছে।

কমিশন রিপোর্টের ১৮৩ পৃষ্ঠার ২৩ অনুচ্ছেদে লিখেছেঃ দলিলটি মনোযোগ সহকারে পাঠ করার পর এ ব্যাপারে আমাদের মনে কোন সন্দেহ নেই যে, প্রকৃতপক্ষে এটা ছিল রাইটিং প্যাড বা টেবিল ডায়েরি ধরনের একটি জিনিস, যার ওপর কাজ করার সময় জেনারেল বিভিন্ন রকম নোট রাখতেন। জেনারেলের দেয়া ব্যাখ্যা আমাদের কাছে সঠিক মনে হয়েছে।

ওপরোক্ত অভিযোগের সঙ্গে যুক্ত ছিল আমার বিরুদ্ধে আনীত আরো একটি অভিযোগ। এতে বলা হয়েছিল যে, ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর রাতে আমি ২০০ বুদ্ধিজীবীকে হত্যা করিয়েছিলাম। ১৬ ডিসেম্বর সন্ধ্যার আগেই আত্মসমর্পণ সম্পন্ন হয়েছিল এবং ভারতীয়রা ঢাকার নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করেছিল।

ঘটনাটি হল, ১৭ ডিসেম্বর সকালে বিপুল সংখ্যক মৃতদেহ পাওয়া গিয়েছিল। একমাত্র পাকিস্তান আর্মি ছাড়া যে কারো হাতেই তাদের মৃত্যু ঘটে থাকতে পারে। কারণ পাকিস্তান আর্মি ইতিমধ্যে ১৬ ডিসেম্বর আত্মসমর্পণ করেছিল। এর যে প্রেক্ষাপট আমার জানা আছে তা হলো ঃ

১০ ডিসেম্বর সূর্যাস্তের সময় ঢাকার কম্যান্ডার মেজর জেনারেল জামশেদ আমাকে তার ধানমণ্ডির পিলখানাস্থ অফিসে আসতে বলেন। তাঁর কম্যান্ড পোস্টের কাছাকাছি গিয়ে আমি কিছু গাড়ি দেখতে পাই। তিনি তাঁর বাংকার থেকে বেরিয়ে আসছিলেন এবং আমাকে তাঁর গাড়িতে উঠতে বললেন। কয়েক মিনিট পর আমি এই গাড়িগুলোর কারণ জানতে চাইলাম। তিনি বললেন, "এ ব্যাপারেই নিয়াজীর সঙ্গে কথা বলার জন্য আমরা যাচ্ছি।" কোর এইচ কিউ-তে যাওয়ার পথে তিনি আমাকে বললেন, বিরাট সংখ্যক বুদ্ধিজীবী এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিকে গ্রেফতার করার জন্য একটি আদেশ তিনি পেয়েছেন। আমি বললাম, "কেন, কি জন্য? এটা এ ধরনের কাজ করার সময় নয়।" জামশেদ বললেন, "কথাটি নিয়াজীকে বলবেন।" নিয়াজীর অফিসে যাওয়ার পর জামশেদ প্রশ্নটি ওঠালেন। নিয়াজী আমার মতামত জানতে চাইলেন। আমি বললাম, "এখন সেই সময় নয়। আপনি আগে যাঁদেরকে গ্রেফতার করেছেন তাঁদের ব্যাপারে আপনাকে জবাব দিতে হবে। দয়া করে আর কাউকে গ্রেফতার করবেন না।" তিনি সম্মত হলেন। আমার আংশকা, পূর্ববর্তী আদেশকে বাতিল করে সম্ভবত নতুন আদেশ আর জারি করা হয়নি এবং কিছু লোককে গ্রেফতার করা হয়েছিল। আমি আজও পর্যন্ত জানি না যে, তাদেরকে কোথায় রাখা হয়েছিল। সম্ভবত তাদেরকে এমন কোথাও বন্দী করা হয়েছিল, যার প্রহরায় ছিল মুজাহিদরা। আত্মসমর্পণের পর কোর বা ঢাকা গ্যারিসনের কম্যান্ডাররা তাদের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেছিলেন এবং তারা মুক্তিবাহিনীর ভয়ে পালিয়ে গিয়েছিল। কারণ মুক্তিবাহিনী নির্দয়ভাবে মুজাহিদদের হত্যা করছিল। পাকিস্তান আর্মিকে দুর্নাম দেয়ার উদ্দেশ্যে মুক্তিবাহিনী কিংবা ইন্ডিয়ান আর্মিও বন্দী ব্যক্তিদের হত্যা করে থাকতে পারে। ভারতীয়রা ইতিমধ্যেই ঢাকা দখল করে নিয়েছিল।

আমরা ঢাকায় থাকাকালেই ইন্ডিয়ান আর্মির মেজর জেনারেল নাগরা আমাকে ডেকে নিয়ে অভিযোগটি উত্থাপন করেছিলেন। আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, "আমি কিভাবে জড়িত থাকতে পারি? আমি একক হাতে এত বেশি সংখ্যক মানুষকে হত্যা করতে পারি না। আমার কোনো কম্যান্ড নেই। আমার কোনো সামরিক কর্তৃত্বও নেই।" তিনি মেনে নিয়েছিলেন। কিন্তু আমার জব্বলপুর পৌঁছানোর পর প্রশ্নটি পুনরায় উত্থাপন করা হয়েছিল। ইন্ডিয়ান আর্মির ডিডি এস আই বিগ্রেডিয়ার লেসলি আমাদের জিজ্ঞাসাবাদ করতে আসেন। তাঁর প্রথম প্রশ্ন ছিল, "১৬/১৭ ডিসেম্বর ২০০ বুদ্ধিজীবীকে হত্যার দায়ে আপনাকে

অভিযুক্ত করা হয়েছে। এ ব্যাপারে আপনার কি বলার আছে?" আমি বলেছিলাম, "ওপরের তলায় জেনারেল নিয়াজী রয়েছেন। যান এবং তাঁকে জিজ্ঞেস করুন ঃ এই লোকগুলোকে গ্রেফতারের ব্যাপারে ১০ ডিসেম্বর আমি বিরোধিতা করেছিলাম কি না। যাদেরকে গ্রেফতারের ব্যাপারেও আমি বিরোধিতা করেছি, তাঁদেরকে হত্যার আদেশ আমি কিভাবে দিতে পারি?" তিনি তখনই উঠে দাঁড়ালেন এবং নিয়াজীর সঙ্গে দেখা করতে গেলেন। মিনিট দশেকের মতো সময় পর তিনি ফিরে এলেন এবং আমার দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললেন যে, তাঁর আর কোনো প্রশ্ন নেই। আমি লেসলিকে যা বলেছি নিয়াজী তার স্বীকৃতি দিয়েছেন।

ভারতীয়রা নিজেরাও ঘটনার সঙ্গে পাকিস্তান আর্মির কাউকে জড়িত ও দায়ী করার মতো প্রমাণ সংগ্রহের জন্য খুব আগ্রহী ছিল। ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস্-এর ব্রিগেডিয়ার বশির এবং অন্য ৫০ জন অফিসারকে দিল্লীতে নির্জন কারাবাসে রাখা হয়েছিল। এঁদের একজন অফিসার আমাকে বলেছেন, তাঁদের প্রস্তাব দেয়া হয়েছিল কেউ যদি এ কথা বলেন যে, ঐ হত্যাকাণ্ডের নির্দেশ জেনারেল ফরমান দিয়েছিলেন, তাহলে তাঁর প্রত্যাবাসন ত্বরান্বিত করা হবে। কিন্তু তাঁদের কেউই সে কথা বলেন নি, যার জন্য আমি তাদের কাছে সারা জীবন কৃতজ্ঞ থাকব। কেউই প্রস্তাবে প্রলুব্ধ হননি। আর এখানে, পশ্চিম পাকিস্তানে এই অভিযোগটিকে ব্যপক প্রচারণা দেয়া হয়েছিল যে, পাকিস্তান আর্মি পূর্ব পাকিস্তানের বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করেছে। আর্মিকে দোষারোপ করার জন্য উদ্দেশ্যটি ছিল রাজনৈতিক।

জি এইচ কিউ-এর বিশেষ কমিটি (আফতাব কমিটি হিসেবে অভিহিত) এবং হামুদুর রহমান কমিশনের দুটি থেকেই নির্দোষ প্রমাণিত হওয়ার পর আমাকে জি এইচ কিউ-তে মিলিটারি ট্রেনিং-এর ডিরেক্টর জেনারেল পদে নিযুক্তি দেয়া হয়েছিল। এটা ছিল রায়ের সুস্পষ্ট নির্দেশনা। কিন্তু আমি পাকিস্তানের বাইরে থেকেও স্বীকৃতি পেয়েছিলাম।

১৯৭৫ সালের আগস্ট মাসে প্রেসিডেন্ট ফজল ইলাহী চৌধুরী ভিয়েনা সফর করেন। সেখানে তিনি পূর্ব পাকিস্তানের প্রাক্তন গভর্নর ডাঃ মালিকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং তাঁর কাছ থেকে আমার জন্য একটি চিঠি নিয়ে আসেন। চিঠিটির অনুলিপি এ বইয়ের শেষে দেয়া হয়েছে।

জনাব ভুট্টো কমিশনের কর্মক্ষেত্র কেবল সামরিক বিপর্যয়ের তদন্তের মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখেছিলেন, যদিও ১৯৭১ সালে যা ঘটেছিল তার অনেক কিছুই ছিল রাজনৈতিক অপকর্মের ফলাফল- তা পরিকল্পিতই হোক কিংবা হোক অজ্ঞতাবশত। সে কারণেই কমিশন জনাব ভুট্টোকে জেরা করাটা যথার্থ মনে করেছে এবং এ বিষয়টি লিপিবদ্ধ করেছে যে, পিপলস পার্টির চেয়ারম্যান 'তুম উধার হাম ইধার' শ্লোগানটি তোলার ব্যাপারে কোনো সন্তোষজনক ব্যাখ্যা দিতে পারেন নি। ইয়াহিয়া যতটা জড়িত সে ব্যাপারে কমিশন উল্লেখ করেছে যে, তিনি সব কিছুর জন্য দায়িত্ব স্বীকার করে নিয়েছেন।

রাও ফরমান আলীকে লেখা ডাঃ মালিকের চিঠি

প্রিয় জেনারেল ফরমান আলী সাহেব, ভিয়েনা
আসসালামু আলাইকুম। ১৫-৮-'৭৫

আমি এ কথা জেনে অত্যন্ত আনন্দিত যে, বিচারপতি হামুদুর রহমান কমিশন আপনাকে অন্যদের সংঘটিত অপরাধের সকল অভিযোগ থেকে অব্যাহতি দিয়েছে এবং আপনাকে ফৌজি ফাউন্ডেশনের দায়িত্বে নিযুক্তি দেয়া হয়েছে। সর্বশক্তিমান আল্লাহ এবং তাঁর অনুগ্রহকে ধন্যবাদ। তিনি সব সময় সর্বোচ্চ ন্যায় বিচার করেন। তিনি গতকাল, ১৪ আগস্ট আরো একটি ন্যায় বিচার করেছেন, যখন পাকিস্তান জন্ম নিয়েছে।

আপনার শরীর এখন কেমন এবং আপনার পরিবার কেমন আছে?

মোজাফফর আহমদ সাহেব কোথায় এবং এখন তিনি কি করছেন? তার ঠিকানা জানা থাকলে দয়া করে আমাকে পাঠাবেন। সেই তরুণ দু'জন অফিসার কোথায়, যারা আমার মিলিটারি সেক্রেটারি ও এডিসি ছিল? তারা অত্যন্ত অনুগত ছিল এবং আমি তাদের জন্য সব সময় দোয়া করি। তারা কোথায় আছে এবং কি করছে জানতে পারলে আমি আনন্দিত হব।

ঢাকা কারাগারে আমার স্বাস্থ্য ভেঙে পড়েছিল এবং অনেক অসুবিধার পর আমি ইউরোপে আসতে পেরেছি- গত বছরের জুলাই মাসে প্রথমে অস্ট্রিয়ায় এসেছি। বিগত ১২ মাসে আমার তিনিটি অস্ত্রোপচার হয়েছে; এবং সম্প্রতি মূত্রস্থলী স্ফীত হওয়ায় চিকিৎসকরা আরো একটি অস্ত্রোপচারের পরামর্শ দিয়েছেন। আমার সাময়িক রক্তচাপ এবং বহুমূত্রের সমস্যা রয়েছে। হৃদযন্ত্র ও মূত্রগ্রন্থির অবস্থাও ভালো নয়। অনুগ্রহ করে আমার জন্য দোয়া করবেন।

আমি ২১ তারিখ সন্ধ্যায় লন্ডনের উদ্দেশে ভিয়েনা থেকে চলে যাব এবং সেখানে এক সপ্তাহ থাকার পর ৩০ আগস্ট ওয়াশিংটনের যাব এবং রমযান মাস সেখানে কাটাব। অনুগ্রহ করে ওয়াশিংটনের ঠিকানায় চিঠি লিখবেন।

সালাম এবং আন্তরিক শ্রদ্ধাসহ

আপনার একান্ত
(ডাঃ) এ এম মালিক